সাহিত্যরসিক বন্ধুবর, 'প্রবাসী'র সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের করে

সাদরে সমর্পিত হইল

গ্রন্থকার

রাণুর তৃতীয় ভাগ

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা
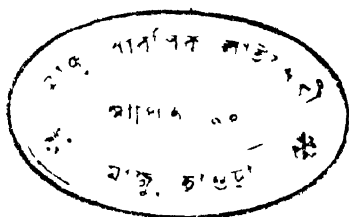
প্রথম সংস্করণ—আষাঢ় ১৩৪৭

পুনর্মুদ্রণ—আষাঢ় ১৩৫০, আশ্বিন ১৩৫২

মূল্য তিন টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস

২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১১—২০, ৯, ৪৫

রাণুর তৃতীয় ভাগ, রাণুর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের সমগোত্র। ওই দুইটি ভাগে ভূমিকায় যাহা বলিয়াছি, তৃতীয় ভাগ সম্বন্ধেও সেই সব কথাই খাটে।

গল্পগুলি সাধারণত তাঁহাদের জন্যই লেখা, দুঃখের দুনিয়ায় যাঁহারা দুইটা ঘণ্টাও একটু ভুলিয়া থাকিতে ভালবাসেন। আবার এমন লোকও আছেন, উপলক্ষে-অনুপলক্ষে দুই ফোঁটা চক্ষের জল না ফেলিলে যাঁহাদের অন্ন পরিপাক হয় না, বইখানিতে তাঁহাদের জন্যও দুই-একটি কাহিনী সন্নিবেশিত রহিল,—নেহাৎ দরিয়া বহাইতে না পারুক, আশা করি, তবু তাঁহাদের জলীয়াংশ কতকটা লাঘব করিতে পারিবে।

দ্বারবঙ্গ
অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৪৭

গ্রন্থকার

সূচী

স্বয়ম্বরা
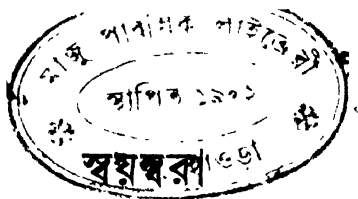
রাণুর বিবাহ। তিন দিন ধরিয়া রোশনচৌকির বাজনা,—বাড়ি-ঘর-দুয়ার সুরে সুরে ভরাট হইয়া গিয়াছে। সুর কি ভাবে মনের মধ্যে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া যেন রুনরুন করিতেছে।

গায়ে হলুদের দিন মেয়েদের প্রীতিভোজ। যে ব্যাপারটি সুরের মধ্য দিয়া আহূত, সেটি যেন রাণুকে আরও পরিপাটি করিয়া ঘিরিয়া ফেলিতেছে। সে যতই সঙ্কুচিত হইয়া ঘরের কোণ খুঁজিতেছে, বাড়ির যত প্রশ্ন, যত আহ্বান যেন তাহারই অভিমুখী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—"কোথায় গেল সে?" "ওমা! তুই নিশ্চিন্দি হয়ে একঠায় ব'সে আছিস? কি ব'লে গেলাম এক্ষুনি?" নিমন্ত্রিতদেরও ওই এক খোঁজ—"রাণুকেই যে দেখছি না—এই যে! দেখেছ? এক-দিনেই কত বদলে যায়?" "হুঁ, পুষলে পাষলে, এবার কাটল মায়া। কিছু না, কাকের কোকিল-ছানা পোষা দিদি!"

শুধু রাণু, রাণু, আর রাণু!

বিবাহের দিন সমস্ত ব্যাপারটি তাহাকে আরও নিবিড়তরভাবে ঘিরিয়া ফেলিল। বর আসা হইতে আরম্ভ করিয়া সবাইকে দেওয়া-থোওয়া বসানো-খাওয়ানোর মধ্যে যা কিছু উৎসব, ব্যস্ততা, চেঁচামেচি, হাসি, বচসা—সমস্তর মধ্যেই রাণু যেন একটা গূঢ় অলক্ষ্যে উপস্থিত আছে। তারপর আসল বিবাহের ব্যাপারটা, রাণু তো সেখানে সর্ব্বেশ্বরী, সবাইকে যেন নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে—ছোট বড়, গুরু লঘু সবাইকে।

অথচ এই রাণু সেদিন পর্য্যন্ত সংসারের আর সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে মাত্র অপর একজন ছিল। সংসারের কাজে অকাজে আধময়লা কাপড় পরা—খোঁজ পড়িয়াছে ফরমাশের জন্য—কাজের অবহেলা কিংবা

ভ্রান্তিতে খাইয়াছে বকুনি—মুখভার করিয়া ফিরিয়াছে ; তাও কাজের তাগিদে কি মুখটাই বেশিক্ষণ বিষণ্ণ থাকিবার অবসর পাইয়াছে ? আদরের কথা ? হাঁ, তা নেহাত যখন কাহারও অতিরিক্ত রকমের ফুরসৎ বোধ হয়, ডাকিয়া এদিক ওদিক দুইটা প্রশ্ন, দুইটা মিষ্টি কথা— ।

বিবাহ জিনিসটা তাহা হইলে মন্দ নয়। কেমন করিয়া যেন মনে হয় একটি প্রদীপ জ্বালার কথা,—গান, উৎসব, শঙ্খ, উলুধ্বনির সঙ্গে যেন একটি আরতির দীপ দেবতার সামনে আলোয় আলোয় ঝলমল করিয়া উঠিল।

আলোর কিন্তু একটা ছায়ার দিক আছে, ঠিক যেমন আছে একটা দীপ্তির দিক। এই কথাটি ভুলিলে চলিবে না, কেন না এই ছায়া-দীপ্তি লইয়াই তো জীবন।

বিবাহ-বাড়ির দৃশ্যটা একবার ভাবুন, বিশেষ করিয়া, চারিদিকে নানা বয়সের যে মেয়েগুলি চলাফেরা করিতেছে, তাহাদের কথা। সবচেয়ে ব্যস্ত, সবচেয়ে কলোচ্ছ্বসিত, কেহ না চাহিলেও শুধু নিজের নিজের আনন্দের অতি-প্রাচুর্য্যে সর্ব্বত্র সঞ্চরিতা—মনে হয়, এরাই যেন উৎসবের প্রাণ। কিন্তু সাধারণভাবে এ কথাটা সত্য হইলেও একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, উৎসবের আলোটি সকলের মুখে সমানভাবে ফুটে নাই। এমন কি একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে এদের মধ্যে অনেকগুলি গম্ভীর, নিষ্প্রভ, এমন কি বিষণ্ণ মুখের সন্ধান পাওয়া যাইবে। এইগুলির উপর আলোর ছায়া পড়িয়াছে। এই ছায়াকে কি বলিবেন ?—হিংসা ? যাহা ইচ্ছা হয় বলুন, সংজ্ঞায় কিছু যায় আসে না ; আমি এই ম্লানিমাটুকুকে ছায়াই বলিলাম। রাণুর বিবাহ উপলক্ষ্যে এই রকম একটি ছায়াপাতের কথা বলিব ; অল্প কথা, কিন্তু বড়ই করুণ।

এই হাস্যোজ্জ্বল উৎসব-রজনীতে একটি মেয়ের চিত্ত ভারাতুর হইয়া

উঠিয়াছে। তাহার কেন বিবাহ হয় নাই ? কবে হইবে ? কবে তাহার চারিদিকে এই বাদ্য, এই কলোচ্ছ্বাস মুখর হইয়া উঠিবে ? বিবাহ-চিন্তাতেও সমস্ত চিত্ত এক মুহূর্ত্তে ভরিয়া উঠে যেন। রূপকথার এমন প্রত্যক্ষ রূপ আর দেখা যায় না ; একটি রজনীর মোহন স্পর্শের মধ্য দিয়া তাহার সব নগণ্যতা ঘুচিয়া যাইবে ; রাণুর মত সেও রাণী হইয়া জাগিয়া উঠিবে। সে দিন আসিবে নিশ্চয়, এই রকম একটি রজনীর সোনার মুকুট মাথায় পরিয়া। কিন্তু কবে ? বিলম্ব তো আর সহ্য করা যায় না !

কিন্তু কাহাকেই বা বলিবে, আর কেই বা বুঝিবে তাহার মনের কথা ? সখীদের ? তাহারা আজ নিজের লইয়াই উন্মত্ত, পরের কথা শুনিবার কি আর অবসর আছে ? আর তা ছাড়া তাহাদের শুনাইয়া ফলই বা কি ? তাহারা তো কোন সুরাহা করিতে পারিবে না।

তবুও চেষ্টা করিয়াছিল। ওদের বাড়ির রতি খুব সাজিয়াছে, মাথায় ঝকঝকে জরির ফিতা দিয়া রচিত খোঁপা, তাহাতে টকটকে একটা গোলাপ গোঁজা ; ঘাঘরা করিয়া পরা কাপড়ের আঁচল গতির চঞ্চলতায় পিছনে ফরফর করিয়া উড়িতেছে, প্রজাপতির পাখনার মত। সিল্কের রুমাল,—কখনও ব্লাউজে গোঁজা, কখনও কোমরে, কখনও হাতে। চুলের রুমালের ও ফেস-ক্রিমের মিশ্র গন্ধ যেন ঢেউ তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে।

ইহাকেই বলিবার অনেক সুবিধা, তারপর যদি কথাটা ঘুরিতে ফিরিতে বড়দের কানে পৌঁছায়—রতিকে উপলক্ষ্য করিয়া যাহা বলিল, তাহা যদি নিজের অন্তরের দূতীর কাজ করে !

ইস, ভাবনে গেলি রতি ! কি ভেবেছিস বল দিকিন !

ওমা, ভাবব আবার কি ? বিয়েবাড়ি, সবাই তোর মতন গোমড়া মুখ ক'রে বেড়াবে নাকি ?

নাঃ, কিছু ভাবছ না! আমি ঠিক জানি মশাই। বলব, কি ভাবছিস? রতি ভাবছে, যদি রাণুর মত আমারও শ্বশুর এসে—

ভিতর হইতে কে হাঁকিল, মেয়েদের পাতা ক'রে ফেল। রতি সেই দিকেই ছুটিয়া গেল, তাহার নিজের মনের রহস্য আর তাহাকে শোনানো হইল না।

ভাজ অনেক সময় ঠাট্টা করে; এই সময় করিলে একটা উপকার হয়, লজ্জা-লজ্জা উত্তরের ছলে তবুও মনের ভাবটা কতকটা প্রকাশ করিয়া দেওয়া যায়। আজই কিছু বিবাহ হওয়া সম্ভব নয়, তবুও মনের অভিরুচিটা যদি জানা থাকে সবার তো—

তাহাকে পাওয়াই দুষ্কর। যদি পাওয়াই গেল তো, এত ব্যস্ত যে ঠাট্টা করিবে কি? মরিবার ফুরসৎ নাই। তবুও একবার মুখটা ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিল, হ্যাঁ রে, ওরকম শুকনো মুখ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিস [illegible]? আজ রাণুর বিয়ে হচ্ছে তাতেই এই রকম, দু দিন পরে যখন [illegible]

যাও, ঠাট্টা ভাল লাগে না বউদি।

ওমা, ঠাট্টা কি লো? দু দিন পরে রাণু নিজের ঘর করতে যখন যাবে, মুখ শুকনো করা তো দূরে থাক্, কেঁদেও কি রুখতে পারবি?

ভাজ বুঝিয়াও বুঝিল না। আর তবে কাহার কাছেই বা আশা? বাপ মা—এদের কাছে তো আর বলা যায় না! বাকি থাকেন দাদু আর ঠাকুমা, একটির বিদায়েই তাঁহাদের যা অবস্থা, ওখানে তো ঘেঁষাই যাইবে না। তাহা ছাড়া ঠাট্টা-বিদ্রূপের মত মনে স্ফূর্ত্তি ফিরিয়া আসিতে ওঁদের ঢের দেরি এখনও, রাণুর জোড়ে ফিরিবার পূর্ব্বে তো নয়ই।

তখন মনে পড়িল মেজকাকার কথা। ও লোকটা হালকা প্রকৃতির, কাজের যেমন উপযুক্তও নয়, তেমনই কাজের ভিড়ে ডাকও পড়ে না ওর। প্রচুর অবসর লইয়া কোন নিরিবিলি জায়গায় গা ঢালিয়া পড়িয়া আছে

নিশ্চয়। আর একটা মস্তবড় সুবিধা এই যে, বিবাহ-সংক্রান্ত কোন কথা ভাল করিয়া বোঝে না বলিয়া ওর কাছে কথাটা পাড়ায় কোন সঙ্কোচের বালাই থাকিবে না। কেন যে মেজকাকার কথাটা আগে মনে পড়ে নাই! বোধ হয় অমন অ-দরকারী লোককে টপ করিয়া কাহারও মনে পড়ে না বলিয়াই।

অবশ্য অতটা বেকার নই আমি; তবুও, লজ্জার কথা হইলেও বলিতে হইতেছে, অত কাজের ভিড়েও একটু নির্লিপ্ততা সৃজন করিয়া সেটুকু উপভোগ করিতেছিলাম—নিজের ঘরের বিছানায় শুইয়া, একটু চক্ষু মুদিয়াও।

মেজকা!—ডাকে তন্দ্রাবেগটা কাটিয়া গেল। আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তুই এখানে যে? মেয়েদের পাতা করা হয়েছে, খেয়ে নিলি না কেন? রাত হয়েছে যে!

একেবারে খিদে নেই।

কেন? আচ্ছা, একটু মাথার চুলগুলো ধ'রে আস্তে আস্তে টেনে দে দিকিন।

একটু পরে।

মেজকা!

আলস্যের স্বরে উত্তর করিলাম, হুঁ?

ঘুমুচ্ছ?

উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলাম, হুঁ। বেশ মিষ্টি হাতটা রে তোর! ঘুম আসছে।

না, সে কথা বলছি না।

তবে?

আর একটু চুপচাপ গেল। আবার তন্দ্রাটা বেশ জমিয়া আসিতেছে।

মেজকা, আমার বিয়ের যোগাড় ক'রে দেবে ?

তন্দ্রা ছুটিয়া একেবারে উঠিয়া বসিলাম। এ যে চার-পো কলি !

কিন্তু কেন তা বলিতে পারি না, কোন রূঢ় উত্তর দিতে কেমন যেন মন সরিল না। বোধ হয় মনে করিলাম, এটা নির্জলা নির্লজ্জতার নিদর্শন নাও হইতে পারে ; সম্ভবত উৎসবের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে ; না হইলে— রাণুর চেয়েও ছোট, বিবাহের আর ও কি বোঝে ?

উৎসবের সুরটি ভাঙিতে কেমন কেমন বোধ হইল। পরে একদিন না হয় সমস্ত বিষয়টির অনৌচিত্যটা বুঝাইয়া দিলেই হইবে। একটু নীরব থাকিয়া বলিলাম, তোমার বিয়েটা হয়ে গেলেও তো আমরা আরও নিশ্চিন্দি হতাম। আজ না হয় কাল তো দিতেই হবে ; কিন্তু সে তো আর অল্প কথায় হয় না মা। দেখলেই তো, রাণুর বিয়েতে খরচের হিড়িকটা ? নিজেদের খরচ তো আছেই, তা ছাড়া তোমাদের শ্বশুরেরা তো হাঁ ক'রেই আছেন, অল্প দিয়ে কি আর পেট ভরানো যাবে ? চাই এক কাঁড়ি পয়সা।

তুমি উঠে বসলে কেন মেজকা ? শোও না ওদিকে মুখ ক'রে, আমি সুড়সুড়ি দিচ্ছি।

বুঝিলাম, মুখামুখি হইয়া প্রসঙ্গটা চালাইতে পারিতেছে না। আহা, সত্যই কি এতটা বেহায়া হইতে পারে ! হোক না এ যুগ, হোক না সে মডার্ন।

একটু প্রসন্নভাবেই শুইয়া পাশ ফিরিলাম। বুঝিলাম, দুজনার মধ্যে একটি লঘু তন্দ্রার পর্দা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা এটা। ভাল। একটু পরে ডাক হইল, মেজকা, ঘুমুচ্ছ ?

কৃত্রিম জড়িত কণ্ঠে বলিলাম, না, বল।

একটু থামিয়া উত্তর হইল, পয়সা আমি যোগাড় ক'রে রেখেছি সেজন্য, তোমাদের ভাবতে হবে না।

সর্ব্বনাশ! আমার বিস্ময় আমায় যেন ঠেলিয়া তুলিয়া দিল। দুই কনুইয়ের উপর ভর দিয়া অর্দ্ধশয়ানভাবে উঠিয়া পড়িলাম এবং চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া প্রশ্ন করিলাম, পয়সা যোগাড় ক'রে রেখেছিস? সে কি রে! তুই কবে থেকে এ মতলব আঁটছিস? একটা বিয়ের খরচ যোগাড় করেছিস বলছিস; সে তো চাড্ডিখানি পয়সা নয়!

নিশ্চয় একটা মস্ত বড বাহাদুরি ভাবিল; না হইলে এর পরে আব উত্তর দিত না। আজকালকার মেয়ে!

একটু তেরছা হইয়া বসিয়া মুখটা ঘুরাইয়া লইল। তারপর ঘাডটা ঈষৎ নীচু করিয়া বলিল, অনে—ক আছে; অনেকদিন থেকে জমাচ্ছি।

প্রবল কৌতূহল হইল, বলিলাম, সত্যি নাকি? নিয়ে এসে দেখাতে পারিস? তোর কাছে, না তোর মার কাছে আছে?

না, আমার কাছেই আছে, আনছি।

আপনাদের অবস্থাটা বুঝিতেছি; কিন্তু সাক্ষাৎদ্রষ্টা আমার তখনকার মনের অবস্থাটা কল্পনা করিতে পারেন কি? বিশ্বাস করিতে আপনাদের বোধ হয় মনের উপর খুব একটা চাপ পড়িতেছে। কিন্তু যা হাওয়া বহিতেছে, সবই সম্ভব। আজ যাহা শুনিতেছেন, কাল যদি তাহা নিজেই প্রত্যক্ষ করেন তো, কিছুই আশ্চয্য হইবার নাই। গুরু লঘু ভেদ আর ইহারা রাখিবে না; তা হা-হুতাশ করিলে আর উপায় কি?

একটু পরে মাখনের রঙের একটি ছোট ক্যাশবাক্স আনিয়া হাজির হইল। এটা চিনি, ওর বাপের দেওয়া; মেয়েটিকে বড় ভালবাসে। অত ভালবাসা, অত আশকারারই বোধ হয় এই পরিণাম।

ডালা খুলিয়া বাক্সটা সামনে ঘুরাইয়া ধরিয়া স্মিত হাস্যের সহিত

আমার মুখের উপর চক্ষু তুলিয়া চাহিল, বিজয়ের আনন্দে সঙ্কোচের অবশেষটুকুও অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

সত্যই! বাক্সের খোপে খোপে রুমাল, নেকড়া আর কাগজের ছোট বড় একরাশ মোড়ক; একটি জ্যালজেলে ফরসা নেকড়ার গ্রন্থির মধ্যে যেন সুপুষ্ট গিনির থাক ঝিকমিক করিতেছে!

ভূমিকাটা এই পর্য্যন্ত থাক। হাঁ, এটা আমার গল্প নয়, একটা *বিজ্ঞাপন মাত্র; এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, সেটা তাহার ভূমিকা।* কিন্তু বিজ্ঞাপনটি এই—

আমার একটি সাত বছরে ভ্রাতুষ্পুত্রী বর্ত্তমান, নাম ডলিরাণী। ছিপছিপে শ্যামবর্ণ; পিঠের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কেশ। এদিকে মেয়েটি খুব গোছালো, কেন না নিজের বিবাহের জন্যই পাই, আধলা, পয়সায় অনে—কগুলি তাম্রখণ্ড সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে—একুনে সওয়া ছয় আনা। সুতরাং একেবারেই যে খালি হাতে কন্যা গ্রহণ করিতে হইবে, এমন নয়। হৃদয়বান যদি কোন বরেব বাপ থাকেন তো সম্মতি জানাইলে সুখী হইব।

একটু গোল আছে আবার এর মধ্যে, সেটাও পূর্ব্বাহ্ণেই বলিয়া রাখা ভাল। শুধু হৃদয় থাকিলেই চলিবে না। যত দূর বোঝা গেল, একটি সভা-সাজানো শ্বশুর লাভই আপাতত ডলির বিবাহ করার প্রধান উদ্দেশ্য এবং আর সব এক রকম অবান্তর। ডলির ব্যক্তিগত ইচ্ছা, শ্বশুরের শরীরে প্রচুর মেদ এবং মাথায় খুব চকচকে একটি প্রশস্ত টাক থাকা চাই। কি করা যায়? ভিন্নরুচিহি লোকঃ।

তাই, যদি এরূপ ত্রিগুণাত্মক—অর্থাৎ একাধারে হৃদয়, মেদ এবং টাক-বান কেহ থাকেন তো, আশা করি, অবিলম্বেই পত্রাচার আরম্ভ করিয়া বাধিত করিবেন।

দ্রব্যগুণ

১

বড়দিনের বাজার করিতে এটা-ওটা-সেটায় বোঝাটা বেজায় ভারী হইয়া গেল। এই দুঃখে বাজারে বড় একটা আসি না। সবার টানাটনিতে পড়িয়া কিছু কিছু করিতে করিতে বিষম হইয়া পড়ে।

সবশেষে পড়িয়াছিলাম মুদীর পাল্লায়। আমার প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের অপেক্ষা না রাখিয়াই ছোট বড় নানা রকম পুলিন্দা বাঁধিয়া ঝুড়ির ফাঁকটাকে বুজাইয়া দিতেছিল। শেষ হইলে ঝুড়ির চারিদিক একবার ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া হাত দুইটা সশব্দে ঝাড়িয়া বলিল, এই কপির পাশটা খালি রয়েছে—বাঃ, কপি বটে একখানি! জিনিস কেনেন তো শৈলেনবাবু! সেই কাপড়-কাচা সাবান একটা বের কর্ তো রে।

বলিলাম, সাবান আর চাই না এখন।

নাঃ, চাই না! বড়দিন—ব'লে বসলেন কিনা কাপড়-কাচা সাবান চাই না! হাসালেন আপনি!

সত্যই কিছু হাসির কথা হইল নাকি? নিজের নিকট সংশয়ের উত্তর না পাইয়া চুপ করিয়া গেলাম।

একটা হাতখানেকেরও উপর চৌকা সাবান বাহির হইল।

বাচ্চা চাকর ছোঁড়াটা একটু দূরে অশ্বত্থতলায় হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া এক-একবার পরিবর্দ্ধমান মোটটার পানে আড়চোখে চাহিয়া অসহায়ভাবে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। সাবানটা গুঁজিতে দেখিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, বাপ রে, হামরা জান লে লি সব!

মুদী ঘুরিয়া বলিল, একটা সাবানের ভারে অমনই তোর জান চ'লে যাবে ?

তাড়তাড়ি তাহার হাতে দুইটা পয়সা গুঁজিয়া দিয়া বলিল, নেঃ, পুরনো খদ্দের বাবু—লাভ তো নিতে পারলামই না, উলটে ট্যাঁক থেকে দুটো পয়সা—তা হোক গিয়ে, বাবুর চাকর তুই, খুশি থাক্।

যাহারা পরার্থে প্রাণ দান করে, তাহাদের মত মহৎ ঔদাসীন্যের সহিত ছোঁড়াটার মাথায় মোটটা তুলিয়া দিল। সে ডান হাতে 'চোখ মুছিতে মুছিতে বাড়িমুখো হইতে বলিলাম, দাঁড়া একটু, এই বোতল দুটো হাতে ঝুলিয়ে নে।

পাজি তাড়াতাড়ি দুই-একবার টলমল করিয়া ডান হাতটাও ঝুড়িতে লাগাইয়া নাকী স্বরে বলিল, দুনো হাত তো বঝল বা—অর্থাৎ দুটো হাতই তো জোড়া।

রাগে গা-টা রি-রি করিয়া উঠিল ; কিন্তু চটাইতে গেলে আবার টলিতে পারে—চাই কি আরও জোরে টলিতে পারে, এই আশঙ্কায় আর আপাতত কিছু বলিলাম না।

নিরুপায় হইয়া ছড়িটা কাঁধে চাপিয়া বোতল দুইটা দুই হাতে তুলিয়া লইলাম। কিন্তু কয়েক পা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা অস্বস্তিকর ভাব যেন বোতল দুইটার মসৃণ অঙ্গ বাহিয়া, আমার হাত দুখানা বাহিয়া, আমার সমস্ত শরীরটা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কেমন যেন মনে হইল, এ ঠিক হইতেছে না—সন্ধ্যার এই গা-ঢাকা অন্ধকারে দুই হাতে দুইটা বোতল, বগলে ছড়ি,—এ যেন কি রকম কি রকম বলিয়া বোধ হয়! বাজারের সব লোকের চোখের মধ্য দিয়া নিজের দিকে চাহিলাম। এ কি হইয়া গিয়াছি! মনটা যেন নিজের প্রতি নিজেই ইয়ারকির ঢঙে বলিয়া উঠিল, আরে, কে ও! কোত্থেকে?

ছড়িটা বোতলের সঙ্গে ডান হাতে লইলাম, দৃশ্যটা কিন্তু বেশ শোধরাইল বলিয়া বোধ হইল না। তখন দুইটা বোতলই বাম কাঁখে পুরিলাম, ডান হাতে ছড়ি। এ যেন আরও মারাত্মক হইয়া উঠিল। মাথা ক্রমেই গুলাইয়া আসিতেছিল। র‍্যাপারটা জড়াইয়া লইলাম, ঠিক সেই সময় পিছনে গা ঘেঁষিয়া একটা লোক চলিয়া যাওয়ায় বোতল-জোড়ায় একটু ঠোকাঠুকি হইয়া একটা প্রচ্ছন্ন তরল শব্দ হইল। মনে হইল, যেন র‍্যাপারের মধ্যে আত্মগোপন করিতে গিয়া অপরাধী হীনচরিত্র বোতল দুইটি হাটের মাঝখানে জাহির হইয়া গেল।

আমি ঘামিয়া উঠিতেছিলাম, চাকর ছোঁড়াটার তাগাদায় হুঁশ হইল। ভাবিলাম, আচ্ছা দুর্ব্বলচিত্ত লোক তো আমি! একটা শরবতের খালি বোতল আর একটা ফেনাইলের বোতল রাস্তা দিয়া বেপরোয়াভাবে লইয়া যাইবার সৎসাহসটুকু নাই? অন্ধকার? তাহা হইলে কোন সাধু ব্যক্তিই অন্ধকারে আর নিজের গৃহস্থালীর কাজ করিবে না? শিশি কিংবা বোতল না হইলে একদণ্ড চলে?

বেশ স্বচ্ছন্দভাবে বোতল দুইটার লেবেল সামনে করিয়া দুই হাতে ধরিলাম এবং সমস্ত জড়তা দূর করিয়া মুখে একটা সহজ প্রসন্নতার ভাব ফুটাইয়া তুলিলাম।

একটুর মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম, অত প্রসন্নতার ভাবটা ফুটাইয়া তোলা সমীচীন হয় নাই। বাজারের নীচেই বিদ্যুতালোকিত প্রশস্ত চৌমাথা রাস্তা, সেখানে নামিয়া অবিলম্বেই টের পাওয়া গেল যে, এই পাপ-পৃথিবীতে এমন লোকের অভাব নাই, যাহারা চাকরের মাথায় ভোজের গুরু আয়োজন এবং মনিবের হাতে বোতল ও তৎসঙ্গে প্রচুর প্রসন্নতার ভাব দেখিলে একেবারে উলটা রকম মীমাংসা করিয়া বসে।

একজন আড়চোখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হানিয়া গেল। আর একটু যাইতে

এক ছোকরা তাহার বন্ধুর গা ঠেলিয়া আমায় দেখাইয়া দিল। একটু দূরে পানের দোকানের সামনে কয়েকজন হিন্দুস্থানী দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছিল, একজন সকলের দৃষ্টি আমার দিকে আকর্ষণ করিয়া মাথা দুলাইয়া বলিল, আলবৎ বড়াদিন হ্যায় ইয়ার; বড়ে খুশ-মেজাজমে হ্যাঁয়!

ইচ্ছা হইল, ব্যাটার মাথার উপর বোতল দুইটা আছড়াইয়া প্রমাণ করিয়া দিই যে, তাহার মধ্যে এমন কিছু ব্যাপার নাই, যাহাতে তাহাদের অর্থে খুশ-মেজাজ হইবার সম্ভাবনা আছে। কোন রকমে রাগটা চাপিয়া চৌমাথাটা ছাড়াইয়া গেলাম। মুখের প্রসন্ন ভাবটা আর টানিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইল না; বেশ সহজে মিলাইয়াও গিয়াছিল। বোতল দুইটা কিন্তু সেই ভাবেই রহিল। দুর্ব্বল মনের সঙ্গে যে তর্কটা হইতে লাগিল, তাহাতে এই কথাটাই আমি ধরিয়া রহিলাম—কেন, আমার ভিতরে যখন কোন রকম কু নাই, বিশেষ করিয়া যখন বোতলের ভিতরেও কোন রকম কু নাই, তখন ভয় পাইতে যাইব কেন? কাল এই সময় এই পথ দিয়াই এক হাতে একটা পশমের বাণ্ডিল আর অন্য হাতে সাবানের বাক্স লইয়া গিয়াছি। তফাতটা কি হইল এমন? আমায় যাহারা চেনে না, তাহারা যা ইচ্ছা মনে করুক; চেনে যাহারা, তাহারা তো আর—

চেনা লোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়াও গেল, আর বেশ ভাল লোকের সঙ্গেই। করুণাময়বাবু, জেলা-বোর্ডের আপিসে কাজ করেন। বয়স হইয়াছে, অথচ খুব আমুদে আর মিশুক। এইজন্য, আর তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের জন্য সবাই চায় তাঁহাকে। বেহারে চার পুরুষ আছেন, —এইটি প্রয়োজনভেদে কখনও সগৌরবে, কখনও বা দুঃখের সহিত জাহির করিবার একটি বাতিক আছে; ভাষার মধ্য দিয়াও বেহার মাঝে মাঝে উঁকি মারে।

একটু দূর হইতেই দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া একগাল হাসিয়া বলিলেন, এই যে শৈলেনবাবু, ভাল তো? আরে, এ যে বড় কা ভোজের আয়োজন! কি কপি মশায়! বেহারে চার পুস্ত্ কেটে গেল, কিন্তু এমন কপি তো দেখি নি—বাঃ, সঙ্গ নোব নাকি?

একটু কম দেখেন, কাছে আসিতে বোতল দুইটিতে নজর পড়িল। আমি হাসিয়া উত্তর দিতে যাইতেছিলাম, তাঁহার মুখের হঠাৎ নিষ্প্রভ ভাব দেখিয়া আর রা সরিল না। কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, ও দুটো—?

আমি একটা ঢোঁক গিলিয়া হাসির সঙ্গে সহজভাবে বলিবার চেষ্টা করিলাম, কিছু নয়। বোতল দুটো,—একটাতে ফেনাইল আছে, একটা খালি, নারকোল-তেল রাখবার জন্যে কিনে নিয়ে—

করুণাবাবু খুব আগ্রহের সহিত এবং অতি সহজে বিশ্বাস করিয়া লইলেন; আমাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—সে কি কথা, রাম কহো—ওই তো সাফ লেখা রয়েছে, 'ফেনাইল'; আমি কানা মানুষ পড়তে পারছি, আর কার সন্দেহ হবে? ছি ছি, সে কথা কি ভাবতে আছে?

শীতেও আমার কপালে ঘাম জমিয়া উঠিতেছিল। অনেক কষ্টে কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলাম, হ্যাঁ, সঙ্গ নেবেন বললেন, চলুন না, আজ বড়দিনের রাতটা পাঁচজনে একসঙ্গে ব'সে একটু আমোদ-প্রমোদ—

হঠাৎ চমক ভাঙিল, ভাষা আমায় এ কোন্ দিকে লইয়া যাইতেছে? সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, আজ আপনার মত আমুদে-আহ্লাদে লোকই তো—

আরও সংঘাতিক হইয়া যায় দেখিয়া থামিয়া তাঁহার মুখের দিকে

ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া আন্তরিকতা ও সৌজন্যের হাসি হাসিবার চেষ্টা করিলাম এবং বেশ অনুভব করিলাম, সেটা মৃতের হাসির মত মুখটাকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে মাত্র।

করুণাবাবুও কেমন এক অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, না, আমি বাজ্ আসছি, আমায় আজ মাফ করবেন। যেতুম নিশ্চয়, আপনার বাড়ি যাব, তাতে আর—তবে কথা হচ্ছে, কি রকম শীত পড়েছে দেখেছেন? বেহারে চার পুস্ত্ কেটে গেল মশায়, কিন্তু এবারের মত শীত—এক্কেবারে যাকে বলে ঠাড়—

বলিলাম, শীতেই তো বড়দিনের খাওয়া-দাওয়ার জুত বেশি করুণাবাবু, একটু গান-বাজনার বন্দোবস্তও করেছি। যখন পাওয়া গেছে ভাগ্যক্রমে আপনাকে, তখন আর—

করুণাবাবুর চোখ দুইটা আর একবার বোতলের উপর গিয়া পড়িল, তাহার পর নাছোড়বান্দা মাতালের হাতে পড়িলে লোকে যেমন বিব্রত হইয়া পড়ে, অনেকটা সেই ভাবে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, না না শৈলেনবাবু, শীত এমনই কথায় বলছিলাম। চার পুস্ত্ বেহারের জান-নেকলানো শীতের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল, আর এ তো সামান্য। একটা কাজ আছে এই দিকে—আচ্ছা, তবে আসি।

হঠাৎ নমস্কার করিয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন।

নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এ কি বিষম ফাঁফরে পড়া গেল! আমি যেন অপরিচিত একজন কে! এই দশ মিনিট পূর্ব্বে যে আমি ছিলাম, যেন সে নয়। বোতল দুইটার পানে চাহিলাম; ইচ্ছা হইল, সামনে লোহার পোস্টে ঘা দিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলি:—এই হতভাগা দুইটার জন্য নিতান্ত সহজ সাদা কথা যাহা বলিয়াছি, তাহারও মানে এক ধার হইতে বিগড়াইয়া গিয়াছে।

ছোঁড়াটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হ্যাঁ রে পুনিয়া, পোঁটলার মধ্যে গুঁজে-গাঁজে দিলে বোতল দুটো নিয়ে যেতে পারবি নি ?

বলিল, কাহে না ? উতার দি' মোটরিঠো।—অর্থাৎ কেন পারব না ? মোটটা নামাইয়া দাও।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তাড়াতাড়ি মোটটা নামাইয়া দিলাম। পুনিয়া ঘাড়ে গোটা তিন-চার ঝাঁকানি দিয়া এবং হাত দুইটা কয়েকবার ঝাড়িয়া দুই-তিনবার পায়চারি করিয়া লইল।

রাস্তার ধারে মোটটা নামিতেই গোটাকতক চ্যাংড়া জুটিয়া হাজার রকম আন্দাজ করিয়া তর্কবিতর্ক জুড়িয়া দিল। একটা বলিল, সাদি হ্যায়।—মানে, বিয়ে আছে।

একটা বলিল, কভি নেহি, বাঙ্গালীলোক সাদিমে দারু পীতা নহি হ্যায়।—বলিয়া ইশারা করিয়া বোতলের দিকে দেখাইয়া দিল।

ভাগো হারামজাদা সব।—বলিয়া খেদাইয়া দিয়া বোতল দুইটা গুঁজিবার জন্য একটা পোঁটলার গেরো খুলিতেই চাকরটা নাকী স্বরে বলিয়া উঠিল, মোটরি গিরেসে হাম্‌নিকে না কহব।

চোখ তুলিয়া বিস্মিতভাবে কহিলাম, মোট প'ড়ে গেলে তোকে কিচ্ছু বলতে পারব না ? বটে ! এই দুটো বোতলের চাপেই তোর মোট প'ড়ে যাবে ? বেয়াকুব পেয়েছিস আমায় ?

তাহার পর আমার কাছে উপর-চাল দিয়া, খানিকটা ও রকম আরাম করিয়া লইবার জন্য অত্যন্ত রাগ হওয়ায় বোতল দুইটি জবরদস্তি পোঁটলার মধ্যে ঠুসিতে ঠুসিতে বলিলাম, ফেল্‌ পুঁটলি তোর যদি সাহস থাকে, ব্যাটা হারামজাদা কোথাকার। যত কিছু বলি না—

বোতল বহাইতামই, সেও কিছু ফেলিতে সাহস করিত না, আর এইখানেই আমার বোতল-বিড়ম্বনার অবসানও হইত ; কিন্তু ঠিক এই

মোহড়ায় হঠাৎ অনাথ আসিয়া আমায় 'মর‍্যাল কারেজ'—কিনা সৎসাহসে উৎসাহিত করিবার জন্য একেবারে মরণবাঁচন জিদ করিয়া পড়িল।

অনাথের সঙ্গে আজিকার পরিচয় নয়,—সে আমার বাল্যবন্ধু। তাহার কথা মনে হইলেই সঙ্গে সঙ্গে খুব ছেলেবেলার একটি দৃশ্য চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। রেলের পুলের নীচে দুই পা ফাঁক করিয়া, বুক চিতাইয়া অনাথ নাকের মধ্য দিয়া দুইটি নিরেট-গোছের ধোঁয়ার স্রোত ছাড়িতেছে; ডান হাতে একটি দগ্ধপ্রান্ত সিগারেট, সামনে আমরা হাঁ করিয়া সপ্রশংস বিস্ময়ে চাহিয়া আছি।

এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত একসঙ্গে ছিলাম, তাহার পর কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়ি। আবার কালের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আমরা দুইজনে এক জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছি—অনাথের পক্ষে সুরার স্রোতেও বলা চলে। শুনা যায়, একদিন নাকি খুব গুলজার আড্ডা হইতে রাত করিয়া টলিতে টলিতে ফিরিবার সময় তাহার মনে এই কথাটা হঠাৎ গাঁথিয়া যায় যে, টাকাই যত অনিষ্টের মূল। মাহিনার টাকাটা পকেটে ছিল। কোন রকমে পাপ বিদায় করিবার জন্য সে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া উঠিল। কিছু স্টেশনের হোটেলে দিল; দিয়া সদ্য-বৈরাগ্যের তাড়নায় ৺পুরীধামের একখানি টিকিট কাটিয়া ফেলিল। তাহার পর দেরাদুন এক্সপ্রেসে চড়িয়া কেমন করিয়া পাটনার গঙ্গা পার হইয়া একেবারে এখানে—মজঃফরপুরে। তাহারই মুখে শোনা গল্প। বলে, ভাই, ভুলটা বুঝতে পেরে সারাদিন সারারাত যতই গাড়ি বদলাতে যাই, যতই আঁকুপাঁকু করি, ততই দেখি, উল্টো পথে চলেছি। রেলগাড়িকে

কখনও বিশ্বাস করিস নি শৈলেন ; তবে এও একটা কথা, মহাপ্রভু রথের কাছি দিয়ে না টানলে তো হবার জো নেই কিনা !

এখানে এক জমিদার-জহুরী এই মানিকটিকে চিনিতে পারিয়া মাথার মণি করিয়া রাখিয়াছেন। অনাথ বলে, যাক ভাই, নেপালের পশুপতি-নাথের খুব কাছেই রইলাম, বুড়ো একটা ডাক দিলেই গাড়িতে গিয়ে উঠব।

একটা বোতল পোঁটলায় পুরিয়া আর একটা তুলিয়াছি, অনাথ আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। পা দুইটা একটু একটু টলিতেছে, চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত। গাঢ় জড়িতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের শৈলেন না ? ব্যাপার কি রাজা ?

বলিলাম, অনাথ যে ! ব্যাপার কিছু নয়, দুটো বোতল ছোঁড়াকে নিয়ে যেতে বলছি, তা নানান রকম ছুতো লাগিয়েছে, তাই—

চক্ষু দুইটিকে যথাসম্ভব বিস্ফারিত করিয়া অনাথ বলিল, বোতল ! দুটো বোতল। কবে থেকে তোর এ সুমতি—

চাকরটা বোধ হয় তাহার মনিবের মান বাঁচাইবার জন্য বলিল, ফিনাইল তো বা।

অনাথ আমার পানে চাহিয়া একটু মুচকিয়া হাসিল, তাহার পর কৃত্রিম রাগের সহিত চাকরটাকে ধমক দিয়া বলিল, ফেনাইল নেহি তো ক্যা রহেগা ? হাম জানতা নেহি ? আলবৎ ফেনাইল হ্যায়। চোপ রও।

তাহার পর আমার প্ল্যান তাহার বুঝিতে বাকি নাই, আর সে চাকরের কাছে ফাঁস করিবার ছেলে নয়—চতুর দৃষ্টিভঙ্গীতে আমায় এই কথা জানাইয়া প্রশ্ন করিল, আর এই শরবতের বোতলটা—এতে দিশী শরবত, না বিলিতী শরবত ভাই ?—স্মিত হাস্যে চাহিয়া ঈষৎ টলিতে লাগিল।

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, আঃ, কি পাগলামি করিস? এই দেখ্ না বাপু, কি রকম বিলিতী শরবত নিয়ে যাচ্ছি।—বলিয়া খালি বোতলটা উল্টাইয়া দেখাইতে যাইব, অনাথ খপ করিয়া হাতটা ধরিয়া বলিল, আমি তোকে অবিশ্বাস করতে পারি শৈলেন? তোকে আজ দেখছি?

বিব্রত হইয়া বলিলাম, তা হ'লে পথ ছাড়্, এখন যাই; রাস্তার মাঝে একটা হৈ-চৈ করিস নি।

অনাথ আমার ডান হাতটা দুই মুঠায় ধরিয়া হঠাৎ কাঁদ-কাঁদ হইয়া সুরাদ্রব আবেগের সরু মোটা নানান স্বরে বলিল, ছাড়ছি পথ। আর কখনও তোমার পথ আগলে দাঁড়াব না, কিন্তু আজ প্রাণে যে কি চোট দিলি শৈলেন—ও-ফ!

কি গেরো! আজ কাহার মুখ দেখিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম! জিজ্ঞাসা করিলাম, দেখ্ দিকিন! কি আবার চোট দিলাম প্রাণে তোর?

অনাথ 'ও-ফ' করিয়া আর একটা বুকভাঙা শব্দ করিয়া গদ্গদস্বরে বলিল, আজ অনাথ এতই পর হ'ল? ধরেছিস তো তাকেও লুকোতে হয়?

বলিলাম, ভ্যালা বিপদ। পর হতে যাবি কেন? কিন্তু ধরেছি তোকে কে বললে?

অনাথ অভিমানভরে বলিল, কেউ না। তুই নিজেই যখন লুকোচ্ছিস তো অন্য আর কে বলতে যাবে ভাই?

বলিলাম, কি আশ্চর্য্য! লুকোবার কোনও কথাই নেই তো লুকোতে যাব কেন?

আমার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া অনাথ বলিল, এই কথাই তো শুনতে চাই ভাই। আমার কাছে—তোর সেই ছেলেবেলার অনাথের কাছে এ কোন্ একটা লুকোবার কথা শৈলেন?

এ কি ভাষার প্যাঁচে পড়া গেল মাতালের হাতে! এখন ইহাকে বুঝাই কি করিয়া? এর মুখ দিয়াই কথাটার জট খুলিয়া লইবার জন্য প্রশ্ন করিলাম, কি কোন্ একটা লুকোবার কথা বলছিস বল্ দিকিন?

যেটা লুকোচ্ছিলি।

কিছুই তো লুকোই নি; তুই বিশ্বাস না করলে কি করব?

বিশ্বাস তো করেছি ভাই।

অনেকটা আশান্বিত হইয়া বলিলাম, কি বিশ্বাস করেছিস বল্ তো?

যা আর লুকোচ্ছিস না।

একেবারে হতাশ হইয়া গেলাম। আপাতত নিস্তার পাইবার জন্য বলিলাম, এমন ফ্যাসাদে মনিষ্যি পড়ে! আচ্ছা ভাই, স্বীকার করছি, ধরেছি, এখন পথ ছাড়, দেরি হয়ে যাচ্ছে। ওই দেখ, চাকরটা আবার মোড়লি ক'রে ছোঁড়াগুলোর সামনে পরিচয় দিতে লেগেছে। পুনিয়া, এদিকে আয় হারামজাদা।

অনাথের কাঁদ-কাঁদ ভাবটা যেমন হঠাৎ আসিয়াছিল, তেমনই হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। আমার হাতটা ছাড়িয়া সিধা হইয়া দাঁড়াইল এবং আমার মুখের উপর সুরালস চক্ষু দুইটি খানিকক্ষণ নিবদ্ধ করিয়া গম্ভীর-ভাবে কহিল, ছাড়ছি পথ; তোমার পথ রোখবার আমি কে? শুধু একটি কথা জিজ্ঞেস করব, দয়া ক'রে উত্তর দেবে কি ভাই শৈলেন?

এ আর এক ভাব! অত দুঃখেও হাসি রুখিতে পারিলাম না; বলিলাম, না দয়া করলে তো উদ্ধার নেই, বল!

আমরা না স্বরাজ চাই?

উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া উত্তর করিলাম, তা চাই বইকি।

আর এমন মর‍্যাল কারেজ নেই যে, রাস্তা দিয়ে নিজের জিনিস

দুটো বুক ফুলিয়ে হাতে লটকে নিয়ে যাব! ধিক, কোন্ মুখে আমরা—

রাগ সামলাইতে পারিলাম না; বিশেষ করিয়া এই জাতীয় একজনের উপর ঝাল ঝাড়িবার দরকারও ছিল; বলিলাম, দোষ কি? জিনিসটা তোমাদের হাতে প'ড়ে এমন সুযশ লাভ করেছে যে, একটু আবছায়া হ'লে গঙ্গাজল ভর্ত্তি ক'রে নিয়ে যেতেও পা ওঠে না। এইটুকু আসতেই যে কি দুর্ভোগ হয়েছে!

অনাথ ত্রিভঙ্গ হইয়া টলিতে টলিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, দুর্ভোগ! এই আমি বোতল নিয়ে যাচ্ছি, একটি কথা যে বলবে, তার দু সারি দাঁতের ওপর এই দুটো বোতল ভাঙব।

একটা মতলব ঠাহর করিলাম। নিম্ন হইয়া কহিলাম, হ্যাঁ, তা হ'লে আর দুর্ভোগের মোটেই ভয় থাকে না। কিন্তু তোর অত হাঙ্গাম ক'রে কাজ কি অনাথ? আমি এইটুকু পথ কাটিয়ে যাব 'খন। তোকে দেখেই বোধ হচ্ছে, যেন বিশেষ একটা দরকারী কাজে যাচ্ছিস; তোকে আর আটকে রাখতে চাই না।

দরকারী কাজের কথায় অনাথের মনটা যেন একটু ভিজিল; ভারিক্কে হইয়া বলিল, দরকারী! এত দরকারী যে—

ঔষধ ধরিয়াছে আশা করিয়া তাড়াতাড়ি তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমায় বলতে হবে না, আমি বুঝি না? তা হ'লে আয় গিয়ে। নে পুনিয়া, তোল্।

পুনিয়া পা বাড়াইতেই অনাথ হাত উঠাইয়া তাহাকে বারণ করিল। আমার পানে চাহিয়া বলিল, কিন্তু খুব দরকারী ব'লেই আরও যাব না; তা না হ'লে আর স্যাক্রিফাইস হ'ল কি? আমি মর‍্যাল কারেজের জন্যে আজ সব দরকারী কাজ ত্যাগ করতে চাই, এই দরকারী জীবনটা পর্য্যন্ত।

বুদ্ধিমান মাতালের উপর বেশি রাগ ধরে ; ও যে আমার কথাটাই এ রকম কাজে লাগাইবে, তাহা ভাবি নাই। বিরক্ত হইয়া বলিলাম, নে ছাড়্, রাস্তার মাঝখানে একটা কেলেঙ্কারি—

চাকরটাকে ধমকাইয়া বলিলাম, আয় না ব্যাটা বদমাইশ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে তখন থেকে !

অনাথ বোতল দুইটা বগলে করিয়া রাস্তায় বসিয়া পড়িল। বলিল, সত্যাগ্রহ করলাম—আমি গান্ধীর চেলা, মাড়িয়ে যাও।

বোতল দুইটা হাতের মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া বলিল, জান যায় তবভি নিমক নেহি দেগা।

বেশ ভিড় দাঁড়াইয়া গিয়াছে ; এমন কি একটা ঝালচানাওয়ালা তাহার খঞ্চে নামাইয়া বেশ দুই পয়সা করিয়া লইতেছে। নানা রকম টিপ্পনী, পরামর্শ, উৎসাহবাণী।

লজ্জায় অপমানে আমি সত্যই ধৈর্য্য হারাইতেছিলাম। অনাথ বোধ হয় সেটা একটু একটু বুঝিল। বলিল, আচ্ছা, এস, রফা করা যাক—গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট। হয় আমায় নিয়ে যেতে দাও, না হয় তুমি বুক ফুলিয়ে নিয়ে যাও—ইস মাফিক। চাকরকে দিতে পারবে না, আমি চাই রয়্যাল কারেজ—নিজের মাল নিজে নিয়ে যাব, তার আবার—

তাড়াতাড়ি বলিলাম, আচ্ছা, দে, আমিই নিয়ে যাচ্ছি।—বলিয়া বোতল দুইটা তাহার হস্ত হইতে লইলাম, এবং এই সুযোগ হারাইবার ভয়ে তাড়াতাড়ি চাকরটার মাথায় মোটটা তুলিয়া দিয়া দ্রুত পা চালাইয়া দিলাম।

কানে গেল, অনাথ সমবেত দর্শকদের বুঝাইতেছে, হামারা লঙ্গোটিয়া ইয়ার হ্যায়, নয়া শুরু কিয়া—ডরতা হ্যায়।

ইহার পর কলেজের এক দল ছাত্র রাস্তায় পড়ে। তাহাদের অনেকেই আমার সহিত পরিচিত। কিন্তু হঠাৎ তাহাদের ভাবপরিবর্ত্তন দেখিয়া মনে হইল, তাহারা যেন আমার যথেষ্ট পরিচয় এতদিন পর্য্যন্ত পায় নাই বলিয়া ঠাহর করিয়া ফেলিয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে বাড়ি ফিরিলাম, আচ্ছা অভিশপ্ত জিনিস তো, সূর্য্যাস্তের পরে যেন মানেই বদলাইয়া যায়; তখন সঙ্গে লইয়া আর রাস্তা চলিবার জো নাই।

প্রসন্ন মুখে চলিলে বলিবে, ফুর্ত্তি আর ধরে না; লজ্জিতভাবে চলিলে বলিবে, এখনও আনাড়ী; যদি সহজভাবে চল, বলিবে, বোঝে কার সাধ্য, একেবারে ঝানু; খোলাখুলি লইয়া গেলে বলিবে, ঘাগী, বেপরোয়া; একটু পর্দ্দার মধ্যে লইয়া গেলে বলিবে, চোখে ধূলো দিচ্ছে; রাগিলে বলিবে, বেহেড; না রাগিলে বলিবে, পাঁড়, বেমালুম হজম ক'রে ফেলেছে।

সবচেয়ে বিপদের কথা এই যে, বুঝাইতে গেলে এত গভীর বিশ্বাসে এবং এত সহজে বুঝিয়া বসিবে যে, প্রমাণ দিয়া যে ধারণাটা মন হইতে একেবারে নির্ম্মূল করিব, তাহার অবসরই পাওয়া যাইবে না।

বলা বাহুল্য, অত আড়ম্বর করিয়া বাজার করাই সার হইল; মনের সে অবস্থায় আর বড়দিন জমিতে পাইল না।

সমস্ত রাত ভাল ঘুমই হইল না। কেবল এলোমেলো স্বপ্ন—বোতলগুলার যেন হাত পা গজাইয়াছে, তাহাদের নানা ভঙ্গীতে নাচ, এদিকে গৃহস্থালির বাকি তৈজসপত্র যে অতবড় মীটিং করিয়া তাহাদের হুঁকা তামাক বন্ধ করিয়া জাতে ঠেলিল, স্ফূর্ত্তির চোটে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। স্বপ্নের না আছে মাথা, না আছে মুণ্ড।

পরদিন সকাল হইতেই ইহার জের চলিল, এবং সমস্ত দিন মনে হইল, সবাই অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ আপাতত মুলতুবি রাখিয়া আমার চরিত্র-সংশোধনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে।

সকালেই প্রতিবেশী বৃদ্ধ প্রসন্নবাবু লাঠি হাতে ঠুকঠুক করিয়া হাজির হইলেন। আমতা আমতা করিয়া কথাটি পাড়িলেন, শুনলাম নাকি কাল রাত্রে তুমি—

আমি কথাটা কাড়িয়া লইয়া মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর দিতে যাইতেছিলাম, তিনি নিজেই মাথা নাড়িয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, না না, আমায় সে বলতে হবে না; আমি কি তোমায় জানি না যে, লোকের কথায় বিশ্বাস ক'রে বসব? হেঁ-হেঁ—তবে কথা হচ্ছে, কাজ কি ও বিলিতী ফেনাইল-টেনাইলে—দিব্যি শুদ্ধ গোবরজল রয়েছে—

আমি শেষ কথাটার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া মুখ তুলিতেই একটু হাসিয়া বলিলেন, বুড়ো সেকেলে লোক আমরা, একটু হেঁয়ালিতেই কথা কওয়া অভ্যেস—তা তুমি বুঝবে বইকি। তা ওই যা বললাম বাবা, শরীর-টরির একটু খারাপ রইল নেহাত, এক দলা সিদ্ধি চালিয়ে দিলে, দিশী শুদ্ধ জিনিস, শিবের ভোগে লাগে। আর ওসব? নাঃ, ছি ছি! ও বোতল-টোতলের ধার দিয়েও যেও না। একটা বিশেষ কাজ ছিল যদু ডাক্তারের কাছে, তা ভাবলাম, আগে শৈলেনের সঙ্গে দেখাটাই ক'রে যাই—ছেলেমানুষ, উঠতি বয়েস—

প্রসাদের ঔষধের দোকানে একটা কাজ ছিল। যাইতেই বলিল, হ্যাঁরে, কাল কি কাণ্ড করেছিস? করুণাবাবু মুখ গম্ভীর ক'রে ক্রমাগত

ব'লে বেড়াচ্ছে, বেহারে চার পুস্তু হয়ে গেল মশায়, এমন চাপা মাতাল তো একটাও চোখে পড়ল না !

বিরক্তভাবে চাহিতে বলিল, বিশ্রী রকম ঠাণ্ডা পড়েছে, যদি শরীর খারাপ হয়েছিল তো আমায় বললেই হ'ত, একটা মেডিসিন ডোজ় দিয়ে দিতাম। এই আমিই তো কখনও কখনও—তোমার গিয়ে, শরীর-টরির ম্যাজম্যাজ করলে—

মনটা তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল, মরিয়া হইয়া গম্ভীরভাবে বলিলাম, আমার আর মেডিসিন ডোজে পোষায় না।

অফিসে বড়বাবু বলিলেন, ছিঃ শৈলেনবাবু, এখন এই গান্ধীর যুগে কোথায় লোক ছাড়ছে ; আপনি এতদিন মতিস্থির রেখে—

মতিস্থির আর রইল না মশাই।—বলিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলাম।

কথাটা এক হিসাবে ঠিকই ছিল। কাল সন্ধ্যা হইতে যা অবস্থা চলিয়াছে, ইহাতে মতিস্থির থাকা দুষ্কর। অন্যে পরে কা কথা, এমন কি অনাথ পর্য্যন্ত আমার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। দেখা করিয়া আগ্রহভরে কহিল, না, তোকে ছাড়তেই হবে। এ যে কি পাপ জিনিস ! আর একবার যদি ধরেছিস তো হাজার চেষ্টা ক'রেও আর ছাড়তে পারবি নি।

আমি বলিলাম, কাল লাল চোখে না হয় বিশ্বাস করতে পারিস নি ; কিন্তু আজ সাদা চোখে কেন বিশ্বাস করতে চাইছিস না যে, আমি ধরি নি ?

সেই কথাই তো বলছি, সাদা চোখে তো আর ভুল হবে না। কিন্তু যাক, আর ধরিস নি, মাইরি।

ওর সেই গোলমেলে তর্ক। উত্যক্ত হইয়া বলিলাম, না, ছাড়তে আমি পারব না। যা, আর ত্যক্ত করিস নি।

মনটা লজ্জা, রাগ, বিরক্তি প্রভৃতি নানান খানায় এমন খিঁচড়াইয়া রহিল যে, বিকালবেলায় আর বাহির হইতে ইচ্ছা হইল না। বলা বাহুল্য, তাহাতে ফল ভাল হইল না ; কেন না, আমার দরদীর দল কাল্পনিক মূর্ত্তিতে আমার শূন্য মনের মধ্যে আসিয়াই ভিড় জমাইলেন, এবং তাঁহাদের সঙ্গে মানসিক দ্বন্দ্বে আমার মাথাটা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একেবারে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, এ কাজের কথা নয়, মাঠের দিকে গিয়া মাথায় একটু পরিষ্কার হাওয়া লাগানো দরকার। পাগল করিয়া দিবে নাকি!

হায়, সন্দেহও করি নাই যে, শেষ চোপটি, আর সবচেয়ে মোক্ষম চোপটি তখনও বাকি, আর তা বাড়ির বাহিরেই আমার মস্তকের প্রতীক্ষায় উদ্যত হইয়া রহিয়াছে।

জুতা জমা পরিয়া বাহির হইতেই দেখি, খদ্দর আর গান্ধীটুপি পরিহিত কতকগুলি ছেলের একটি মাঝারি গোছের দল দুয়ারগোড়ায় দাঁড়াইয়া ; কালকের কয়েকজন কলেজের ছেলেও তাহাদের মধ্যে। দেখা হইতেই অত্যন্ত বিনীতভাবে সবাই কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া অভিনন্দন করিল।

অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলাম, পূর্ব্বাহ্ণেই জাতীয়-পতাকাধারী একটি যুবক অগ্রসর হইয়া আর একটি অধিকতর বিনীত অভিবাদন করিয়া বলিল, আমাদের কর্ত্তব্য অতি কঠিন, মাফ করবেন—আপনাকে আজ বেরুতে দিতে পারি না আমরা।

বুঝিতে বাকি রহিল না, শ্রাদ্ধ অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে,—এ বাড়ি বহিয়া লিকার-পিকেটিং। ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল, তবুও শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ রকম কঠিন কর্ত্তব্য করার আপনাদের উদ্দেশ্য ?

যুবক যুক্তকরেই দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল, উদ্দেশ্য দেশমাতাকে বন্ধনমুক্ত করা।

প্রশ্ন করিলাম, তার সঙ্গে আমায় আপাততত বন্ধনে ফেলার কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে কি ?

সেই রকম বিনীত উত্তর হইল, আপনি শিক্ষিত, আপনার সঙ্গে কি তর্ক করব ? তবে একবার ভেবে দেখুন, জিনিসটা কতই গর্হিত। আমেরিকা সেইজন্যেই স্পেশাল ল ক'রে জিনিসটাকে দেশছাড়া করেছে।

বলিলাম, আচ্ছা, আপনারা সত্যিই কি সন্দেহ করেন যে, আমি বাজার থেকে বোতল ক'রে মদ নিয়ে—

যুবক সসঙ্কোচে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না না, সন্দেহ আমরা কি কখনও করতে পারি ?

তা হ'লে কি আপনারা এ বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ ? দেখুন, কাল থেকে এই ধরনের তর্ক শুনতে শুনতে আমার মাথার ঠিক নেই। অথচ ব্যাপারটা—

দলের মধ্যে আর একটি যুবক সামনে আগাইয়া আসিল এবং মাথা নীচু করিয়া গভীর বিনয়ের স্মিত হাস্যের সহিত বলিল, আমার অপরাধ নেবেন না ; আপনি মাথা ঠিক না থাকার প্রকৃত কারণটা বোধ হয় ধরতে পারেন নি ; তবে মাথাটা যে ঠিক নেই, এইটুকু স্বীকার ক'রে আমাদের কাজটা অনেক হালকা ক'রে দিয়েছেন, এবং সেইজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।

হাঁ করিয়া রহিলাম, এর উপর আবার 'ধন্যবাদ' চাপায় !

প্রথম যুবকটি বলিল, অনেকে এইটুকুও লুকোতে চান কিনা।

আর একটি যুবক শীলতায় ইহাদেরও উপরে গিয়া বলিল, অথচ লুকোবার জো নেই—কথাবার্ত্তায়, হাত-পার ভঙ্গীতে আপনি বেরিয়ে আসবে। আশা করি, আমাদের কথায় অফেন্স নেবেন না আপনি। আসলে আপনার এখনও কালকের ব্যাপারের আফ্‌টার এফেক্ট চলছে।

এমন বিনয়ের অত্যাচারের কখনও অভিজ্ঞতা ছিল না। অস্বস্তির চোটে মনে হইতেছিল, হাত পা ছুঁড়িয়া চীৎকার করিয়া একটা কিছু করি। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া বলিলাম, দেখুন, আপনারা সকলেই ভদ্রসন্তান, সহজেই বিশ্বাস করতে পারবেন। ব্যাপারটা হচ্ছে —কাল সন্ধ্যার সময় চাকরের মাথায় কিছু তরিতরকারি আর অন্য দু-একটা জিনিস দিয়ে নিজে একটা ফেনাইলের বোতল আর তেল রাখবার জন্যে একটা খালি বোতল কিনে নিয়ে আসছিলাম। শীতের কনকনানিতে বোতল দুটো র‍্যাপারের মধ্যে—

পতাকাধারী যুবকটি বলিল, আমাদের অত কষ্ট ক'রে কিছুই বলতে হবে না আপনাকে। শুধু অনুরোধ, আপনি অভ্যেসটা ছাড়ুন।

মাথায় যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল, মুখের চেহারাতেও তাহার উত্তাপ অনেকটা প্রকাশ পাইয়া থাকিবে। তবুও ধীরকণ্ঠেই বলিলাম, বেশ, ছাড়ব; মাসে একটা ক'রে ফেনাইলের বোতল আনলে এমন কিছু অভ্যেসও হয়ে যায় না। এখন অনুগ্রহ ক'রে আমায় একটু পথ ছেড়ে দিন; একটু ঘুরে আসা নিতান্ত দরকার হয়ে পড়েছে।

পতাকাধারী অন্য সবাইয়ের দিকে চাহিয়া ঠোঁট চাপিয়া একটু হাসিল। তাহার পর আমার পানে চাহিয়া বলিল, দরকার হয়ে পড়াটা স্বীকার করি। কিন্তু যেতে দেওয়ার আমাদের অধিকার নেই; ক্ষমা করবেন।

আর একজন কথাটাকে একটু পরিষ্কার করিয়া দিল, সন্ধ্যার সময়েই আমাদের বেশি সাবধান থাকতে হয় কিনা।

ইহাদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা; ইহাদের গালাগালও ক্রমে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। অগ্রণী যুবকটির দিকে চাহিয়া বলিলাম, আপনাদের অধিকার আমার মাথায় ঢুকছে না; আমি জানি, আমার যাবার অধিকার আছে।—বলিয়া পা বাড়াইলাম।

যুবক আমার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া সঙ্গীদের দিকে ফিরিয়া বলিল, তা হ'লে তোমাদের এইবার আত্মিক বল প্রয়োগ করতে হ'ল।

সেটা আবার কি আকৃতিতে দেখা দিবে, ভাবিয়া ঠিক করিবার পূর্ব্বেই দলের সব যুবকগুলি সটাং রাস্তার এমুড়ো ওমুড়ো জুড়িয়া চিত হইয়া শুইয়া পড়িল; সামনে এতটুকু আর পা ফেলিবার জায়গা রহিল না।

আমার কান্না আসিতেছিল। রাস্তায় লোক জড়ো হইতেছিল। আমি কিছুক্ষণ একটা কথাও কহিতে পারিলাম না। অত অত্যাচারের মধ্যেও এইটুকু বুদ্ধি ছিল যে, আর এ লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে গেলেই সমস্ত পাড়া জাগাইয়া একটা গুলতান হইবে। অনেক চেষ্টায় মনটাকে সাধ্যমত গুছাইয়া লইয়া বলিলাম, আচ্ছা, আপনারা যদি তাতেই সন্তুষ্ট হন তো আমি আর বার হব না, আপনারা যান।

যুবক কোন উত্তর না দিয়া নিশ্চলভাবে ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অন্য সবাই সেই অবস্থায় পড়িয়া। রাস্তার ওদিক হইতে দর্শকদের প্রশংসাবাণী আমার কানে আসিয়া ধিক্কারের মত বাজিতে লাগিল।

বলিলাম, যান আপনারা, কেন আর কষ্ট করবেন; আমি বেরুব না তো বলছি।

শুধু বাইরের শত্রুকে না আনলেই তো হ'ল না, ঘরের শত্রুকেও বিদেয় করতে হবে। আমরা এইজন্যে আপনার মধ্যে যে দেবতা আছেন, তাঁর কাছে ধন্না দিয়ে রইলাম।

আমি আর রাগ চাপিতে পারিলাম না। গলা একটু চড়াইয়া বলিলাম, দেখুন, আমার মধ্যেকার দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে দানবকে চটাচ্ছেন মাত্র। আচ্ছা, আপনারা কি বলতে চান যে, আমি বাড়ির মধ্যে বোতল ভ'রে—

আমাদের কেন লজ্জা দিচ্ছেন?

ও! আর আমার বুঝি লজ্জা ব'লে জিনিস নেই? ইঙ্গিতে কিছুই বলতে তো বাকি রাখলেন না? আর এদিকে বাইরেও যেতে দেবেন না, বাড়িতেও স্থির হয়ে থাকতে দেবেন না, যেন কতবড় অপরাধ করেছি! তাও ছাই যদি স্পষ্ট ক'রে বলেন, কি করলে আপনাদের বিশ্বাস করাতে পারি, কি প্রমাণ দিলে—আচ্ছা বেশ, থামুন। এর চেয়ে তো আর বড় প্রমাণ হতে পারে না?—বলিয়া রাগে মাথা গোঁজ করিয়া বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেলাম এবং তখনই যেখানে ফেনাইল প্রভৃতির বোতল থাকে, সেই কুলুঙ্গি হইতে ভরা বোতল একটা লইয়া বাহিরে আসিয়া তুলিয়া ধরিলাম এবং দলটির পানে চাহিয়া বলিলাম, এই দেখুন, কাল যা নিয়ে এসেছিলাম; না বিশ্বাস হয়, কেউ এসে শুঁকে দেখুন, ফেনাইল কি না।

সবাই অনড়; মুখে অমায়িক অবিশ্বাসের হাসি।

উদ্ভ্রান্ত হইয়া বলিলাম, তবুও বিশ্বাস করবেন না? এ যে মহা জ্বালা! আচ্ছা মশায়, আমি স্বীকার করছি, আমি অপরাধী—এটা ফেনাইল নয়, এটা এক্সা নম্বর ওয়ান—আমায় মার্জ্জনা করুন, আর অমন কর্ম্ম করব না। এইবার যান। এ কি! এতেও নিস্তার নেই? আমার কোন কথাই বিশ্বাস করবেন না? আচ্ছা নিন, আমায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কিসে এতটা মিথ্যাবাদী চরিত্রহীন ক'রে তুলেছে, এই আপনারাই বিচার করুন।

সমস্ত শক্তি দিয়া সামনের দেওয়ালে হাতের বোতলটা আছড়াইয়া দিলাম। বলিলাম, বুঝুন কিসের গন্ধ; এইবার তো আর অবিশ্বাস রইল না যে—

ক্রোধান্ধ হইয়া তাড়াতাড়ি কিসের বোতল যে বাহির করিয়া আনিলাম, খেয়াল হয় নাই। আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই চূর্ণ

বোতল হইতে মেথিলেটেড স্পিরিটের উগ্র সুরাগন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

দলটি ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, একবার বোলো ভাই, গান্ধীজীকি জয়! ত্যাগী শৈলেনবাবুকি জয়!

তাহার পর ক্যাপ্টেনের পরিচালনায় আমায় একটি নম্র অভিবাদন করিয়া সামরিক প্রথায় কুইক মার্চ করিয়া চলিয়া গেল।

আমি মূঢ়ের মত শূন্যদৃষ্টিতে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম।

* * *

যাক, সহৃদয় বন্ধুবান্ধবেরা শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন যে, আমার নষ্ট চরিত্র পুনরায় ফিরিয়া পাইয়াছি। প্রমাণস্বরূপ আটাশে ডিসেম্বরের 'বজ্রবাণী' পত্রিকা হইতে "মজঃফরপুরে সুরা পিকেটিং" শীর্ষক সমাচার হইতে খানিকটা তুলিয়া দিলাম—

"...এই শোচনীয় সংবাদ শুনিয়া পরদিন সন্ধ্যার সময় স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি একদল স্বেচ্ছাসেবককে শৈলেনবাবুর গৃহে সত্যাগ্রহ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। শৈলেনবাবু প্রথমত দারুণ উগ্রভাব ধারণ করেন, ভৃত্য দিয়া স্বেচ্ছাসেবকদের সবিশেষ অপমান করান, এমন কি শেষে পুলিসের সাহায্য পর্য্যন্ত লইবার ভয় দেখান; কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকদের অটুট সহিষ্ণুতা ও অপরিসীম সৌজন্য এবং নম্রতায় মুগ্ধ হইয়া তাহাদের সমক্ষে সুরার বোতল, পানপাত্র, সোডার আধার প্রভৃতি যাবতীয় আনুষঙ্গিক দ্রব্য চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ভবিষ্যতে সুরাত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

আমরা স্বেচ্ছাসেবকদের সাধনা, ধৈর্য্য, এবং শৈলেনবাবুর হৃদয়ের বল—এই উভয়েরই প্রশংসা করি এবং সুরাসেবী মাত্রকেই শৈলেনবাবুর মহনীয় দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে মিনতি করি।"

বর ও নফর

গণশা বলিল, আমার ক-ক-কপালে পরের শ্বশুর-বাড়ি গিয়ে সুখ লেখা নেই। সেবারে কালসিটেয় তিলুর বরযাত্রী হয়ে গিয়ে ওই হ'ল; পরশু মাসীর বাড়ি গেছলাম। মা-মাসী ডেকে ডেকে তেইশ-জনকে পেরনাম করালে, তিনজন ফাউ, সেখানে অত গুরুজন আছে জানলে ওদিক মাড়াতাম না। কো-কোমরের ফিক-ব্যাথাটা এসা আউরে উঠেছে।

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল, ফাউ মানে?

তি-ত্তিনটে তাদের মধ্যে দাসী ছিল, মানে, ঘাড় তুলে দেখবার তো আর ফুরসৎ ছিল না।

কে. গুপ্ত বলিল, ভিড় জিনিসটা ফুটবলের মাঠেই ভাল মশাই; গাড়িতে বলুন, শ্বশুর-বাড়ি, কুটুম-বাড়িতে বলুন—

গোরাচাঁদ বলিল, নেমন্তন্নয় বল, বড্ড অসুবিধেয় পড়তে হয়।

রাজেন জিজ্ঞাসা করিল, নিজের বিয়ের কি হ'ল র‍্যা গণশা? মামা বলে কি?

গণশার মুখটা অদ্ভুতভাবে বিকৃত হইয়া পড়িল। একটু পরে সংক্ষেপে বলিল, কুষ্টির মিল হয় তো গু-গু-গুষ্টির মিল হয় না; ওরা বলে এক, মামারা বলে আর। বিয়ের কথা হচ্ছে, কিন্তু ব-ব্বউয়ের কথা চাপা প'ড়ে গেছে।

ঘোঁৎনা বলিল, আসলে ওর মামারা ঠাউরেছে, এর মধ্যে একটা চাকরি-বাকরি হয়ে গেলে দাঁও মারবে। গ্যাঞ্জেস মিলে তো সেদিন গিছলি, কি বললে?

গোরাচাঁদ বলিল, ভিড়ের কথা যদি বললি তো আমার শ্বশুর-বাড়ি ভাল। বউ, শাশুড়ী, খুড়শাশুড়ী, একটি শালী, শালা আর শালাজ;

পিসেমশাই ব'লে ডাকবে, তার জন্যে শালাজের একটি ছেলেও দিয়েছেন ভগবান, মানে যে কটি দরকার, ঠিক সাজানো, ফালতু ভিড় পাবে না। বাজে মার্কার মধ্যে এক শ্বশুর, তা সে বেচারী সন্ধ্যের পর আফিম খেয়ে প'ড়ে থাকে, নিশ্চিন্দি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ গেল, বোধ হয় সবাই মনে মনে গোরাচাঁদের কথাগুলি রোমন্থন করিতে লাগিল। একটু পরে গোরাচাঁদ আবার বলিল, শিগগির একবার যেতে লিখেছে, শাশুড়ী অনেক দিন দেখে নি কিনা!

রাজেন প্রশ্ন করিল, কবে যাচ্ছিস?

বাবা বলছে, এটা মলমাস; কটা দিন যাক, তারপর।

গণশা বলিল, বে-ব্বেটাছেলের আবার মলমাস! তুই তো আর স্বামীর ঘর করতে যাচ্ছিস না।

রাজেন শিস দেওয়া আরম্ভ করিয়াছিল, থামাইয়া বলিল, আমি তো বুঝি শ্বশুর-বাড়ি যাব, ঠিক যখন কেউ ভাববে না যে, জামাই আসছে। তা হ'লেই তো যার জন্যে যাওয়া, তাকে ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় দেখতে পাব। বলা নেই, কওয়া নেই, হুট ক'রে গিয়ে পড়লাম, বউ বোধ হয় তখন গা ধুয়ে উঠে কালো চুলে রাঙা গামছা জড়িয়ে জল নিংড়োচ্ছে—

গণশা বলিল, ঘুম থেকে উঠে ক-ক্কড়াইমুড়ি চিবোতেও তো পারে, নয়তো মুখ ভেংচে ঝগড়া করছে কারও সঙ্গে—

গোরাচাঁদ রাজেনের মত কবি না হইলেও রাজেনের কথাটা তাহার মনে লাগিল। নূতন বিবাহ তো! একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু তাতে খাওয়া-দাওয়ার একটু অসুবিধে হয়, যোগাড়যন্তর কিছু থাকে না কিনা, আর আমার শ্বশুর-বাড়ি একটু আবার পাড়াগাঁ-গোছেরও।

ত্রিলোচনের নববিবাহের রসচেতনায় একটু আঘাত লাগিল। বিরক্তভাবে বলিল, তোর শুধু খ্যাঁটের চিন্তা গোরা। বিয়ে না দিয়ে কাকা যদি তোর একটা হোটেলে ওয়েটারের চাকরি ক'রে দিত তো—

গোরাচাঁদ বলিল, গণশা, কি বলিস, যাব একবার কাউকে কিছু না জানিয়ে?

গণশা অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছিল, বলিল, চ-চ্চল্ না।

সকলেই একজোটে বলিয়া উঠিল, চল্ না মানে?

গণশা উত্তর করিল, আম্মো তা হ'লে একবার দেখে আসি গোরার শ্বশুর-বাড়ি।

গোরাচাঁদ একেবারে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, গণশার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, চল্ মাইরি; আমার বন্ধু জানলে তারা—

গণশা বলিল, হ্যাঁ, তোর বন্ধু হয়ে গিয়ে বাইরের চালের বাতা গুনি আর তোর আফিমখোর শ্বশুরের বক্তার শুনি!

রাজেন প্রশ্ন করিল, তবে?

ভাবছি, চা-চ্চাকর সেজে গেলে কেমন হয়!

ত্রিলোচন একটু অন্যমনস্ক ছিল; বোধ হয় বিনা খবরে শ্বশুর-বাড়ি যাওয়ার কথাটা লইয়া মনে মনে আলোচনা করিতেছিল। আর সবাই উল্লসিতভাবে বলিয়া উঠিল, গ্র্যাণ্ড হয়, উঃ!

ঘোৎনা বলিল, যাবি যে, গোরার বাড়িতে কি বলবে? দুদিন থাকবে তো? তুই বা কি বলবি?

রাজেন বলিল, গোরা বলবে, আমাদের কারুর জন্যে মেয়ে দেখতে গেছল কোথাও। তোর শালীর বয়েস কত র্যা গোরা?

কে. গুপ্ত বলিল, আর গণেশবাবুর বললেই হবে, চাকরি খুঁজছিলেন।

গণশা বিরক্ত হইয়া বলিল, চা-চ্চাকরি কি হারানো গাই-গরু মশাই

যে, তিন দিন ধ'রে দিন নেই রাত নেই খুঁজতে থাকব? ব'লে দিলেই হবে একটা কিছু; মা-আমাদের তো ঘুম হচ্ছে না গণশার ভাবনায়!

২

সঙ্গে চাকর যাইতেছে, গৌরাচাঁদের মনে একটা মস্ত লোভের উদ্রেক হইয়াছিল, সন্ধ্যা-বাজারের নিকট পৌঁছিয়া সেটাকে আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না; বলিল, যখন দুজনেই যাচ্ছি গণশা, কিছু গলদাচিংড়ি, দার্জ্জিলিঙের কপি, কড়াইশুঁটি আর নৈনিতাল আলু নিয়ে গেলে হ'ত না? আর কিছু মিষ্টি? মানে, তোর খাবার না কষ্ট হয়, একটু পাড়াগাঁ-গোছের জায়গা কিনা। আমরা পৌঁছবও সেই যার নাম আটটা, রাত হয়ে যাবে।

গণশা বলিল, কিন্তু গাড়ির আর মোটে আধ ঘণ্টাটাক দেরি।

যাহা হউক, বাজারটা একেবারে হাতের কাছে, কেনাই ঠিক হইল। আন্দাজের একটু বেশি সময়ই লাগিল। গৌরাচাঁদ তরকারির ঝুড়িটা লইল, গণশা খাবারের হাঁড়িটা। তারপর ক্ষিপ্রতার জন্য গণশা যে বাসটায় উঠিয়া বসিল, কতকটা ক্ষিপ্রতার অভাবে ও কতকটা ঝুড়িটার জন্যও গৌরাচাঁদ সেটা ধরিতে পারিল না। দুইটি স্টপ পার হইয়া যাওয়ার পর গণশা সেটা টের পাইল। ফিরিয়া আসিতে, গৌরাচাঁদকে খুঁজিয়া বাহির করিতে এবং গায়ের ঝাল মিটাইতে আরও খানিকটা সময় গেল। স্টেশনে আসিয়া প্রায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়া গণশা জিজ্ঞাসা করিল, ডা-ড্ডানদিগেরটা, না বাঁদিগেরটা র‍্যা গোরে?

পাশাপাশি দুইটা গাড়ি দাঁড়াইয়া। ঢুকিবার সময় প্ল্যাটফর্মের নম্বর দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছে; সন্দেহ আছে বুঝিলে গণশা আবার পাছে

ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, সেই ভয়ে গৌরাচাঁদ পরিণাম চিন্তা না করিয়াই বলিল, না, বাঁদিগেরটা।

গাড়িতে ভিড় ছিল একটু। একেবারে ভিতরের দিকে এক কোণে গিয়া দুইজনে একটু জায়গা পাইল। গোরাচাঁদ চুপড়িটা উঠাইয়া বাঙ্কের এক কোণে রাখিল; গণশার হাত হইতে হাঁড়িটা লইয়া চুপড়ির মধ্যে বসাইয়া দিল।

কয়দিন বৃষ্টি হয় নাই, বেশ গরম পড়িয়াছে; তায় দৌড়াদৌড়ি, তাহার উপর ভিড়। গণশা ঠেলিয়া ঠুলিয়া আসিয়া প্ল্যাটফর্মের উপর পায়চারি করিতে লাগিল। একটি বৃদ্ধ যাত্রী বলিল, ফাষ্টো বেল হয়ে গিয়েছে হে বাপু।

গণেশ দোরটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ প্রশ্ন করিল, যাওয়া হবে কনে?

সিঙ্গুর।

সিঙ্গুর! সে তো বাবা তারকেশ্বরের লাইন। এ গাড়ি তো নয়, ওই সামনেরটা। এ গাড়ি তো পশ্চিম যাবে।

গণশা কতকটা অবিশ্বাসে, কতকটা উদ্বেগে বলিল, কে বললে?

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল।

বৃদ্ধ বোধ হয় একটু রগচটা; বলিল, কেউ বলে নি; তুমি উঠে এস। ওতে যাবে না, শেষে এটাও হাতছাড়া করবে! গাঁটের পয়সা দিয়ে যখন টিকিট কিনেছ, উঠে পড়।

হুইস্‌ল দিয়া গাড়ি স্টার্ট দিল। গণশা চীৎকার করিয়া বলিল, গোরা, শি-শি-শিগগির নেম পড়্, বলছে—

গোরাচাঁদের খটকা লাগিয়াছিল একটু। কে বলছে? কে বলছে র‍্যা?—বলিতে বলিতে হন্তদন্ত হইয়া লোকদের পা মাড়াইয়া মোট

ডিঙাইয়া আসিয়া কোনমতে নামিয়া পড়িল। গণশা চোখ রাঙাইয়া বলিল, ত-ত্তবে যে তুই বললি বাঁদিগেরটা?

গোরাচাঁদ চলন্ত গাড়িটার দিকে চাহিয়া বলিল, যাঃ, চুপড়িটা গেল ছেড়ে—হাঁড়িসুদ্ধ্! হায় হায়!

একটু অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, মশাই, চুপড়িটা ফেলে দিন না এদিকে, ওই বাঙ্কে রয়েছে—উত্ত্র দিকে, মানে পূর্ব্ব দিকের উত্ত্র, মানে উত্ত্র কোণটায় আর কি—

গণশা দাঁতমুখ খিঁচাইয়া বলিল, ছো-চ্ছোট্, দৌড়ো দিল্লী পর্য্যন্ত ওই বলতে বলতে।

পাশের গাড়ির প্রথম বেলটা পড়িল। একজন রেল-কর্ম্মচারী একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল; গণশা জিজ্ঞাসা করিল, এটা তারকেশ্বরের লাইনের গাড়ি তো সার্?

হ্যাঁ, শিগগির উঠে পড় গিয়ে।

ভুলের সমস্ত সম্ভাবনা এড়াইবার জন্য গোরাচাঁদ প্রশ্ন করিল, যে তারকেশ্বরের লাইনে সিঙ্গুর আছে?

গণশাও উত্তরটা শুনিবার জন্য ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, একটা ধমক খাইয়া দুইজনে তাড়াতাড়ি গিয়া গাড়িতে উঠিল। গণশা প্ল্যাটফর্ম্মের দিকের বেঞ্চটায় বসিয়া ছিল; গোরাচাঁদ পকেট হইতে মানিব্যাগ বাহির করিতে করিতে বলিল, গলা বাড়িয়ে দেখ্ তো গণশা, খাবারের ভেণ্ডারটা আছে কাছেপিঠে? বেশ খানিকটা ছুটোছুটি হয়রানি হ'ল কিনা!

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল, হুইস্ল দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

গোরাচাঁদ ব্যাগটা যথাস্থানে রাখিয়া দিল। একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, সে চুপড়িটা এতক্ষণ বোধ হয় লিলুয়া পেরিয়ে গেল

হাঁড়িসুদ্ধু! কেনা পর্য্যন্ত খালি দৌড়োদৌড়ি, একটাও যে মুখে ফেলে দোব, এমন ফুরসৎ হ'ল না।

যাহা হউক, গাড়িটার গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুইজনেরই মনমরা ভাবটা কাটিয়া গেল। গণশা, চাকরের মুখে মানায়, এই রকম ভাব ও ভাষার একটা গান ধরিল, পরাণ যদি লিলেই রে প্রাণ—। সেটা জমিয়া উঠিতে দুই-একজন উঠিয়া যাওয়ায় কোণের কাছে যখন একটু জায়গা খালি হইল, গোরাচাঁদ গিয়া সেইখানটিতে বসিল। প্রথম গুনগুন করিয়া গানে একটু যোগ দিল, কিন্তু গণশার তোৎলামির জন্য কোরাসে অসুবিধা হওয়ায় গাড়ির বাহিরে হাত বাড়াইয়া শুধু তবলা বাজাইতে লাগিল।

গাড়ি রিষড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলে এক দল বরযাত্রী নামিল। খানিকটা উল্লসিত চেঁচামেচি; এসেন্সের জুঁইয়ের গোড়ের গন্ধ; চেলি-পরা, কপালে চন্দনের ফুটকি দেওয়া বর। গণশার গানটা মৃদু হইতে হইতে থামিয়া গেল। গাড়ি ছাড়িয়া খানিকটা গেলে বলিল, হ্যাঁ, হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল, তোর শা-শা-শালীর বয়েস কত র‍্যা গোরা? মানে, যদি বিয়ের যুগ্যি হয় তো শিবপুরে পাত্তোর-টাত্তোর দেখি; একটা ভদ্দলোকের উপগার করতে পারা মস্ত একটা ভাগ্যি কিনা!

গোরাচাঁদ বলিল, বউয়ের ষোল যাচ্ছে, এ কার্ত্তিকে সতরোতে পড়বে; শালী হ'ল দু বছর তিন মাসের ছোট, তা হ'লে—

গণশা হিসাবের গোলমালের দিকে না গিয়া বলিল, বিটুইন তেরো অ্যাণ্ড চোদ্দো। হেল্‌থ কেমন?

বউয়ের চেয়ে ভালই বলতে হবে। বউটা ম্যালেরিয়ায় বড্ড ভুগল কিনা, একেবারেই হাড্ডিসার হয়ে গিয়েছিল; ধন্যি বলতে হবে পান্নালাল ডাক্তারকে, যাকে বলে মরা মানুষ চাঙ্গা ক'রে—

গণশা প্রশ্ন করিল, দে-দ্দেখতে কেমন ?

গোরাচাঁদ একটু লজ্জিতভাবে ধমক দিয়া বলিল, যাঃ! আহা, উনি যেন দেখেন নি! তবে যে বললি সেদিন, গোরা, তিলুর বউয়ের চেয়ে তোর বউয়ের রঙটা—

গণশা আর বিরক্তি চাপিতে পারিল না, তোর শালীর কথা জিজ্ঞেস করছি, না, স্রেফ বউ বউ ক'রে সেই থেকে—

গোরাচাঁদ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, তাই বল্। আমি এদিকে ভেবে সারা হচ্ছি, গণেশ জেনে-শুনেও ও কথা জিজ্ঞেস করছে কেন! শালী হচ্ছে যাকে বলে—হ্যাঁ, সুন্দরী!

লেখাপড়া কেমন? ক-কথা হচ্ছে, কেউ জিজ্ঞেস করলে আবার খুঁটিয়ে বলতে হবে কিনা! নইলে বলবে, খুব খোঁজ রাখেন তো মশাই! আবার সম্বন্ধ করতে এসেছেন!

ছাই লেখাপড়া, ওর চেয়ে বউ অনেক পড়েছে; কিন্তু মুখের কাছে দাঁড়াও দিকিন শালীর!

গণশা হাসিয়া বলিল, সত্যি নাকি? মৃদু হাস্যের সঙ্গে মাথা দুলাইয়া কি চিন্তা করিল খানিকটা, তাহার পরে ধীরে ধীরে ত্রিলোচনের বিয়ের সেই হিন্দী গানটা ধরিল, মুহা পঙ্কজ সোঙরি সোঙরি—

শেওড়াফুলিতে পৌঁছিতে গোরাচাঁদ বলিল, তোর খিদে পায় নি গণশা? সে চুপড়িটা বোধ হয় এতক্ষণ চন্দনগরে—তোর কি আন্দাজ হয়?

গণশা বলিল, খিদের চেয়ে তেষ্টা পেয়েছে বেশি; একটা লেমনেড হ'লে হ'ত।

গোরাচাঁদ বলিল, তুই তবে তাই খা, ওই ভেণ্ডারটা আসছে; আমি দেখি নেমে, যদি খাবার-টাবার পাওয়া যায় কিছু।

গণশা ধমক দিয়া উঠিল, গ-গ-গর্দ্দভ কোথাকার! আর একটুখানি সহি ক'রে থাকবে, তা নয়, পথে যা-তা খেয়ে পেট ভরাচ্ছে!

কথাটা গোরাচাঁদের খুব সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। প্রকাশ করিয়া বলিলও, ঠিক বলেছিস গণশা, পাড়াগাঁয়ের রাত হ'লেও জামাই মানুষ পৌঁছেছে, যতদূর সাধ্য করবেই তারা, একটা মস্ত আহ্লাদের কথা তো! কিছু না হ'লেও পুকুরের মাছ আর গরুর দুধটা তো আছেই। আমিও তা হ'লে একটা লেমনেড খাই এখন; খিদেটা জলে চাপা রইল। তাতে কোন ক্ষতি হবে না, কি বলিস?

লেমনেড ছিল না, দুইজনে দুইটা সোডাই পান করিল। গণশা একটা ঢেকুর তুলিয়া বলিল, চা-চ্চাপা কি? খিদেয় একেবারে শান দেওয়া রইল। মাছ যদি তেমন ওঠে তো একবার কালিয়া রেঁধে দেখাই গোরে। পাড়াগাঁয়ে কিন্তু আবার চাকরের রান্না খাবে না যে!

গোরাচাঁদ উল্লসিত হইয়া বলিল, রান্নাঘরের দোরগোড়ায় ব'সে তুই বাতলে দে না কেন শালাজকে, সেই রাঁধে কিনা! এক ঢিলে দু পাখি মারা হবে, গল্পও করতে থাকবি, আবার—শালী, বউ সবাই থাকবে। তারা ভাববে, জামাইবাবুর চাকর, ওটার কাছে আবার লজ্জা! চাকর-বাবু যে এদিকে শিবপুরের ডাকসাইটে গণেশরাম—

দুইজনেই সজোরে হাসিয়া উঠিল।

সিঙ্গুরের আর দেরি নাই। গাড়ির এদিকটায় তাহারা মাত্র দুইজনে বসিয়া। গণশা উঠিয়া জামাকাপড় ছাড়িয়া একটা ময়লা ধুতি ও একটা ঘুণ্টি-দেওয়া ফরসা পিরান পরিল, মাথার টেরিটা মুছিয়া ফেলিয়া কানে একটা বিড়ি গুঁজিয়া দিল। জামাকাপড় এবং ক্যাম্বিসের জুতা-জোড়াটা গোরাচাঁদের ছোট স্যুটকেসটায় গুছাইয়া ফেলিল; তাহার পর হঠাৎ

চোখ দুইটা ট্যারা করিয়া লইয়া গোরাচাঁদের দিকে চাহিয়া ডাকিয়া উঠিল, দাঠাউর!

দুইজনে আবার একচোট হাসিয়া উঠিল।

৩

রাত প্রায় সাড়ে আটটার সময় গাড়ি সিঙ্গুরে পৌঁছিল।

গল্প করিতে করিতে স্টেশনের বাহির হইয়া দুইজনে চলিতে আরম্ভ করিল। বউয়ের কথা, শালী-শালাজের কথা, খাওয়ার কথা যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, গোরাচাঁদ বলিল, হ্যাঁ, আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছি যে! এদিকে এসেও পড়েছি অনেকটা; তোকে কি ব'লে ডাকব র্যা শ্বশুরবাড়িতে? মানে, বউটা আবার তোর নাম জানে কিনা!

হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, এ কোথায় এলাম র্যা গণশা, এ যে অনেক ভদ্দলোকের বাড়ি!

গণশা বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ব্যঙ্গের স্বরে প্রশ্ন করিল, তুই কি বা-ব্বাগদীপাড়া কেওড়াপাড়ায় শ্বশুর-বাড়ি খুঁজছিলি?

বেশ অন্ধকার। গোরাচাঁদ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া চারিদিকে দেখিতে দেখিতে বলিল, সে কথা নয়, মানে শ্বশুর-বাড়িটা এক টেরেয় কিনা, নিজ সিঙ্গুর ছাড়িয়ে খানিকটা ভেতরের দিকে। বাড়িঘর, কি দোকানপাট তো নেই সেদিকে, চল্ আবার ইষ্টিশানে, গপ্প করতে করতে একেবারে উল্টো রাস্তায় এসে পড়েছি; এদিকটা তো আমার জ্ঞাতি পিসশ্বশুরের বাড়ি।

না হয় পিসশ্বশুরের বাড়িই রাতটা কাটাবি চল্ না, সকালে তখন—

গোরাচাঁদ শিহরিয়া উঠিল; বলিল, ওরে বাব্বা! তারা তো চায়ই তাই। টের পেলে রাস্তা থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে রাতারাতি কাজ সাফাই ক'রে লাস গুম ক'রে ফেলবে। জমি নিয়ে শ্বশুরের সঙ্গে ভয়ঙ্কর

খুনে মকদ্দমা চলছে কিনা! ওরা তো চায়ই, কেউ একবার আসুক এদিক বাগে; জামাই পেলে তো লুফে নেবে।

গণশা তাড়াতাড়ি তাহাকে টানিয়া লইয়া ফিরিল। খুবই চটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু স্টেশনে না পৌঁছানো পর্য্যন্ত কিছু বলিল না। স্টেশনের কাছে আসিয়া খুব একচোট গালিগালাজ করিল গোরাচাঁদকে। আবার ঠিক রাস্তা ধরিয়া দুইজনে যাইতে আরম্ভ করিল। চলিতে চলিতে দুই তিন জায়গায় খবর লইয়া যখন বুঝিল যে, ঠিক রাস্তাতেই যাইতেছে, তখন মনের রাগটা এবং পিসশ্বশুরের আতঙ্কটা অল্পে অল্পে কাটিয়া গেল। যখন বুঝিল, কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, গণশার মনটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কথাবার্ত্তাও সরস হইয়া আসিল। সাহস পাইয়া গোরাচাঁদ বলিল, তুই তো ওই সব ব'লে ঠাট্টা করছিস শুধু, আমার এদিকে নাড়ী জ্ব'লে গেল খিদেয়, ভুল রাস্তাব পাল্লায় প'ড়ে রাতও হয়ে গেল বড্ড।

না-ন্নাড়ী কি আমারই জলছে না? দেখছি, কালিয়াটা আর হবে না রাত্তিরে। যদি বড মিরগেল ওঠে তো ভেজেই দিক আপাতত; লুচি তো করবেই—স্রেফ মিরগেলমাছের পেটি ভাজা আর লুচি।

গোরাচাঁদ মুখে রস জমিয়া উঠায় একটা ঝোলটানা-গোছের শব্দ করিয়া বলিল, দুটোই বড শুকনো হয়ে গেল; তা রাতটা কাটুক ওই ভাবেই, সকালে তখন দেখা যাবে। বউকে বরং বলব, দুধটাকে নটক্ষিরে ক'রে—; হাতে একটা আদ্ধা ইট তুলে নে তো গণশা, এসে গেছি, আমি এই বাঁশের আগালেটা বাগিয়ে ধরছি।

গণশা দাঁডাইয়া পড়িয়া বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল, কেন র‍্যা, আবার কি?

কুকুরটা বড় রোখা। রাত্তিরে কেউ এলে ধ'রে নেয়, চোর কিংবা পিসশ্বশুরের বাড়ির কেউ; দাঙ্গার পর থেকে ওদের ওপর বড় চটা কিনা!

ওই, ডাকতে আরম্ভ করেছে! তুই যে থান-ইট তুলে নিয়েছিস, একেবারে থেঁতো হয়ে যাবে যে! আয়, বাঘা, বাঘা, চ্যু চ্যু—আমি রে, তোদের জামাইবাবু্। আচ্ছা, বাড়ি একেবারে নিষুতি কেন বল্ তো গণশা?

ঘুমিয়েছে নিশ্চয়, রাত দশটা হয়ে গেল।

গোরাচাঁদ বলিল, ঘুমুলে কুকুরটার এ রকম ডাকেও ঘুম ভাঙবে না?

দুইজনে কুকুরটাকে আটকাইতে আটকাইতে বাহিরের উঠানে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন একজন ভিতর-বারান্দা হইতে জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কে? কে র‍্যা বাঘা?

গোরাচাঁদ বলিল, আমি, শিবপুর থেকে আসছি।

সেই রকম নিদ্রালু্ স্বরে প্রশ্ন হইল, কি দরকার রাত দুপুরে?

এরূপ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের উত্তর গোরাচাঁদের মুখে টপ করিয়া যোগাইল না। গণশা বলিল, না, দ-দরকার তেমন কিছু নেই, তবে ইনি—তোমার গিয়ে দা-দ্দাদাঠাউর এ বাড়ির জামাই।

গোরাচাঁদ ফিসফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাড়িটা ঠিক তো? 'জামাই' আবার একটা গালাগাল কিনা!

ওদিকে আর কোন সাড়া নাই। লোকটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে নিশ্চয়, ঘুমের মধ্য হইতেই প্রশ্ন করিয়াছিল। দুইজনে কুকুরটাকে কখনও তাড়না, কখনও খোশামোদ করিতে করিতে বারান্দার খোলা রকে উঠিয়া গেল। গোরাচাঁদ লোকটাকে লক্ষ্য করিয়া একটু চড়া গলায় বলিল, জামাই মানে শিবপুরের জামাই গোরাচাঁদ আমি; সঙ্গে এ গণ—, আমার চাকর।

গণশা কানের কাছে মুখ লইয়া বলিল, দু-দুখীরাম।

আমার চাকর দুখীরাম। তুমি কে কথা কইলে?

সেই নিদ্রালু্ স্বর একটু ধমকের সুরে প্রশ্ন করিল, বলি, তুমি কে?

গোরাচাঁদ হতাশ হইয়া গণশার দিকে চাহিয়া বলিল, বললাম তো একচোট সব খুলে! কি গেরো বল তো!

একটু থামিয়া গলা আর একটু চড়াইয়া বলিল, বাঘা, এখনও চিনতে পারছিস না জামাইবাবুকে—সেই লুচি খেতিস হাত থেকে?

গণশা বলিল, পিসশ্বশুরের বাড়ির লোক নয় রে বাঘু।

এবার ঘরের ভিতর হইতে ভারী গলায় প্রশ্ন হইল, বাইরে কে ব্যাডর ব্যাড়র করছে? কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে!

গোরাচাঁদ গণশাকে বলিল, শ্বশুরের আওয়াজ। আফিমের ঘুম কিনা, ঠিক ধরতে পারছে না।

চেঁচাইয়া বলিল, বাবা, আমি আপনাদের গোরাচাঁদ, শিবপুর থেকে আসছি।

কে, বাবাজী? এস বাবা, এস এস। নিধে! এই ব্যাটা হারামজাদা, পড়লে আর হুঁশ থাকে না! রকে জামাই দাঁড়িয়ে যে!

তাড়া খাইয়া নিধিরাম ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িল। বাঁ হাতে কালি-পড়া লণ্ঠনটা লইয়া দুয়ার খুলিল, তাহার পর আলোটা তুলিয়া ধরিয়া চোখ-পিটপিট করিতে করিতে টানা জড়িত স্বরে কহিল, তাই তো, জামাইবাবু যে! এস এস, আস্তেজ্ঞে হোক, পেন্নাম হই। তা, বলা নেই, কওয়া নেই—যেন গিয়ে বিনি মেঘে বজ্রাঘাত, বাঃ, কি সৌভাগ্য! ওটি কে?

গণশা বলিল, আমি দাঠউরের নফর নিধুদা; গড় করি।

তিনজনে ঘরে আসিল। গোরাচাঁদ শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া সামনের একটা পায়া-মচকানো চেয়ারে, প্রতি মুহূর্ত্তেই পড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় সতর্ক হইয়া বসিয়া রহিল। গণশাও খুব ভক্তিভরে পায়ের ধূলা লইয়া

নীচে উবু হইয়া বসিল। নিধু ঘরের এক কোণে গিয়া তামাক সাজিতে লাগিল।

শ্বশুর খানিকটা নিঝুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। অস্বস্তি বোধ হওয়ায় গোরাচাঁদ প্রশ্ন করিল, আপনি—আপনারা কেমন আছেন?

কোন উত্তর হইল না।

গণশা ইশারায় তাগাদা করিল, হাতের কাছে অন্য কোন প্রশ্ন না পাওয়ায় গোরাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, এবার এদিকে—এবারে এদিকে বৃষ্টি কেমন হ'ল?

নড়নচড়ন পর্য্যন্ত নাই। গণশা আবার প্রশ্ন করিতে তাগাদা করিল, গোরাচাঁদ ভীতভাবে হাত নাড়িয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, চ'টে যায়।

আবার খানিকক্ষণ নিঝুম। একটা ঝোঁক কাটিয়া গেলে শ্বশুর হঠাৎ মাথা তুলিয়া বলিলেন, হুঁ, গোরাচাঁদ এসেছ, না?

গোরাচাঁদ ব্যাকুলভাবে একবার গণশার দিকে চাহিয়া উত্তর করিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

তাই তো!—আবার খানিকটা চুপচাপ, শুধু গোরাচাঁদের চেয়ার সামলানোর ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ হইল দুই-তিন বার।

নিধিরাম তামাক সাজিয়া দিয়া এক পাশে বসিল।

হুঁকায় কয়েকটা টান দিয়া গোরাচাঁদের শ্বশুর একটু চাঙ্গা হইলেন। বলিলেন, তখন থেকে চুপ ক'রে তাই ভাবছি। হ্যাঁরে নিধে, বাড়ির সবাই বিয়ে-বাড়ি নেমন্তন্ন গিয়ে ব'সে রইল, জামাই খাবেন কি?

নিধিরাম কলিকাটির দিকে অর্দ্ধমুদ্রিত সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া ছিল, নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলিল, সেই কথাই তো ভাবছি।

গোরাচাঁদের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। গণশা একটু চাপা, তবু তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, সেও হতভম্ব হইয়া গিয়াছে। দুইজনে

পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া শ্বশুর কি স্থির করেন, সেই প্রত্যাশায় একটু চুপ করিয়া রহিল। আরও খানিকক্ষণ তামাক টানিয়া নিধিরামের দিকে হুঁকাটা বাড়াইয়া শ্বশুর বলিলেন, ভাবিয়ে তুললে যে! উপোস ক'রে থাকবেন?

নিধিরাম কলিকাটা পাক দিয়া হুঁকা হইতে খুলিতে খুলিতে বলিল, রামঃ, সে কি হয়?

উপায়?

নিধিরাম পরম ভক্তিভরে কলিকাটা মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, বাবা আছেন।

বাবা—এ প্রান্তে তারকেশ্বরের সাধারণ নাম।

গণশা গোরাচাঁদের পানে ঠোঁটটা কুঞ্চিত করিয়া মাথা নাড়িল, অর্থাৎ আর কোন আশা নাই।

আমি বলি—। বলিয়া গোরাচাঁদ কি বলিতে যাইতেছিল, নিধিরাম হাসিয়া বলিল, তুমি যা বলবে বুঝতেই পারছি দাদাঠাকুর, খবর দিয়ে আসতে পার নি ব'লে আর খুব রাত হয়ে গেছে ব'লে পথে শেওড়া-ফুলিতে খেয়ে এসেছ, এই তো? শুনছেন জামাইবাবুর কথা কর্ত্তা?

নেশাটা চটিয়া যাইতেছে, জামাইয়ের হাঙ্গামা না মিটাইলে অব্যাহতি নাই; বৃদ্ধ মিটিমিটি করিয়া হাসিয়া বলিলেন, দ্যুৎ! সে তুই আমি করতাম ব'লে কি ও ছেলেমানুষরাও করবে? না, সেটা উচিত হ'ত?

অর্থাৎ সেইটাই উচিত হইত, এবং যদি না হইয়া থাকে তো কাণ্ডজ্ঞানহীন ছেলেমানুষ বলিয়াই হয় নাই।

গণশা গোরাচাঁদ বিমূঢ়ভাবে পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিল। গোরাচাঁদ কি উত্তর দিতে যাইতেছিল; পেটুক মানুষ, পাছে বেমানান

কিছু বলিয়া বসে—সেই ভয়ে গণশা তাড়াতাড়ি বলিয়া দিল, আজ্ঞে, বললে বিশ্বাস যাবেন না, দাঠাউর সত্যিই খেয়ে এসেছেন।

গোরাচাঁদ গণশার দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া মরিয়া হইয়া আবার কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কপালদোষে হঠাৎ একটা ঢেকুর ঠেলিয়া বাহির হইল। তবু যথাসম্ভব সামলাইয়া লইয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা সোডা—

গণশা তাহার দিকে একটা ভ্রূকুটি করিয়া মুখ ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, খাবেন না সোডা? তি-তিন গণ্ডা রসগোল্লা, পোয়াটাক কচুরি সিঙাড়া মিলিয়ে, পো-খানেক মিহিদানা খেলেন, শেষে আমি বললাম—

গোরাচাঁদ হতাশভাবে চাহিয়া ছিল, তাহার মুখের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া গণশা বলিল, শেষে আমি বললাম, দাঠাউর, একটা সোডা খেয়ে নাও; তাঁরা তো সেখানে খাবার জন্যে জেদাজেদি করবেনই—

নিধিরাম বলিল, করব না জেদাজেদি? ঘরের জামাই এলেন, বাঃ!

গণশা ক্রমাগত চোখ-টেপানি দিতেছে। আর কোনও আশা নাই দেখিয়া গোরাচাঁদ নিরুৎসাহ কণ্ঠে যতটা সম্ভব জোর দিয়া বলিল, দুখীরামের কথা শুনে আমি বললাম, হাজার জিদ করলেও আমি আর খেতে পারব না। শেষকালে কি মারা যাব?—বলিয়া চেষ্টা করিয়া আর একটা ঢেকুর তুলিল।

শ্বশুর নিধিরামের নিকট হইতে কলিকাটা লইয়া বলিলেন, আমার কিন্তু বাপু বিশ্বাস হচ্ছে না যে, জামাই পথেই খেয়ে এসেছেন। নিধে কি বলিস?

হাঙ্গাম-পোহানোর ভয়ে নিধিরাম অনেকটা সামলাইয়া আনিয়াছে, আবার কাঁচিয়া যায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, অবিশ্বাসের তো হেতু

দেখছি না, কর্ত্তামশাই ; লোতুন জামাই মিছে কথা বলবেন কি ? তায় আপনার মত দেবতুলি্য শ্বশুর।

তাই তো !—বলিয়া বৃদ্ধ আরও খানিকটা চিন্তা করিলেন, তাহার পর উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন, আমি বলি কি নিধে, জামাইকে না হয় নেমন্তন্ন-বাড়ি নিয়ে যা না কেন, ততক্ষণ আমাতে আর—এটির নাম কি ?

গোরাচাঁদ উৎসাহভরে বলিল, ক্ষুদিরাম।

আমাতে আর ক্ষুদিরামে ব'সে ব'সে গল্প করি না হয়। বেহাই বেহান-ঠাকরুণ আছেন কেমন ক্ষুদিরাম ?

বেশ আছেন।—বলিয়া গণশা তাড়াতাড়ি বলিল, আজ্ঞে, আমি তো জা-জ্ঞান থাকতে দাঠাউরকে একলা ছেড়ে দিতে পারব না। এই সাপখোপের দেশ ! কর্ত্তাবাবু বললেন, দুখীরাম, ম-ম্মলমাস, ছেলেটা একলা যাচ্ছে, সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকবি, খ-খ-খবরদার !

গোরাচাঁদ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, নিধু খুব বিচক্ষণ লোক গণ—দুখীরাম, ও আবার ঝাড়ফুঁকও জানে। তোর কোন ভাবনা নেই ; নিশ্চিন্দি হয়ে বাবার সঙ্গে গল্প কর্, আমি একটু হয়ে আসি। কথা হচ্ছে, খিদে তো এক্কেবারেই নেই, কিন্তু শাশুড়ী-ঠাকরুণকে দেখবার জন্যে প্রাণটা কেমন আইঢাই করছে ; অনেকদিন পায়ের ধূলো নিই নি কিনা !

গণশা ভিতরে জ্বলিয়া খাক হইতেছিল, গোরাচাঁদের দিকে একটা উগ্র কটাক্ষ হানিয়া সংযতভাবে কহিল, বি-ব্বিনি পায়ের ধূলোয় যখন চারটে মাস কাটালে চোখ কান বুজে, ত্যাখন আর একটা কি দুটো ঘণ্টা কোন রকমে কাটাও না দাঠাউর, মা-ঠাকরুণও এক্ষুনি নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরবেন ছিচরণ সঙ্গে নিয়ে।

শ্বশুর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, সে আজ সমস্ত রাত আসবে না,

তারা কেউ না ; সম্পর্কে আমার নাতনীর বিয়ে কিনা, গিন্নী বাসর জাগবে—ও কি ! ধর ধর।

শেষ আশা একটু ছিল, শাশুড়ীর ; সেটুকুও যাওয়ায়, গভীর নিরাশায় শরীরটা হঠাৎ শিথিল হইয়া পড়ায় গোরাচাঁদের ভাঙা চেয়ার হইতে আছাড় খাওয়ার দাখিল হইয়াছিল ; গণশা নিধিরাম ধরিয়া ফেলিল।

শ্বশুর বলিলেন, আহা, ঘুম ধরেছে।

নিধিরাম বলিল, চাপ খাওয়া হযেছে কিনা।

শ্বশুর উঠিয়া বলিলেন, তবে বাবাজী, চল, দুর্গা শ্রীহরি ব'লে শুয়েই পড়বে চল। খিদে যখন নেই-ই বলছ, শুধু প্রণাম করবার জন্যে কোশটাক পথ ভাঙার মাঝরাত্রে কি দরকার? ওঠ তা হ'লে। দুখীরামকে না হয় গোটাকয়েক খইচুর এনে দোব?

গণশা উত্তর দেওয়ার আগে গোরাচাঁদ প্রতিহিংসাবশে বলিল, না না, খাওয়ার ওপর খেয়ে একটা কাণ্ড ক'রে বসবে শেষে, ওর ভবসায়ই বাবা আমায় এখানে পাঠিয়েছেন মলমাস অগ্রাহ্যি ক'রে।

গণশার পানে না চাহিয়া শ্বশুরের পিছনে পিছনে ভিতরে চলিয়া গেল।

৫

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক আরও কাটিল। গোরাচাঁদ ভিতর-বাড়িতে ক্ষুধার জ্বালায় এবং খাদ্য সম্বন্ধে হতাশায় বিছানাতে পড়িয়া এপাশ-ওপাশ করিতেছিল, এমন সময় ঘরের দুয়ারের কাছে গণশা ডাকিল, দাঠাউর !

গোরাচাঁদ উত্তর দিতে যাইতেছিল, নিধিরামের গলার আওয়াজ শুনিল, ঘুমে এলিয়ে পড়েছেন, আর তুলে কাজ নেই। তুমি তা হ'লে

এই দোর-গোড়াটায় শুয়ে থাক দুখীরাম ভাই, আমি যাই কর্ত্তার কাছে ; এই শতরঞ্জি রইল।

নিধিরাম চলিয়া গেলে গণশা ভিতর-বাড়ির কপাট বন্ধ করিয়া যখন ফিরিয়া আসিল, গোরাচাঁদ ধীরে ধীরে ডাকিল, গণশা !

জেগে আছিস ?—বলিয়া গণশা দুয়ার ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল।

গোরাচাঁদ চিঁচিঁ করিয়া বলিল, ঘুমুতে পারছি না ভাই, আর সাহসও হচ্ছে না। এস্‌সা খিদে গণশা ! মনে হচ্ছে, ঘুমুলে আর ওঠা হবে না, জামাইকে ওদের সকালে টেনে বের করতে হবে।

গণশা মশার কামড়ে চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, চাকর সেজে এলে আবার মশারি দেবে না মনে ছিল না রে—উঃ। তার ওপর দু ব্যাটা আফিমখোরের বক্তার ! নেশা চ'টে গেছে কিনা !

গোরাচাঁদ বলিল, তাও যেমন ভগবান দয়া ক'রে ভুল গাড়িতে চড়িয়ে দিয়েছিলেন, যদি রেখে দিতেন— ! পেটটা খালি থাকলে পুড়ে যাওয়ার মত জ্বালা করে রে ! জানতাম না। নিধেটা কি ধড়িবাজ দেখেছিস ?

গণশা বলিল, দুটোই। খিদেয় মরছি, অথচ কেমন বলিয়ে নিলে, খেয়ে এসেছি। এসা কোণঠাসা ক'রে এনেছিল যে, না-ন্না বললে আর মান থাকত না।

খানিকটা চুপচাপ গেল। তাহার পর গণশা মাথাটা মশারির মধ্যে গলাইয়া দিয়া পূর্ব্বের চেয়েও চাপা গলায় বলিল, গোরে, এক মতলব বের করেছি ; ভাবছি, রাজি হবি কি না, তোর আবার শ্বশুরবাড়ি কিনা !

গণশার মতলব বাহির করায় কত বড় বড় সমস্যার সমাধান হয়। গোরাচাঁদ পরম আগ্রহে বলিয়া উঠিল, কি মতলব রে গণশা ?

বুড়ো সেই খইচুরের কথা বলছিল— ?

দিয়েছে নাকি ?—বলিয়া গোরাচাঁদ মশারি জড়াইয়া এক রকম পড়-পড় হইয়া নামিয়া গণশার সামনে দাঁড়াইল।

গণশা বলিল, দেয় নি, ত-ত্তবে বাড়িতেই তো আছে।

গোরাচাঁদ গণশার দিকে একটু বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া থাকিয়া একেবারে গলা নামাইয়া বলিল, চুরি ?

গণশা উপরে নীচে মাথা নাড়িল।

গোরাচাঁদ ঝোল-টানার শব্দ করিয়া বলিল, জামাই হয়ে— তাই বলছিলাম; কিন্তু কেই বা দেখছে! আর এসা চমৎকার খইচুর এখানকার গণশা; সন্দেশ রসগোল্লা ফেলে—

ভাঁড়ার-ঘর কোন্‌টে জানিস ?

গোরাচাঁদ আবার ভাঁড়ার-ঘর চিনিবে না—তাও শ্বশুরবাড়ির! বলিল, উঠোনের ওদিকে রান্নাঘরের পাশে—হ্যাঁরে গণশা, আমার একটা-আধটায় হবে না; ক'মে গেলে ওরা সব টের পেযে যাবে না তো যে, জামাই রাত্তিরে উঠে এই কাণ্ডটি—

গা-গা-গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল! আগে চল্ নিয়ে, যদি তালা দেওয়া থাকে তো আবার—

গোরাচাঁদের বুকটা যেন ধসিয়া গেল; ভীত নিরাশ দৃষ্টিতে বলিল, তা হ'লে ?

চল্ না, ইডিয়ট!—বলিয়া গণশা তাহাকে একটা ঠেলা দিল। বালিশের তলা হইতে দেশলাইটা লইল।

প্রদীপ লইয়া সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে হইতে গোরাচাঁদ বলিয়া উঠিল, তোরই মতলবের ওপর আমার এক মতলব এসে গেল গণশা, রান্নাঘরটাও অমনই আগে একবার দেখে নিলে হয় না ? কপাল যেমন, তাতে যে কিছু পাব— তবু ধর্, যদি ওবেলার ভাজা মাছটা-আসটা—

গণশা বলিল, হ্যাঁ, চল্; কখনও কখনও জল দিয়ে পান্তা ক'রেও রাখে মেয়েরা, খুব তোয়াজ বোঝে কিনা, নেমন্তন্ন খেয়ে শরীরটা গরম হবে।

উঠান পার হইয়া রকে উঠিয়া গোরাচাঁদ উৎফুল্লভাবে বলিল, তালা দেওয়া নেই রে গণশা, ভগবান বোধ হয় এবার মুখ তুলে চাইলেন।

ভগবান সত্যই মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। রান্নাঘরে প্রবেশ করিতেই দুইজনে দেখিল, সামনে একটা শিকেয় টাঙানো একটা বেশ বড় সাইজের হাঁড়ি, তাহার উপর একটা জামবাটি, তাহার উপর একটা কড়া; পাশে আর একটা শিকেয় একটা পিতলের কড়া।

একটা বিড়াল উনানের পাশে বসিয়া ছিল, ইহাদের দেখিয়া লাফাইয়া জানালায় উঠিয়া বসিল।

গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি গিয়া পিতলের কড়াটায় আঙুল ডুবাইয়া বাহির করিয়া লইল, উল্লাসে চোখ দুইটা বড করিয়া বলিল, দুধ রে গণশা—মিল্ক!

গণশা বলিল, নামা।

চঞ্চল হাতে নামাইতে গিয়া একটু সরসুদ্ধ দুধ চলকাইয়া গোরাচাঁদের কপালের উপরটায় পড়িয়া গেল। বাঁ হাতে সরটি মুছিয়া মুখে দিয়া গোরাচাঁদ বলিল, বেশ মোটা সর রে! দুটো বাটি পাওয়া যেত!

গণশা বলিল, আগে হাঁড়ির শিকেটা দেখে নে। এই রে, তোর কপালে কড়ার কালি লেগে গেল যে!

সৌন্দর্য্যের দিকে গোরাচাঁদের খেয়াল ছিল না। ঠিক বলেছিস, দুধটা শেষ পাতের জিনিস কিনা!—বলিয়া কপালটা ডান হাতে মুছিয়া অন্য শিকাটার দিকে অগ্রসর হইল।

গণশা বলিল, আমি ধরছি শিকেটা; তুই একটা একটা ক'রে পাড়্। আবার জামায় হাতটা মুছলি বুঝি? এঃ, ভূত হয়ে গেলি যে!

গণশা শিকের একটা দড়ি ধরিল। গোরাচাঁদ উপরের কড়াটায় আঙুল ডুবাইয়া বলিল, ঝোল, গণশা! আঙুলগুলো চালাইয়া উত্তেজিতভাবে বলিল, মাছের ঝোল।

আর তর সহিতেছিল না, গোটাকতক মাছ বাহির করিয়া মুখে ফেলিয়া আনন্দের চোটে গণশার হাতটা ধরিয়া ফেলিল, বলিল, পুঁটি-মাছের টক মাইরি।

গণশার উঁচু-করা মুখে জল আসিয়াছিল, একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, তা হ'লে হাঁড়িতে নির্ঘাত পান্তা আছে; জামবাটিটা দেখ্ তো। আমার হাত ধরতে গেলি কেন? দেখ্ তো, আমায়ও বাঁদর বানিয়ে ছাড়লি!

জানালার উপর বিড়ালটা ডাকিল, মিউ।

গোরাচাঁদ বলিল, তাড়া তো বেটীকে। ভাগীদার জুটেছেন!

গণশা বলিল, না না, আমি এক মতলব ঠাউরেছি, যাবার সময় সব ফেলে-ছড়িয়ে বেড়ালটাকে ঘরে বন্ধ ক'রে যাব।

তোর এতও মাথায় খেলে মাইরি!—বলিয়া গোরাচাঁদ সপ্রশংস দৃষ্টিতে বন্ধুর পানে চাহিল, তাহার পর বলিল, ঠিক ক'রে ধরিস, আমার হাতটা কাঁপছে।

৬

কড়াটা বাঁ হাতে একটু তুলিয়া জামবাটির মধ্যে হাত দিতে যাইবে, এমন সময় বাহিরের রকের এ কোণটায় বাঘা উৎকট স্বরে ঝাঁউঝাঁউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। একে আচমকা, তায় চোরের মন, দুইজনেই একসঙ্গে চমকিয়া উঠিল এবং তাহাদের হস্তধৃত দড়ি ও কড়াটা কাঁপিয়া গিয়া কড়াটা বাঁকিয়া প্রায় অর্দ্ধেকটা অম্বলের মাছ আর ঝোল হড়হড় করিয়া গোরাচাঁদের মাথার উপর পড়িল। গণশা একটা লাফ দিয়া পিছনে সরিয়া গেল, কিন্তু তবু যে নিতান্ত বাদ গেল, এমন নয়।

সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের দরজার নিকট হইতে আওয়াজ আসিল, বাঘা, আমরা সব; থাম্।

ঝোলে-বোজা চোখে কোন রকমে পিটপিট করিয়া চাহিয়া গোরাচাঁদ দেখিল, গণশা চোখ দুইটা বড় করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে ; অতিমাত্র ভীত চাপা স্বরে বলিল, আমার সম্বন্ধী—শিবুদা।

গণশা জিজ্ঞাসা করিল, উপায় ?

আওয়াজ অগ্রসর হইতে লাগিল—বিয়েবাড়ির চর্চ্চা। সবাই রকে উঠিল। শিবু বাহিরের দুয়ারের কড়া নাড়িয়া ডাকিল, বাবা, ও বাবা! নিধে! দুজনেই নিঃসাড়! এই নিধে!

কর্ত্তার গলারই উত্তর হইল, এলি তোরা ? জামাই এসেছেন।

দুয়ার খোলার শব্দ হইল। প্রবেশ করিতে করিতে শিবু প্রশ্ন করিল, আমাদের গোরাচাঁদ! কখন এল ?

গণশা ফিসফিস করিয়া ডাকিল, গোরে!

গোরাচাঁদ কাঠ হইয়া গিয়াছে ; একবার নিজের অম্লসিক্ত শরীরটা দেখিয়া বিহ্বলভাবে গণশার পানে চাহিয়া রহিল।

ভিতর-বাড়ির দুয়ারে করাঘাত হইল। গোরাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, কি করবি বল্ তো গণশা ? কাপড়-জামাটা ছেড়ে—

গণশা বলিল, পাগল! সময়ই বা কোথায় ? আর স্যুট্‌কেসটাও বাইরে।

ঘন ঘন করাঘাতের সঙ্গে তাগাদা হইল, গোরাচাঁদ, দোর খোল হে! জামাইবাবু!

গণশা অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া বলিল, পালাতে হবে গোরে, খিড়কিটা কোন্ দিকে বল্ তো ?

এত বিপদেও গোরাচাঁদের এ সম্ভাবনাটা মনে হয় নাই ; চরম বিস্ময়ের সহিত বলিল, পা—লা—তে হবে ? শ্বশুর-বাড়ি যে! আর সত্যিই তো, তা না হ'লে—

বাইরে শোনা গেল, নিধে, তুই ওদিক থেকে একটু হাঁক দে তো। শালা যেন কুম্ভকর্ণ! আর চাকরটাই বা কি রকম! দোর খোল হে!

জোর কড়া-নাড়ার শব্দ হইল, কপাটে দুই-একটা লাথিরও ঘা পড়িল।

এমন সময় যেখানটা কুকুর ডাকিয়া উঠিয়াছিল, সেখানটায় নিধিরামের শঙ্কিত কণ্ঠ শোনা গেল, দাদাবাবু, রান্নাঘরে আলো দেখছি যে! মা-ঠাকরুণ জ্বেলে রেখে গিয়েছিলেন নাকি?

কই না! হে বাবা তারকেশ্বর!—মেয়ে-গলার কাঁপা আওয়াজ হইল।

খানিকক্ষণ একেবারে চুপচাপ। শিবু নিধিরামের কাছে আসিয়া বলিল, সত্যিই তো! আর দু—

গোরাচাঁদ এক ফুৎকারে আলোটা নিবাইয়া দিল। গণশা খুব চাপা গলায় বলিল, কি করলি গাধা?

নিবিয়ে দিলে! চোর! চোর! বাবা, জেনে শুনে চোর ঢোকালে বাড়িতে! নিধে!

দেখলাম জামাই, সেই রকম মুখ চোখ কথাবার্ত্তা; দিব্যি প্রণাম করলে।

তবে আর কি! প্রণাম করলে! শিগগির খিড়কি আগলাগে নিধে; নিশে বাগদীকে হাঁক দে। ও রতনের মা! ও সামন্ত, সামন্ত!

একটু দূরে বনের মধ্য হইতে আওয়াজ আসিল, এজ্ঞে!

শিগগির এস সড়কিটা হাতে ক'রে, দু শালা ঢুকেছে।

এলাম। সটকায় না যেন, একসঙ্গে গাঁথব। রতনের মা, তোর সেই কাটারিটা নিয়ে বেরো।

গণশা আর গোরাচাঁদ ঘর ছাড়িয়া উঠানের মাঝামাঝি জড়সড় হইয়া

দাঁড়াইয়া ছিল, গোরাচাঁদ একসঙ্গে গাঁথার কথায় একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

আওয়াজ হইল, নিধে!

আমি এই খিড়কিতে, বাঘাকে নিয়ে।

গণশা চারিদিকে চাহিয়া নিরাশভাবে বলিল, কি করা যায়?

তাহার পর হঠাৎ গোরাচাঁদের পায়ের নিকট হইতে একটা আদ্ধা ইট কুড়াইয়া লইয়া বলিল, হয়েছে, চল্ খিড়কির দিকে; তুইও পিঁড়েটা তুলে নে।

গোরাচাঁদ শঙ্কিতভাবে বলিল, খুন ক'রে পালাবি নাকি নিধেকে?

গণশা বলিল, আর বাঘাকে। নয়তো কি খু-খু-খুন হব সামন্তর সড়কিতে? কোন্টে খিড়কি? এগো।

কি হইত বলা যায় না, কিন্তু এই সময় কুকুরটা হঠাৎ নিধিরামের নিকট হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে কি একটা তাড়া করিয়া রান্নাঘরের পিছনে গেল এবং সেখানে থাবা গাড়িয়া বসিয়া উঁচু মুখে প্রবল সোরগোল লাগাইয়া দিল।

শিবু একটু লক্ষ্য করিয়া বলিল, আবার রান্নাঘরে ঢুকেছে; সবাই এই দিকটা চ'লে এস, এখনও আছে শালারা। নিধে, আয় দিকিন, সামন্ততে আর তোতে পাঁচিল ডিঙিয়ে ওদিকে পড়্। বাঘা, ঠিক চোখে চোখে রাখবি ওই ভাবে।

বাঘা রাখিতেও ছিল, কালো বিড়ালের মত শত্রু আর তাহার নাই। বাঘাহীন খিড়কিতে নিধিরামের পা থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিয়া সবিক্রমে বলিল, হ্যাঁ, ওঠ তো সামান্ত খুড়ো; দাও, সড়কিটা ধ'রে থাকি ততক্ষণ।

গণশা ও গোরাচাঁদ গিয়া খিড়কি ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। যেই

বুঝিল, নিধিরাম সরিয়া গিয়াছে, দোর খুলিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইল। গণশা খুব সন্তর্পণে শিকলটা তুলিয়া দিল। খুব অন্ধকার, ঝোপঝাপ। গোরাচাঁদ অগ্রসর হইল। হাতটা পিছনে করিয়া গণশার জামা ধরিয়া খুব চাপা গলায় বলিল, আয়, একটু ঘুরে গিয়ে সদর রাস্তা। বাঘা সরে নি, ওরা বাড়ি নিয়েই থাকবে একটু।

এত বিপদেও বাড়িটার দিকে চাহিয়া তাহার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। বলিল, একটা রাতও কাটল না; বউ ওদিকে নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছে—

গণশা কালসিটের ব্যাপারটা স্মরণ করিয়া শুধু একবার প্রশ্ন করিল, সামনে পানাপুকুর-টুকুর নেই তো?

* * *

শিবপুরে স্টীমার-জেটির রেলিঙে হেলান দিয়া মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইয়া রাজেন, ত্রিলোচন, কে. গুপ্ত, গণশা আর গোরাচাঁদ। রাজেন প্রশ্ন করিল, তারপর, গোরের শ্বশুর-বাড়ি কেমন লাগল গণশা?

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল, এক রাত্তির থেকেই চ'লে এলি যে বড়?

গোরাচাঁদের মনটা অপ্রসন্নই ছিল, একটু ব্যঙ্গের স্বরে উত্তর করিল, শ্বশুর-বাড়ি এক রাত্তিরের বেশি থাকলে মান থাকে নাকি?

ত্রিলোচন বলিল, সে কথা নয়, মানে, দিলে যে বড় আসতে?

গণশা কুটা না কি একটা দাঁতে কাটিতেছিল; গঙ্গার দিকে চাহিয়া বলিল, আসতে কি দি-দ্দিতে চায়? অনেক ক-ক্কষ্টে—

আর শেষ করিতে পারিল না। কথাটা বাড়ি ঘেরাও করিয়া আটকানো, খিড়কি দিয়া পলায়নের সঙ্গে এমন মিলিয়া গেল যে, আপনিই যেন তাহার গলার স্বর মাঝপথে বাধিয়া গেল।

শ্যামল-রাণী

মিত্তিরদের মেয়ে সুধা আজ বছর দুই পরে বাপের বাড়ি আসিল। গিয়াছিল যখন—একা। আজ পালকি হইতে নামিল, কোলে ননীর পুতুলের মত একটি শিশু। সাত বছরের ছোট বোন শৈল আহ্লাদের চোটে হাততালি দিয়া উঠিল, দিদিকে ঠিক ওপর-ঘরের পটের গণেশ-জননীর মত দেখতে হয় নি মা, যেটা নতুন টাঙানো হয়েছে? না গো বউদি?

সুধা মাকে আর ভাজকে প্রণাম করিয়া হাসিয়া বলিল, গণেশ-জননীর মা তবুও বছরের শেষে একবার ক'রে তাঁর মেয়েকে—

গলা ভারী হইয়া গেল, চোখ ডবডব করিয়া উঠিল, ঠোঁটে হাসিটা কিন্তু লাগিয়াই রহিল। বাপের বাড়ি আসার মিশ্র অনুভূতি, একটুতেই হাসি ধৌত করিয়া অশ্রু উছলিয়া উঠে।

খোকাকে বুকে লইয়া, চুমা খাইয়া, মা আঁচলে চোখ দুইটা মুছিয়া বলিলেন, মার কি অসাধ বাছা? যা সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে দিয়েছি! তারপর, ভাল ছিলি সুধা? ওমা, এটা কি চমৎকার হয়েছে গো! ছেলেবেলাতে তুই ঠিক এই রকমটি ছিলি, বেশ মনে আছে কিনা!

মেয়ের আবদারের সঙ্গে নূতন মায়ের গরবের সুর মিশাইয়া সুধা বলিল, তুমি তো বলবেই। আমি কিন্তু অমন দস্যি ছিলাম না বাপু, কক্ষনই না। আমায় তো নাজেহাল ক'রে দিয়েছে। সামলানো কি সোজা!

ভাজ ততক্ষণ খোকাকে লইয়াছে। একটু একান্তে ঠোঁট টিপিয়া বলিল, একটিতেই?

ননদ-ভাজের মধ্যে এক ধরনের চোখোচোখি হইয়া গেল।

শৈল খোকার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, দাও আমার কোলে বউদি, আমি তো মাসী হই।

খোকাকে দিয়া বউদিদি হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, ক্ষুদে মাসী।

সুধাও হাসিয়া উঠিল। ছোট ভাইপো মন্তু মার পিছনে আঁচল ধরিয়া অপ্রতিভভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, আর পিসীর সহিত পটের গণেশ-জননীর সাদৃশ্য খুঁজিয়া হয়রান হইতেছিল; সুধা তাহাকে কোলে লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, হ্যাঁরে খোকা, পিসীকে ভুলে গেলি? দেখছ মা, ছেলের বেইমানি? আর এই পিসী এক দণ্ড না হ'লে চলত না!

মন্তু ছুটিয়া পলাইয়া শৈলর কাছে গিয়া দাঁড়াইল এবং যাইতে যাইতে শিশুর দিকে চাহিয়া, নিজের মনোগত সমস্যার একটা মীমাংসা করিয়া লইয়া বলিল, খোকা ঠিক পটের গণেশের মত মোটা হয়েছে, না মেজপিসী?

খোকার মাসী চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, মার পানে চাহিয়া ভীত স্বরে বলিয়া উঠিল, শুনলে মা? খোকা নাকি গণেশের মত মোটা হয়েছে! এই বেস্পতিবারের বারবেলা ছেলেটাকে খুঁড়লে! ষাট ষাট!

তাহার রকমখানা দেখিয়া মা, সুধা, বউদিদি তিনজনেই হাসিয়া উঠিল।

সুধা বলিল, রোববারের সকাল একেবারে বেস্পতিবারের বারবেলা হয়ে গেল! ঠিক সেই রকম গিন্নী আছে শৈলী, না মা? বরং আরও বেড়েছে।

বউদিদি হাসিয়া বলিল, তোমার জায়গা দখল করেছে। বাড়িতে

একটি থাকা চাই তো, নইলে গরু বেড়াল পায়রা এদের সংসার কে দেখবে বল ?

দুই বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত সেই ব্যাপারই ছিল। আজ সে কথার উল্লেখে একটু লজ্জা আসিল বটে, কিন্তু সুধা আগ্রহটাও দমন করিতে পারিল না ; জিজ্ঞাসা করিল, পায়রাগুলো বিদেয় ক'রে দিয়েছে নাকি মা ? পুসীটার এবারে কটা ছানা হ'ল ? আর শ্যামলী ? তার বাছুরটা কেমন হ'ল ? যাক, একটা সাধ মিটবে এবার, শ্যামলীর দুধ খেয়ে যাব ! ভাবতেও কি রকম হয়, না মা ? এই সেদিনকার শ্যামলী, এতটুকু বাছুর, বাড়ি এল—সিঁদুর হলুদ দিয়ে গোয়ালে তোলা হ'ল, আর আজ তার নিজেরই বাছুর !

বউদিদি যেন ওত পাতিয়া ননদের কথাগুলি শুনিতেছিল, এই পর্য্যন্ত আসিলে একটু অর্থপূর্ণ হাস্যের সহিত সংক্ষেপে বলিল, ওই রকমই হয়।

বাড়িতে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রবেশ করিতে করিতে সুধা আবদারে নালিশের সুরে বলিল, দেখছ মা বউদিকে ?

অল্পক্ষণ পরেই শ্বশুর-বাড়ির বউ-মানুষের ভাব আর মাতৃত্বের গাম্ভীর্য্য যাহা একটু লাগিয়া ছিল, সুধার দেহ-মন হইতে একেবারে অপসৃত হইয়া গেল। জামা কাপড় ছাড়া, বাক্সপত্তর গোছানো সব ভুলিয়া সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুসীটাকে প্রথমে তল্লাস করিয়া বাহির করিল, এক আঁজলা চাল উঠানের মাঝখানে ছড়াইয়া দিতেই পায়রাগুলা ঝাঁকে ঝাঁকে নামিয়া বক্‌বকম আওয়াজ করিয়া ভোজের মধ্যে সংস্কৃত-উদ্গারী পণ্ডিতের মত এক মহাসমারোহ লাগাইয়া দিল। সুধা তাহাদের সামনে রকে পা ছড়াইয়া বসিয়া পুসীকে কোলে চাপড়াইতে চাপড়াইতে সুর করিয়া ছড়া কাটিতেছিল—

সারা ভারত বাড়ি বাড়ি ষষ্ঠী-ঠাকুর ব'য়ে
একেবারেই হ'ল পুসীর সাতটি ছেলেমেয়ে ;
বর দাঁড়াল শাপে গিয়ে, অন্ন দেওয়া ভার—

এমন সময় বোনপোকে পাড়ায় টহল দেওয়াইয়া শৈল আসিয়া উপস্থিত হইল, পিছনে পিছনে দুইটি বিড়ালছানা। সুধার কাছে পরিচয় করাইয়া দিল, পুসীর ছানা ; একটি শেয়ালের পেটে গেছে, তবুও কি একবার ঘুরে দেখে ! মুয়ে আগুন মায়ের, ওকে আর আদর ক'রো না, দু চক্ষের বিষ। মা ষষ্ঠী কি দেখে যে ওকে দেন অতগুলো ক'রে। হ্যাঁ দিদি, এই ছেলে হ'ল তোমার দুষ্টু ?

খোকার মাথাটা নিজের কাঁধে চাপিয়া চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিল, এমন ঠাণ্ডা ছেলে এ তল্লাটে দেখাক দিকিন কেউ ! বাছা আমার 'মাসী' বলতে অজ্ঞান।

মা, বউদিদি, সুধা তিনজনেই হাসিয়া উঠিল। সুধা বলিল, আচ্ছা মা, পাঁচ মাসের একটা শিশু, সে ওকে কখন 'মাসী' বললে বল দিকিন ? আবার বলতে অজ্ঞান হয়ে গেল !

মা বলিলেন, মাসী হয়ে ওই জ্ঞানরহিত হয়েছে, কি যে করবে, কি বলবে—

শৈল তাহার মাসীত্ব লইয়া এমন ব্যাখ্যানায় অপ্রস্তুত হইয়া খোকাকে বুকে বসাইয়া দুড়দুড় করিয়া পলাইতেছিল। দুয়ারের নিকট হইতে হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া সন্ত্রস্তভাবে বলিল, ও দিদি, শিগগির পুসীকে নামিয়ে খোকাকে কোলে নিয়ে ভব্যিসব্যি হয়ে ব'স ; তোমার সই, সই-মা, ওপাড়ার সতী-পিসী—একপাল সব দেখতে আসছে তোমায় ; দাও নামিয়ে, দিলে ?

সুধা ধীরে-সুস্থে বাটি হইতে এক মুঠা চাল উঠানে পায়রার ঝাঁকের

উপর ছড়াইয়া দিয়া বলিল, ব'য়ে গেছে আমার ; শ্বশুর-বাড়ির কনে-বউ নাকি ?

২

গাড়িতে সমস্ত রাত্রি জাগার জের, বিকাল হইয়া গেলেও সুধা অঘোরে নিদ্রা দিতেছিল। শৈল হন্তদন্ত হইয়া আসিয়া তাহাকে ঠেলিয়া উঠাইল, ও দিদি, শ্যামলী ফিরে এসেছে, তার বাছুর দেখসে ; কি চমৎকার যে হয়েছে, এ তল্লাটে অমন বাছুর কেউ যদি—

মা ধমক দিয়া উঠিলেন, না, এ তল্লাটে যা কিছু এক তোদেরই আছে। দেখ দিকিন, সমস্ত রাত ঘুমোয় নি মেয়েটা, মিছিমিছি এসে তুললে !

শৈলর মনে দিদির আর খোকার আসার সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে একটা তোড় নামিয়া গিয়াছে ; কিন্তু সেটা যেন নিজের বেগেই সব জায়গায় ধাক্কা খাইয়া মরিতেছে। উৎসাহের মুখে মার নিকট ধমক খাইয়া বেচারী সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, দিদির কথায় আবার সামলাইয়া উঠিল। উঠিতে উঠিতে সুধা হাসিয়া বলিল, ভাগ্যিস শৈলী তুললে মা ! স্বপ্ন দেখছিলাম, খোকাকে না দেখে শ্বশুরের যেন ভীমরতি দাঁড়িয়ে গেছে ; এসে বলছেন, এক বছর হয়ে গেল বউমাকে পাঠিয়েছি ; কতদিন আর রাখা চলে ? যাবেনই নিয়ে, তোমরা হাতে ধ'রে কাকুতি-মিনতি ক'রে বলছ, এই মোটে আজ সকালে এসেছে বেই-মশাই—। কে শোনে ? সেজেগুজে কাঁদতে কাঁদতে বেরুচ্ছি, এমন সময় শৈলী—

শৈল চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া একেবারে তদ্গত হইয়া

শুনিতেছিল ; উল্লাসে হাততালি দিয়া নাচিয়া উঠিল, দেখ, কেমন আমি দিদিকে বাঁচিয়ে দিয়েছি ; যদি না—

তাহার পর সবার হাসিতে নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়া, একেবারে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দিদির কোলে মিশিয়া গেল।

সুধা বলিল, ওঠ্, দেখিগে চল্।

নামিতেই খোকা জাগিয়া উঠিল। দেখেছ? ওর টনক নড়ে, কোথাও যদি এক পা যাবার জো আছে!—বলিতে বলিতে খোকাকে তুলিয়া লইল, ভাজের দিকে চাহিয়া বলিল, বউদি, তুমিও এস ভাই।

হাতের পাটটা সেরে আসছি, তুমি এগোও।—বলিয়া সে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

শ্যামলী গোয়ালঘরে তৃপ্তির গাঢ় নিশ্বাসের সঙ্গে জাবনা খাইতেছিল, আর মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া সামনের খোলা জায়গায় চঞ্চল উৎক্ষিপ্যমান বৎসটির পানে চাহিয়া এক-একটি হ্রস্ব অথচ গভীর আওয়াজ করিয়া নিজের বাৎসল্য-স্নেহ প্রকাশ করিতেছিল। সুধা সামনে আসিয়া বলিল, কি লা শ্যামলী, চিনতে পারিস? ওমা, কত বড়টা হয়ে গেছে গরুটা!

শ্যামলী নাদা হইতে ঘাড়টা বাহির করিয়া জাবনা চিবাইতে চিবাইতে প্রশ্নকর্ত্রীর পানে একটু চাহিল, তাহার পর হঠাৎ মুখনাড়া বন্ধ করিয়া দুই পা আগাইয়া আসিয়া সুধার ডান হাতটা সুদীর্ঘ টানের সঙ্গে চাটিতে আরম্ভ করিয়া দিল। বুকের নিকট হইতে একটা অব্যক্ত ভরাট আওয়াজ বাহির হইয়া আসিতে লাগিল, এবং প্রবল নিশ্বাসে মুখের উপরের জাবনার কুটাকাঠিগুলা সুধার শাড়ির উপর উড়িয়া সাঁটিয়া যাইতে লাগিল।

খানিকক্ষণ জিবের আঁচড় সহ্য করিয়া সুধা সুড়সুড়িতে ঘাড়টা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, ওরে থাম্, বাছুর চেটে তোর যা জিব হয়েছে, আমার

এক পর্দ্দা চামড়া উঠে গেল! দেখ কাণ্ড, আবার খোকাকে চাটতে যায়!

হাসিয়া দুই পা পিছাইয়া গেল। শ্যামলী ব্যগ্রভাবে একবার দড়িতে টান দিয়া ঘাড়টা নাড়িয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে বাছুরটার উপর নজর পড়ায় 'ম্বা' করিয়া ডাক দিয়া উঠিল এবং বাছুরটা ছুটিয়া আসিলে কিছুক্ষণ আগন্তুকদের ভুলিয়া সপ্রেমে তাহার গাটা ঘন ঘন একচোট চাটিয়া দিয়া আবার সুস্থির হইয়া দাঁড়াইল।

শৈল চোখ মুখ কৌতুকে বোঝাই করিয়া বাছুরের সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যান করিতে যাইতেছিল, দুই-একটা কথা বলিয়া দিদির দিকে চাহিতেই থমকিয়া গেল। দিদি ডান হাতের তর্জ্জনীটা গালে চাপিয়া, নিতান্ত বিস্ময়ে ঘাড় কাত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; বলিল, দেখলি শৈলী, কাণ্ডটা?

শৈল এমন কিছু কাণ্ড দেখিতে পায় নাই, যাহাতে দিদির এতটা ভাবান্তর হইতে পারে। প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, তাহার পূর্ব্বেই সুধা শুরু করিয়া দিল, দেখলি না ঠেকারটা? খোকাকে চাটতে দিলাম না, তাই স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে—তোমার খোকা আছে, আমার নেই? এই দেখ। কেমন ডাকলে, কেমন কোলে টেনে নিয়ে চাটতে লাগল! হ্যাঁলা শ্যামলী, গেরস্তকে এতদিনেও একটা নই-বাছুর দেওয়ার মুরোদ হ'ল না, উল্টে আমার সঙ্গে টেক্কা দিতে এলি! মুয়ে আগুন, ব্যাটা-বাছুরের আবার গুমোর কি লা? কি কাজে লাগবে? কদ্দিনই বা কাছে ধ'রে রাখতে পারবি? আমার এই সোনার চাঁদের সঙ্গে তুলনা হ'ল কিনা—

বউদিদি আর মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বউদিদি হাসিয়া বলিল, কি কথা হচ্ছে গো পুরনো সইয়ের সঙ্গে?

দিদির কথাবার্ত্তা শুনিবার পর শৈল শ্যামলীর ব্যবহারে দিদির চেয়েও

ক্ষুব্ধ ও বিস্ময়ান্বিত হইয়া গিয়াছিল, বড় বড় চোখ করিয়া আরম্ভ করিল, বললে পেত্যয় যাবে না মা, দিদির কোলে খোকাকে দেখে শ্যামলী ঠেকার ক'রে—

কোন্ ফাঁকতালে হঠাৎ ছেলেবেলার সুধা আসিয়া তাহার মূক সখীর সঙ্গে মুখর আলাপ জমাইয়া তুলিয়াছিল, শরমের স্পর্শে আবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়া গেল। নদীর মধ্যে হঠাৎ যেন ঝরনার উচ্ছলতা আসিয়া পড়িয়াছিল। শৈলকে ধমক দিয়া সুধা বলিল, হ্যাঁঃ, গরুর নাকি আবার ঠেকার হয়? পাগলের মত যা-তা বকিস নি শৈলী।

শ্যামলীব কাণ্ডের চেয়ে দিদির কাণ্ড আরও দুর্ব্বোধ্য বলিয়া বোধ হইল; শৈল অপ্রতিভ হইয়া হাঁ করিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুধা মাকে কহিল, বলছিলাম মা, শ্যামলীর শেষে ব্যাটা-বাছুর হ'ল? নই হ'লে নিয়ে যেতাম আমি। শ্বশুর কি ভাল একটা নাকি ওষুধ জানেন, খাওয়ালে নাকি নই-বাছুর হতেই হবে। হাসছ বউদি, কিন্তু একেবারে নাকি পরীক্ষিত, নড়চড় হবার জো নেই।

মাও না হাসিয়া পারিলেন না, বলিলেন, তিনবার তো 'নাকি' বললি, অথচ নড়চড়ও হবার জো নেই; শ্বশুর তোর ভারি গুণী তো!

সুধা লজ্জায় 'যাও' বলিয়া মুখ ফিরাইল।

ভাজ বলিল, তার চেয়ে তুমি শ্যামলীকে নিয়ে যাও না ঠাকুরঝি, ঠাকুর-জামাইয়েরও পণ রক্ষা হয়।

সুধা ঘাড় নীচু করিয়া বাড়ির দিকে পা বাড়াইয়া বলিল, না বাবু, আমি চললাম, শাশুড়ী-বউয়ে একজোট হয়ে আমার পেছনে লাগলেন সব।

সে একটা আলাদা কাহিনী, বিবাহের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়ানো। যতই বড় হইতেছে, তাহার লজ্জাটা সুধাকে ততই অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে।

হরবিলাস শর্দ্দার বিবাহ-সংক্রান্ত বিল লইয়া সারা দেশটায় সামাল সামাল রব পড়িয়া গেল; লোকে বলিল, কালাপাহাড় এবার কলম হাতে করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। সে আজ প্রায় চার-পাঁচ বৎসরের কথা; সুধা আট পারাইয়া নয়ে পড়িবে। দুপুরে সরকারদের চণ্ডীমণ্ডপে যখন গ্রামের মাতব্বরদের মধ্যে আসন্ন ধর্ম্মবিপ্লব লইয়া সূচ্যগ্র আলোচনা চলিতে থাকে, সে তখন তাহাদের নূতন গোয়াল-ঘরের পিছনে লিচু-গাছের ছায়ায় খেলাঘর পাতিয়া জীবনের মাঝখানে বিচরণ করিতে থাকে। হালদারদের নিমাই হয় কর্ত্তা, সে হয় গিন্নী। দুই বছরের শিশু শৈল হয় মেয়ে। পুসী বেড়ালটা তখন বাচ্চা, চারখানা ইটের একটা ছোট্ট ঘরে কাপড়ের পাড়ে বাঁধা থাকিয়া অসহায়ভাবে বসিয়া থাকে, 'মিউ মিউ' করিয়া শব্দ করিলে সুধা বিব্রত হইয়া বলে, ওদিকে গরুটা ডেকে ডেকে সারা হয়ে গেল, কোন্ দিকটা যে সামলাই!

সই বউমা হয়। নিমাইয়ের ভাই ননী প্রায়ই অসুখে ভোগে, যেদিন আসিতে পারিল, সেদিন হয় সে বাড়ির ছেলে—সই-বউমার বর, সে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকিলে সইকে নূতনত্বের খাতিরে বিধবা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

আসল সংসারে যে সব কথা হয়, নকলে তাহার প্রতিধ্বনি উঠে। সুধা রান্না করিতে করিতে কড়ায় খন্তির দুই-তিনটা ঘা দেয়, উঠানের

মধ্যে কাঠটা একটু ঠেলিয়া দিয়া ঘুরিয়া বসে এবং হাঁটু দুইটা মুড়িয়া ডাকে, বলি হ্যাঁগা, শুনছ ?

নিমাই আসিয়া উপস্থিত হয়, জিজ্ঞাসা করে, কথাটা কি ?

সুধা তাহার গাফিলতিতে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া যায় ; নিজের গৃহিণীত্ব ভুলিয়া বলিয়া উঠে, নাঃ, তোমায় শিখিয়ে শিখিয়ে পেরে উঠলাম না নিমুদা ; বাবার মত হাতে হুঁকো কই ?

ছেলেটা বড় ভুলো-মন, খুঁজিয়া পাতিয়া হুঁকাটা লইয়া আসে। একটা পেঁপের ডাঁটার নীচের দিকটা একটু ছেঁদা করা, মাথায় একটা কলকে-ফুল বসানো। একখানা ইট পাতিয়া তাহার উপর বসিয়া প্রশ্ন করে, কি বলছিলে ?

বলছিলাম আমার মাথা আর মুণ্ডু ; নাকে তেল দিয়ে সব ঘুমুচ্ছ, সরকার বাহাদুর যে এদিকে জাত কুল নিয়ে টানাটানি লাগিয়েছে—হিঁদুয়ানি যে যেতে বসল। শুনছি নাকি মেয়েদের আর বাইশ বছরের কমে বিয়ে দিতে দেবে না !

কর্ত্তা নিমু বলে, বাইশ, না আঠারো ?

বড় তফাত ! আজ আঠারো, কাল পালটে বাইশ ক'রে দেবে। বলি, সুধীটার কথা ভাবছ ?

আট বছরের শিশু, ওর কথাটা আর কি ভাবব ? শুনছি, জেলায় এই নিয়ে একটা মিটিং হবে ; গ্রাম থেকে ডালঘেঁটে পাঠাবার জন্যে তারণ খুড়োর কাছে লোক এসেছিল।

সুধা আরও গম্ভীর হইয়া বাধা দিয়া বলে, বাইরের লোক তোমার জাত বাঁচাবে, সেই ভরসায় আছ ? তোমাদের ঘটে কি একটুও বুদ্ধি—

তাহার কড়া চোখ দেখিয়া নিমাই একটু থতমত খাইয়া যায় ; তাহা ছাড়া নিজে একটু হাঁদা বলিয়া কথাটা সাক্ষাৎভাবে আঘাতও

করে। আমতা আমতা করিয়া একটু নীচু হইয়া বলে, হ্যাঃ, বুদ্ধি নেই কে বললে? খালি ওই কথা!

রাগের চোটে সুধা পিঁড়া ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলে, তোমার দ্বারা হবে না নিমুদা, তুমি বাড়ি যাও। 'যে মেয়েমানুষের দশ-হাত কাপড়ে কাছা জোটে না, সে আবার বুদ্ধির খোঁটা দেয়'—রেগে এইখানে এই কথাটা বলতে হবে না? শুনলে না, সেদিন বাবা মাকে বললেন?

সুধার মূর্ত্তি দেখিয়া নিমাইয়ের নিজেরই কাছাকোঁচার ঠিক থাকে না। কোন রকমে কাপড়টা সামলাইয়া লইয়া বলে, আচ্ছা, বলছি, ব'স্; তোর মা কিন্তু ওরকম রেগে কাঁই হয়ে ওঠে না সুধী, তা ব'লে দিচ্ছি; তোকে নিয়ে ঘর করা বড় শক্ত।

এই সময় একদিন সুধার বাপ রামরতন বাঘমারীর হাট হইতে শ্যামলীকে কিনিয়া আনিলেন। ইহাতে যে শুধু পুসী বেড়ালটা গাম্ভীর্য্য হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিল, তাহাই নয়, খেলাঘরের ঘরকন্নার পদ্ধতিতেও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিল।

রান্নাবান্না, ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল তোলা—এ সবের পাট উঠিয়া গিয়াছে; এখন কর্ত্তা গিন্নী, ছেলে বড় সকলে শ্যামলীর পিছনে হয়রান; কোথায় নধর ঘাস জন্মাইয়াছে, কোঁচড় ভরিয়া তুলিয়া আনা; কে কোথায় গাছ কি ডাল কাটিয়াছে, পাতা সংগ্রহ করা; ওদিকে গ্রামে সবার বাগানে যে কি হইয়াছে, নেউল-তাড়ানো চুন-দাগা হাঁড়িতে আর কাজ হয় না। নিমাই তো সুধাকে তুষ্ট করিবার এমন সুবর্ণ-সুযোগ পাইয়া একেবারে মাতিয়া উঠিয়াছে; এতদিন স্কুলে যে সময়টা নষ্ট হইত, তাহারও বহুলাংশ এখন শ্যামলী-পরিচর্য্যায় সার্থক হইয়া উঠিতেছে। এই সব করিয়া যে সময়টুকু উদ্বৃত্ত হয়, তাহাতে সুধা সকলকে গো-তত্ত্ব শিক্ষা দেয়।

বলে, তোমরা যে মনে কর মশাই, ওরা আসল গরু, বুদ্ধিসুদ্ধি নেই, তা নয়। সব বোঝে, দেখছ না, কি রকম ক'রে আমাদের কথা শুনছে? সত্যযুগে ওরা কথাও কইত।

ননী বলে, ওরা তো ভগবতী।

বাৎসল্যের মৃদু হাস্যের সহিত সুধা বলে, হ্যাঁ, ভগবতী, তা ব'লে কি লক্ষ্মী-সরস্বতীর মা ভগবতী? তা নয়; ও অন্য রকম ভগবতী। হ্যাঁ, কি যে বলছিলাম—সত্যযুগে ওরা কথাও বলত, তারপর কোন্ মুনির শাপে বোবা হয়ে যায়। অনেক কান্নাকাটির পর মুনি বলেন, আচ্ছা, যা, তোদের কোন কষ্ট হবে না, তোদের বুদ্ধি একটু মানুষের মাথায় সাঁদ ক'রে দিচ্ছি, তোদের নিজের জাত যেমন তোদের ইশারা বুঝবে, মানুষেও সেই রকম বুঝতে পারবে। কাছে গেলে শ্যামলী যখন তোমার হাত চাটে, তখন তোমার তো বুঝতে বাকি থাকে না যে, ঘাস পাতা তুলে আনতে বলছে—সে কেমন ক'রে বোঝ মশাই? যখন—

ভক্তিমান ননী বলে, আর গরু তো স্বর্গ, ওদের গায়ে তেত্রিশ কোটি দেবতা থাকেন।

সুধা বলে, থাকেনই তো, মুখে বেহ্মা থাকেন, মাথায় জগন্নাথ থাকেন, ন্যাজে কাত্তিক থাকেন—

সই দয়াপরবশ হইয়া বলে, আহা, কাত্তিক ঠাকুরের বড় কষ্ট ভাই; সব্বদা ন্যাজ ধ'রে ঝুলতে হয়।

সুধা বলে, চুপ, বলতে নেই। তাহার পর নিমাইয়ের পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হানিয়া বলে, আর অত দেবতা থাকেন ব'লেই তো গরুর জন্যে চুরি-টুরি করলে কোন দোষ হয় না, বরং পুণ্যিই হয়। এই দেখ না, একটা পিঁপড়ে মারলেও কত পাপ হয় তো? কিন্তু মা কালীর সামনে পাঁঠা বলি দিলে কোন দোষ হয় কি?

যুক্তিটা অকাট্য ; ইঙ্গিতটাও অস্পষ্ট নয়, ফলে নিমাইয়ের গোয়াল হইতে কোঁচড়-ভরা খোল, কুঁড়ো, কলাই হাজির হইয়া শ্যামলীর উদরে প্রবেশ করে। সইও সাধ্যমত পুণ্য-সঞ্চয়ে মনোযোগী হইয়া উঠে।

৪

এদিককার খবর সংক্ষেপত এই—

জেলার মিটিং হইয়াছিল ; হরবিলাস শর্দ্দাকে যথাযোগ্য গালাগালির পর ছেলেদের বিবাহযোগ্য বয়স যোল এবং মেয়েদের বারো ধার্য্য করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সরকারদের চণ্ডীমণ্ডপে এর তুমুল আলোচনা হইয়াছিল, তাহাতে হরবিলাস শর্দ্দা এবং জেলার উকিল ও অন্যান্য উদ্যোক্তাদের যথাযোগ্য গালাগালির পর ছেলেদের ন্যূনতম বয়স চৌদ্দ এবং মেয়েদের দশ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ও পাড়ার তিনকড়ি খুড়ীর বাড়িতে উৎকট রকমের এক মেয়ে-মিটিং বসিয়াছিল, তাহাতে হরবিলাস শর্দ্দা, গবর্মেণ্ট বাহাদুর, জেলার উকিল এবং সরকারদের চণ্ডীমণ্ডপে যাহারা তামাক পোড়ায়, সকলকেই একসাটে ভাগাড়ে দেওয়া হইয়াছে। গ্রামের নানারূপ কেচ্ছা-কাহিনী আলোচনার পর সকলের মনের বোঝা হালকা হইলে ধার্য্য হইয়াছে যে, ইহাদের পুরাপুরি মতিচ্ছন্ন হইবার পূর্ব্বেই বয়স-নির্ব্বিশেষে গ্রামের সমস্ত অনূঢ়া কন্যাকে পাত্রস্থা করিয়া জাতি কুল বাঁচাইতেই হইবে ;—তা বর কানা হউক, খোঁড়া হউক, নুলা হউক, কুঁজা হউক, মন্ত্রটা কোন রকমে আওড়াইয়া দিতে পারিলেই হইল।

বিধি-ব্যবস্থার যথেষ্ট অভাব থাকিলেও দুপুরের এই মহিলা-মজলিসই সাধারণত জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে ; বিশেষ করিয়া মজলিসের কর্ণধার যদি তিনকড়ি খুড়ীর মত কেহ থাকেন।

পাড়ায় পাড়ায় কন্যা-মহামারী পড়িয়া গেল।

কয়েকদিন পরের কথা। বিকালে সুধা বাগানের এক কোণে শ্যামলীর গলা জড়াইয়া আদর করিতেছিল, শ্যামলী, শুমলী, শ্যামল-রাণী, তুমি আর কারুর নয় সোনামণি—

শ্যামলী তাহার সমস্ত পিঠখানি চাটিয়া চাটিয়া বোধ হয় জানাইতেছিল, না, আমি আর কাহারই নয়, একান্ত তোমারই।

এমন সময় মা আসিয়া বলিয়া উঠিলেন, দেখ কাণ্ডখানা! সমস্ত পাড়া তোলপাড় ক'রে মরছি, আর মেয়ে কিনা পাঁদাড়ের মধ্যে গরুর সঙ্গে সোহাগে ব্যস্ত! তোকে না আজ দেখতে আসবে সুধী? গা মাজতে হবে না? চুল বাঁধতে হবে না? চ'লে আয় শিগগির।

দেখিতে আসিলেন পণ্ডিতপাড়ার সাব-রেজিস্ট্রারবাবু, নাম জগবন্ধু রায়। বিদেশী লোক, মেদিনীপুরে বাড়ি, কার্যোপলক্ষ্যে বদলি হইয়া এখানে বছর দুই-তিন আছেন। ছেলেটি এখানে থার্ড ক্লাসে পড়ে; বছর তেরো বয়স হইবে। জগবন্ধুবাবু একটু বাহিরের খবরাখবর রাখেন এবং প্রত্যেক বিষয়ই যুক্তিতর্কের শেষ সীমানা পর্যন্ত ঠেলিয়া তুলিয়া অনুধাবন করেন। ছেলে তাঁহার একটু ছেলেমানুষ, কিন্তু এর পরেই তো সেই আঠারো। অনেক জায়গায় আবার মিটিং করিয়া হাঁকাহাঁকি করিতেছে—ছেলেদের বয়স করা হউক বাইশ চব্বিশ। এক মিস মেয়ো আসিয়াই এই ব্যাপার! ইতিমধ্যে যদি আর একটি আসিয়া পড়ে তো চক্ষুস্থির! ছেলেদের বয়স যে কোথায় গিয়া ঠেকিবে, কে জানে? বিবাহ জিনিসটাই থাকিলে হয়। বোধ হয় বৈদিক বিবাহপদ্ধতি উঠিয়া গিয়া সিভিল ম্যারেজের ধুম পড়িয়া যাইবে। শেষকালে চল্লিশ বছরের বুড়ো ছেলে লাভ করিয়া কোর্টে বিবাহ রেজেস্টারি করিয়া কাহাকে ঘরে

তুলিবে, কে বলিতে পারে? এখন একটু ভুলের জন্য শেষকালে জাত কুল সব যাক আর কি!

মেয়ে খুব পছন্দ। আশীর্ব্বাদও হইয়া গেল, এবং খুব কাছাকাছি একটা দিন স্থির করিয়া যোগাড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়া গেল।

সুধার মনটা ভাল নাই। যতদূর জানা আছে, বিবাহ জিনিসটা মন্দ নয়; কিন্তু ভাবনার কথা এই যে, শ্যামলীকে ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। আশীর্ব্বাদের পরদিন সকালবেলা সই আসিয়াছিল, সুধার মেজাজের জন্য খেলা জমে নাই। যাওয়ার সময় মুখ ভার করিয়া বলিয়া গিয়াছে, আচ্ছা লো, আমারও একদিন বিয়ে হবে, তখন দেখে নোব।

সুধা শ্যামলীর জন্য মনমরা হইয়া ঘাস ছিঁড়িতেছিল, নিমাই আসিয়া বলিল, ওগো, শুনছ?

ঘাড় বাঁকাইয়া শাসনের ভঙ্গীতে সুধা বলিল, তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি কবে হবে নিমুদা?

নিমাই ভড়কাইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল, কেন র‍্যা?

কেন র‍্যা! আমায় আর ও রকম ক'রে ডাকা চলে তোমার?

নিমাই সব কথা শুনিল; শেষের দিকে পাত্রের পরিচয় পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল, চমৎকার হবে। সে তো হরিহর, আমাদের স্কুলে থার্ড ক্লাসে পড়ে, আমি খুব জানি তাকে। মাইরি বলছি, বেশ হবে ভাই।

সুধা মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, তোমাদের তো খুব ফুর্ত্তি; আমার মনে যে কি হচ্ছে—

নিমাই কোন রোমান্সের গন্ধ পাইল কি না, সেই জানে, মাঝখানেই ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কেন র‍্যা সুধী?

বাছুরটার কথা ভাবছ? আমি শ্যামলীকে ছেড়ে থাকতে পারব?

আর আমায় ছেড়ে শ্যামলীই বাঁচবে? কথাটা বলিয়া নিমাইয়ের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতেই ঠোঁট দুইটি কাঁপিয়া উঠিল, চক্ষুর কূল ছাপাইয়া দুই ফোঁটা জল জমিয়া উঠিল। নিমাই হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া বলিল, কাঁদিস নি সুধী, খুড়ীমাকে বলব আমি।

ইহার পর শান্তভাবে চিন্তা করিয়া দেখা গেল, খুড়ীমাকে বলাও চলে না, আর ওসব উপায়ে কাজও হইবে না। ক্রমাগতই দুইজনে পরামর্শ হইতে লাগিল—বাগানের ঝোপঝাড়ের মধ্যে বসিয়া, গোয়াল-ঘরের কোণে, সন্ধ্যার সময় পুকুর-ঘাটের ভাঙা রানার নীচে। খেলা হয় না; ননী, সই আমল পায় না; সই যাইবার সময় নাক কুঁচকাইয়া বলে, বিয়ের কনের অত বেটাছেলে-ঘেঁষা হওযা ভাল নয় লো, এই শাস্ত্রবাক্য ব'লে দিলাম।

৫

বিয়ের রাত। পাশাপাশি দুই গ্রামের বর-কনে; বরপক্ষ-কন্যা-পক্ষের লোকজনে বাড়িটা গমগম করিতেছে। উঠানে বিবাহের সরঞ্জাম, চারিদিকে গোল করিয়া বিবাহ-সভা রচনা করা হইয়াছে, ছেলে বুড়ো ঠাসাঠাসি হইয়া বিবাহ দেখিতেছে।

অনুষ্ঠানের মধ্যে পুরোহিত সুধার বাপকে বলিলেন, এইবার তুমি মেয়ের ডান হাতটি তুলে ধর, সম্প্রদান করতে হবে। তুমি হাত পাত তো বাবা, শ্বশুরের দান নেবে। কই গো, হাতে জড়াবার মালাগাছটা?

সুধার বাপ সুধার হাতটা একটু তুলিয়া বাড়াইয়া ধরিলেন।

বর কিন্তু একটা কাণ্ড করিয়া বসিল। তাহার হাতটা এতক্ষণ বাহিরেই ছিল, হঠাৎ কাপড়ের মধ্যে টানিয়া লইয়া গোঁজ হইয়া বসিল।

সকলে যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। পুরোহিত পাকা লোক, হাসিয়া বলিলেন, হাত বের কর বাবা, লজ্জা কি? বড্ড ছেলেমানুষ কিনা!

সভার মধ্য হইতেও অনুরোধ, উপরোধ, হুকুম, ধমক কিছুই বাকি রহিল না। বর কিন্তু ক্রমাগতই হাত শক্ত করিয়া নিজের কোলের মধ্যে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। মুখটা রাঙা হইয়া গিয়াছে, ঘাড়টা গুঁজড়াইয়া বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

বর বেঁকে বসেছে, বর বেঁকে বসেছে।—বলিয়া একটা রব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বাড়ির ভিড় চাপ বাঁধিয়া উঠিল। জগবন্ধু আগন্তুকদের দেখাশুনায় বাহিরে ব্যস্ত ছিলেন। ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া হাজির হইলেন। কড়া গলায় বলিলেন, ব্যাপার কি রে হরে? হাত বের কর্। থার্ড ক্লাসে প'ড়ে স্বাধীনচেতা তরুণ হয়েছ, বটে?

পুরোহিত উঠিয়া তাঁহার পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় দিয়া বলিলেন, আপনি একটু ঠাণ্ডা হ'ন, রাগবার সময় নয়। ব্যাপার আমি বুঝেছি, সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

বরের নিকট আসিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া প্রশ্ন করিলেন, কি চাই তোমার বাবা, বল দিকিন আমায়?

কোন উত্তর হইল না। আর একটু অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, বল, শ্বশুরের কাছে তো চাইবেই। আমরাও এই রকম পণ ক'রে বসেছিলাম, এতে লজ্জা কি? সাইকেল চাই? নগদ টাকা? হারমোনিয়া?

বর জড়িত কণ্ঠে কি একটা বলিল। বেশ ভাল রকম বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন, স্পষ্ট ক'রে বল, কিচ্ছু লজ্জা নেই।

বাড়ির মধ্যে একটা খড়কে পড়িলে আওয়াজটা শুনা যায়। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে পুরোহিত ঠাকুর এক রকম চীৎকার করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, অ্যাঁ! কি বললে? শ্যামলী-বাছুর!

নিস্তব্ধতা সেই রকমই রহিল; কেহ যেন কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। একটা মুহূর্ত্ত, তাহার পর জগবন্ধু অগ্রসর হইয়া নাক মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, হারামজাদা! মানষের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দোব ব'লে নিয়ে এলাম, আর ভদ্দরলোক তোকে এখন নই-বাছুর সম্প্রদান করবেন? বের কর্ হাত, নয়তো তুই আছিস কি আমি আছি। করলি বের?

হরিহর আস্তে আস্তে হাতটা বাহির করিল, মুষ্টিবদ্ধ অবস্থাতেই রহিয়াছে, একটু একটু কাঁপিতেছে। সুধার বাপ ব্যাপারটার আকস্মিকতায় এতক্ষণ বিমূঢ়ভাবে বসিয়া ছিলেন, এইবার একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বাম হাতটা হরিহরের পিঠে রাখিয়া সস্নেহে কহিলেন, ও তো ছোট্ট বাছুর বাবা, তোমায় আমি ভাল এক জোড়া বিলিতী গাই-বাছুর কিনে দোব এই হাটেই। নাও, হাত খোল, লক্ষ্মী আমার।

জগবন্ধু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, না না, ও রকম আশকরা দেবেন না বেইমশাই, ওতে আমার বদনাম। ছেলে পণ ক'রে দুধ খাবার জন্যে গাই-বাছুর নিয়ে যাবে, লোকে বলবে—

বরপক্ষের একজন রসিক বৃদ্ধ কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, লোকে বলবে, বাপ-ব্যাটায় মিলে শ্বশুরকে দুইছে।

যাহারা বুঝিল, তাহাদের মধ্যে হাসি পড়িয়া গেল। সুধার বাপ একটু লজ্জিত হইলেন। জগবন্ধুর মাথায় তাঁহার নিজস্ব পদ্ধতিতে তর্ক জাগিয়া উঠিতেছিল; বলিলেন, একটু থামুন পুরুতমশাই, এর গোড়া এইখানেই মেরে দিতে হবে। দিব্যি এক মতলব বের করেছে তো! আজ বিয়ে করতে ব'সে পণ, এর পর শ্বশুর-বাড়ি আহারে ব'সে পণ, তারপর বউমাকে বাড়ি নিয়ে আসবার সময় পণ, প্রত্যেক বারেই শ্বশুর-শাশুড়ীর মাথায় হাত বুলিয়ে এটা ওটা সেটা হাতানো! আমি

কোথায় শর্দ্দা-আইন বাঁচাতে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে গেলাম, ছেলে আমার ভাবছেন, বাঃ, এ তো খাসা এক রোজগারের পথ বের হ'ল! কোন্ মুখ্যু আর লেখাপড়া করে, এই ব্যবসাই চালানো যাক। বলি, তোকে কে হদিস বাতলে দিলে র‍্যা? তুই শ্যামলী-বাছুরের নামই বা জানলি কেমন ক'রে? বল্, তোর ব্যবসার গোড়াপত্তনেই আমি গণেশ ওলটাব।

বাপের মুঠার মধ্যে সুধার হাতখানিও কাঁপিয়া উঠিল। এই অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে কচি বরবধূর প্রতি দয়াপরবশ হইয়া সুধার বাপ বলিলেন, থাক্ বেইমশাই, ছেলেমানুষ একটা কথা ব'লে ফেলেছে—

জগবন্ধু কড়া-ধাতের লোক, নিরস্ত করা গেল না। অনেক বকাবকি জেদাজেদির পর হরিহর মাথা তুলিয়া একবার পুরোহিতের পানে আড়ে চাহিল। তিনি উদ্দেশ্যটা বুঝিতে পারিয়া তাহার মুখের কাছে কান লইয়া গেলেন, তাহার পর বিস্ময়ের ঝোঁকে প্রায় হাতখানেক সরিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিলেন, সে কি! কনে বলেছে? নিমাই কি করেছিল? চিঠি দিয়ে এসেছিলে?

আরও ধমক-ধামক করার পর চিঠিটার সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি যে ছেলেকে টিপিয়া এই পণ করান নাই—সর্ব্বসমক্ষে এটা নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করাইবার পর জগবন্ধু তখনই বাড়িতে লোক ছুটাইলেন। হরিহরের নির্দ্দেশমত সে তাহার ভূগোলের পাতার মধ্য হইতে দলিলখানি সংগ্রহ করিয়া আনিল। লেখা আছে—

"প্রণামাবহব নিবেদন মিদং কার্য্যঞ্চাগে।

তোমার সহিত আমার বিয়ে ঠিক হইয়াছে। আমি খুব ভাগ্যবান। কিন্তু শ্যামলরাণীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। অতএব মহাশয়

বিয়ের সময় শ্যামলী চাই বলিয়া বেঁকে বসবেন। না হইলে আমি আপিম খাইয়া মরিব। আপিম আমার সারির আঁচলেই বন্ধিত থাকিবে, মোটা গেরো তুমি দেখিতে পাইবে। এতে দোষ হয় না। নেত্য-পিসিদের বরও সেদিন একটা ঝার লালঠেম চাই বলে বেকে বসেছিল। নিয়ে ছাড়িল। মা বলেন জিদই পুরুষের লক্ষণ। এ নিমাই। নিমাই আমায় প্রাণের চেয়েও ভালবাসে। সেই এ চিঠি লিখে দিয়েছে। আমি অবলা নারি লেখা পড়া জানি না শ্যামলী ছাড়া হইয়া থাকিতে হইত। নিমাই ভয়ঙ্কর বিদ্বান আর খুব ভাল ছেলে তোমাদের ইস্কুলে **6th class** পড়ে। প্রণাম জানিহ। ইতি

অভাগিনি

Sudha

সুধাময়ি দাসী”

ভয়ঙ্কর বিদ্বানটির হাজার খোঁজাখুঁজি করিয়াও সে রাত্রে বিয়ে-বাড়িতে কোন সন্ধানই মিলিল না। শাড়িতে একটি বড়গোছের গেরো পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সুখের বিষয় তাহাতে একটি বড় মার্বেল ভিন্ন অন্য কিছু ‘বন্ধিত’ ছিল না।
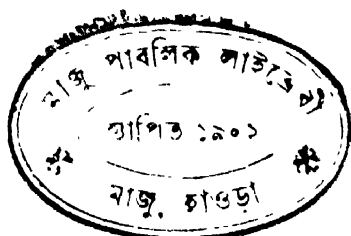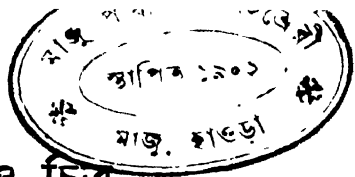
চিত্ত ও চিত্র

(হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের "অভিমান" চিত্রটি দেখিয়া)

চিত্র-শিল্পীর মডেল সে।

পঙ্কে তাহার জন্ম, কিন্তু বোধ করি, বিধাতা সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার অম্লান রূপ দেখিলে এই রকমই মনে হয়। মানুষও সে রূপের সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে; সুতরাং জীবনে তাহার ক্ষোভের আঁচড়টুকু পড়িতে পায় নাই। 'বেলা' বলিতে লোকে যেটুকু বুঝিত, অর্থাৎ সেরা ভাস্করের হাতে কোঁদা প্রস্তরমূর্ত্তির মত নিখুঁত নিটোল একটি দেহযষ্টি, তাহার যাহা পাওনা, লোকে তাহা অকার্পণ্যে মিটাইয়া আসিয়াছে। তাহার অভাব নাই কোনখানেই—না রূপে, না যৌবনে, না আদরে, না অর্থে। জীবন-শতদলের সব পলাশগুলিই একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; আর সে ইহাকেই তাহার নারীত্বের চরম পূর্ণতা মানিয়া লইয়া ইহারই মাদকতায় বিভোর ছিল।

শিল্পী তরুণ, নবীন তাহার প্রতিভা। বেলা সৌন্দর্য্যের রাণী, আর হাবভাবের অলঙ্কার দিয়া সে সৌন্দর্য্য সাজাইতে দক্ষ; সুতরাং চলিল ভালই। শিল্পীর প্রতিভার সহিত বেলা যেটুকু সংযোগ করিয়া দিত, তাহার ফলে চিত্রগুলি একেবারে অপরূপ হইয়া দাঁড়াইত। শিল্পী অন্তরের ভাবের ঐশ্বর্য্যে তন্ময় হইয়া মডেলকে কত ভঙ্গিমায় বসায়, শায়িত করে, কত ঠামে দাঁড় করায়, তাহার পর আঁকিবার আসনে আসিয়া দেখে তরুণী আবার তাহাতে পলকে শতগুণ সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে—কখনও সামান্য পাঁচটি অঙ্গুলির ললিত বিলাসে, কখনও নয়ন-কোণের কোথাও একটু কুটিল চঞ্চলতাকে সংযত করিয়া, কখনও গ্রীবার একটি অলস হেলনে, আবার কখনও বা এমন অনির্ব্বচনীয় একটা কিছুর দ্বারা,

যাহা অঙ্গের কোনখানেই ঠিক ধরা পড়ে না, অথচ যেন সৌরভের মত সমস্ত অঙ্গটিকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে।

শিল্পী পাগল হইয়া যায়। কি আঁকিবে সে? তুচ্ছ এ তুলির বর্ণে কতটুকু বা ধরা দেয়? বাস্তব যেখানে সীমাহীন, অনুকরণ তাহার কতটুকুকে সীমাবদ্ধ করিবে?

বাহিরে তসবির প্রকাশিত হয়। রসজ্ঞের বাহবায় দেশের হাওয়া মাতাইয়া তোলে। কিন্তু সে প্রশংসার উচ্ছ্বাস শিল্পীর মনের যেখানটা খালি থাকিয়া যায়, সেখানটা কিছুতেই পূর্ণ করিতে পারে না। দ্রষ্টারা দেখে যতখানি হইয়াছে, তাহাতে উল্লসিত হইয়া উঠে; চিত্রী ভাবে কতখানি যে হয় নাই তাহাই, তাহার অন্তরের হাহাকার শান্ত হয় না, অনায়ত্তের জন্য চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া থাকে।

এতই সুন্দর সে বেলা, আর এমনই মুগ্ধ সে চিত্রকর। কিন্তু এ মোহের মধ্যে একটা বিশেষত্ব ছিল। শিল্পী রূপটিকে মানুষ হইতে সম্পূর্ণ আলাদা করিয়াই দেখিয়া আসিয়াছে, এবং সেইজন্যই রূপের যে একটা বৈষয়িক দিক আছে, সে দিক দিয়াই তাহার সমাদর করিয়া আসিয়াছে। অর্থাৎ অর্থের বিষয়ে সে একেবারে উদার হইয়া পড়িল। বাঁধা মাহিনা যাহা ছিল বেলার, তাহার উপর সে কত পাইত, তাহার আর হিসাব ছিল না। ইহার কারণ ছিল, শিল্পী যে রূপ তুলির দ্বারা মাপিয়া উঠিতে পারিত না, তাহা অর্থের দ্বারা মাপিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইত। তাহার ছবির ক্রেতা যেমন সমুচিত মূল্য দিয়া তাহার ছবির সমাদর করিত, সেও বেলার মাধুর্য্য সম্বন্ধে সেই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছিল, কারণ দাম জিনিসটা পরিমাপের একটা সুস্পষ্ট উপায়; মূল্য দিয়া বেশ সহজে অনেকটা বুঝানো যায়, জিনিসটার এই পরিমাণ কদর, এতটা যোগ্যতা।

এ বন্দোবস্ত বেশ চলিয়া যাইতেছিল। বেলা নিয়মমত আসিত, বসিত; শিল্পী মনের মত করিয়া তাহার ভঙ্গিমাটুকু চুনিয়া লইত। প্রয়োজনের বাহিরে দুই-একটা কথা কোন দিন হইত, কোন দিন বা হইত না। তাহার পর বেলার ছুটি হইয়া যাইত; আর শিল্পী রঙের সমাবেশে মশগুল হইয়া পড়িত।

সাধারণত এরূপ ক্ষেত্রে তরুণ-তরুণীর মনস্তত্ত্ব লইয়া একটু গোলমাল হইয়া থাকে বটে; কিন্তু এ স্থলে সে ভয় ছিল না, কারণ মনের দিকটা, আকাঙ্ক্ষার দিকটা একেবারেই বাদ পড়িয়া গিয়াছিল উভয় তরফেই। তরুণ চাহিয়া ছিল উৎকর্ষের দিকটায়। মডেলের কোন্ ভঙ্গিমাটিতে কতটুকু মধুরিমা ফুটিল, কতটুকু ইঙ্গিত হইয়াই রহিল; তাহার মধ্যে আবার সেই বা কতটুকু ছানিয়া লইতে পারিল, কতটুকু তুলির সূক্ষ্মতাকেও এড়াইয়া গেল—এই লইয়াই সে ব্যস্ত থাকিত। তাহার নয়নে লাগিয়া থাকিত রূপের বিস্ময় অথবা চিত্রের সৌকর্য্যের জন্য আত্মপ্রসাদ। তাই হাজার মধুর হইলেও কোন ভঙ্গিমাই তাহার মনটাকে শিথিল করিয়া ফেলিতে পারিত না। বাহির হইতে দেখিলে বোধ হইত, কি এ তপস্বীর মত সংযম! কিন্তু এ সংযমের মধ্যে তাহার বিশেষ কোন প্রয়াসই ছিল না। কারণ সে ছিল শিল্পের সাধন লইয়া বিভোর, বাসনার স্থানই ছিল না সেথায়।

আর তরুণীর ছিল রূপই বেসাতি। তাই নিজের শরীরের এক-একটা ভঙ্গিমায় নিজেরই মনে যে এক-এক রকম ভাব জাগায়, সে কথা সাধারণে খাটিলেও বেলার পক্ষে খাটিত না। তাহার উদ্দেশ্য দেখানো, এবং সে দেখানোয় আর্টের যতটা ব্যঞ্জনা থাকে, ততই তার বেশি মূল্য তাহার পক্ষে। প্রথম প্রথম যেটুকু বা আন্তরিকতা ছিল, অভ্যাসে আবার তাহা একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রতীক্ষার তীব্র

উৎকণ্ঠা, কি সোহাগের তারল্য দেখানো এখন চলা-ফেরা-শোওয়া-বসার মতই সহজ স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া পড়িয়াছে ; মনকে আর জাগাইতে হয় না।

২

কিন্তু এ ভাবে আর বেশিদিন চলিল না। কারণ মনের সুপ্তি এক দিক দিয়া যেমন নিবিড়, অন্য দিকে আবার তেমনই লঘু ;—কখন একটা কুসুমের মত পেলব স্পর্শে সে যে জাগিয়া উঠে, বলা যায় না।

কারণটা ঠিক ধরা গেল না—একদিন যেন অহৈতুকভাবেই বেলার সমস্ত মনের উপর একটা কিসের ব্যথা ছাইয়া গেল। এ অদ্ভুত বেদনা কোন একটা আকার পরিগ্রহ করিল না, বেলার শুধু এইটুকুই মনে হইল, যেন একটা মস্তবড় ফাঁকির মধ্যে এতদিন সে কাটাইয়া দিয়াছে, পৃথিবী যেন একটা অলীক মোহের ফাঁদে ফেলিয়া তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চনা করিয়া আসিয়াছে এতদিন, অথচ পৃথিবী বিশেষ কেহ নয়, কাহার কাছেই বা অনুযোগ করে সে! তা ছাড়া কিই বা এমন প্রাপ্য ছিল তাহার, যাহা সে পায় নাই?

এসব কথার কোন সঙ্গত উত্তর পাওয়া গেল না, তবে বেদনাটা ধীরে ধীরে এমনই বিপুল বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে, তাহার সমস্ত জীবনটা যেন নিতান্ত অর্থহীন, লঘু এবং শূন্যময় হইয়া উঠিল।

এমনই করিয়া কয়েকদিন গেল ; অবশেষে একদিন এই মূক ব্যথার সঙ্গীত একটা সামান্য আঘাতে তাহার হৃদয়ের তারে ক্রন্দনের মিড়ে জাগিয়া উঠিল।

একদিন শিল্পী বেলার সামনে একটা অনেকদিনের পুরানো ছবি আনিয়া ধরিল ; হাসিয়া বলিল, পৃথিবীতে সব জিনিসেরই দেখছি একটা

দাম আছে। এই ছবিটাও শেষ পর্য্যন্ত বেশ দামে বিকোতে চলল। এর যে কখনও কদর হবে, তা স্বপ্নেও ভাবি নি।

কার চোখে কিসে নেশা ধরায়, বলা যায় কি? দেখি, কোন্ ছবিটা?—বলিয়া বেলাও হাসিয়া ছবিটা হাতে করিয়া লইল; কিন্তু ছবিটা এবং তলায় তাহার নামটাতে দৃষ্টিপাত করিতেই তাহার মনটা হঠাৎ যেন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং ক্রমে হাসিটা মিলাইয়া গিয়া চক্ষু দুইটা ঈষৎ সিক্ত হইয়া উঠিল।

একটা সামান্যই ছবি। নিতান্ত একটা সাধারণ বেষ্টনীর মধ্যে নিরালায় কিশোরী নিজের অন্তরের পানে চাহিবার অবসর পাইয়া যেন কাহার স্মৃতিতে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। কেহই কাছে নাই; কিন্তু কিসের শরম, কিসের শঙ্কা এবং শরম-শঙ্কাজড়িত কি এক মাধুর্য্যে মাথাটি নুইয়া পড়িয়াছে। মনে হয়, অন্তরে যে দেবতা জাগিয়াছে, তাহার মানসী মূর্ত্তির কাছে কিশোরী নিরবশেষভাবে আপনাকে নিবেদন করিয়া দিতেছে। নীচে লেখা আছে, "সমর্পণ"।

বেলা যেন আত্মবিস্মৃত হইয়াই চাহিয়া রহিল। পূর্ব্বেও ছবিটা এই ঘরের ছবির ভিড়ের মধ্যে নিশ্চয় দেখিয়াছে; কিন্তু আজ নূতন করিয়া তাহার মনে হইল, যেন তাহারই অন্তরের ব্যথা এই বর্ণ আর রেখার ভাষায় মুখর হইয়া উঠিয়াছে, যেন সে তাহার দয়িতের কাছে নিতান্তই আজ ধরা পড়িয়া গেল। তাই শিল্পী কথা কহিতেই সে হঠাৎ সচকিত হইয়া মুহূর্ত্তেই লজ্জাবতী লতাটির মত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

শিল্পী বলিল, তোমায়ই দেখে, অনেকদিন আগে, বোধ হয় প্রথম আঁকা ছবি।

আবার বলিল, তখন রঙ ফলানোয় আর আঁকার ভঙ্গিমায় তেমন হাত খোলে নি, কিন্তু তা হ'লেও আত্মনিবেদনের ভাবটা জীবন্ত হয়েছিল খুব, না? আমার চোখেও যেন নতুন ক'রে ভাল লাগছে।

আশা-আশঙ্কায় বেলার অন্তরটা যেন মথিত হইয়া উঠিল। ছবি হইতে আরম্ভ করিয়া শিল্পীর সমস্ত কথাগুলা পর্য্যন্ত আজ নূতন অর্থে অর্থবান হইয়া উঠিয়াছে।

শিল্পী আবার বলিয়া চলিল, যিনি কিনবেন, নতুন বিয়ে করেছেন শুনলাম, ছবিটি বড় চোখে লেগেছে। যাক, আমাদের কাজটা তবুও সার্থক হ'ল।

হায়, ভুল আশা! বেলার বুক ঠেলিয়া ক্রন্দন উঠিতেছিল, ওগো, আমার সার্থকতা এতে নয়—এতে নয়। সে কথা তোমায় আজ কি ক'রে বোঝাই? আমার প্রাণের নিবেদনকে তুলি দিয়ে একটু একটু ক'রে আহরণ ক'রে যে ছবি সৃষ্টি ক'রে তুললে, তা অপরের কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠল; কিন্তু তোমার বুকেই কেবল এতটুকুও স্পন্দন জাগাতে পারলে না? কি ক'রে তোমায় জানাই যে, এ চিত্রে সত্যই আমারই অন্তরের প্রতিচ্ছায়া ফুটে উঠেছে, সমস্তটাই তোমার কল্পনার লীলা নয় এ? হে উদাসীন, একবার আজ নিবিষ্ট হয়ে দেখ, চিরদিনই কি এই রকম ভাবে ভুল বুঝে আমায় বিড়ম্বিত করবে?

অত কথা কিন্তু বলা গেল না; নিতান্তই মিনতিক্লিষ্ট স্বরে বেলা শুধু বলিতে পারিল, এ ছবিটা আর ঘর থেকে যেতে দিয়ে কাজ নেই সরোজবাবু, কাজ নেই বেচে।—এটুকুও যে কি রকম করিয়া মুখ দিয়া বাহির হইল, সে নিজেই বুঝিতে পারিল না।

প্রথমটা সরোজ যেন একটু বিস্মিত হইয়া গেল; তাহার পর একেবারে হো-হো করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া বলিয়া উঠিল, ওঃ, বুঝেছি; সত্যিই ছবিটা দেখতে তেমন নয়, কাঁচা হাতের আঁকা কিনা; তুমি ভাবছ, বাজারে বদনাম হয়ে পড়বে। এক হিসেবে ঠিক ধরেছ বটে; তবে রিটাচ ক'রে-ট'রে অনেকটা সামলে আনব।

বেলা শিল্পীর মুখের দিকে চাহিয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আর একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

দুই দিন পরে আবার যখন আসিল, দেখিল, ছবিটি নাই। সে কোন প্রশ্ন করিল না, শুধু সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় ব্যাকুলভাবে চাহিতে লাগিল, মন যেন জানিয়াও নিদারুণ সত্যটা বিশ্বাস করিতে চাহে না। সরোজ হাসিয়া বলিল, নিয়ে গেছে সেটা, সে তাগাদা যদি দেখতে। তুমি একটু ব'স।—বলিয়া বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল।

বেলার বক্ষে একটা রূঢ় আঘাত লাগিল। তাহার মনে হইল, তাহার যৌবন-আরম্ভের সেই সামান্য প্রতিমূর্ত্তিটার একটা মূক ভাষা ছিল। সেটা যে সরোজের এই ঘরটিতে টাঙানো ছিল এবং সরোজকে যে মাঝে মাঝে দেখিতে হইত, এসবের ভিতর তাহার জীবনের অনেকটা সাফল্য ছিল। এ কথাটি পূর্ব্বে কখনও এমন করিয়া মনে উদয় হয় নাই এবং আজও ইহার সম্যক অর্থ ধরা গেল না; কেবল মনে অকারণ একটা করুণ সুর ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল,—বেলা যেন আজ চলিয়া গিয়াছে; সরোজ তাহার অন্তরের নিবেদন, তাহার কৈশোরের প্রথম নিবেদন, তাহার নারী-হৃদয়ের চিরন্তন নিবেদন গ্রাহ্য করে নাই, তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছে। অর্থই এই লুব্ধ শিল্পীকে অন্ধ ও বধির করিয়া তুলিয়াছে। কথাটা ফেনাইয়া ফেনাইয়া এই রকম ভাবেই মনে জমিয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু এ আবার কবেকার কোন্ বেলা ছিল, আর কিসের জোর তাহার এই শিল্পীর উপর, যাহা অর্থের উপরও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চায়? মন এ কথারও উত্তর দিতে পারে না।

সরোজ হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিল, হাতে একমুঠা টাকা, ছবির দামের একটা মোটা অংশ; বেলাকে দিবে। অপ্রত্যাশিত সফলতায় মনটা উদার করিয়া দিয়াছিল, এ তাহারই একটা নিদর্শন।

বেশ দামে বিকোল ছবিটা, রাখ এ টাকাগুলো।—বলিয়া তাহার সঙ্কুচিত দক্ষিণ অঞ্জলি খুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিল।

বেলা অঞ্জলি খুলিল না। নির্ব্বাকভাবে খানিকক্ষণ সরোজের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর কহিল, না না, আমায় মাফ করুন সরোজবাবু, এ টাকা আমায় স্পর্শ করতে বলবেন না। তখন আমার এত হাবভাব ছলা-কৌশল শেখা হয় নি, আমার ও ছবিতে কোন কৃতিত্ব ছিল না। না, আপনার পায়ে ধরি, টাকা দিয়ে আর আমার জীবনের সমস্তটাই ভরিয়ে নিরেট ক'রে দেবেন না—

তাহার পর কথাগুলো একেবারেই অস্পষ্ট হইয়া গেল এবং চক্ষের কূল ছাপাইয়া অঝোর ধারায় অশ্রু নামিল।

জীবনে এ এই প্রথম।

৩

চিত্রকর একদিন শুনিল, বেলা থিয়েটারে অভিনেত্রীর পদে ইস্তফা দিয়া দিয়াছে। ব্যাপারটা খুবই সাধারণ, আকছারই হইয়া আসিতেছে। সে আর ইহাতে বিস্ময় মানিল না। সাধারণত ইহার যে গোটাকতক ধরা-বাঁধা কারণ আছে, তাহাই দিয়া সমস্যাটুকু পূরণ করিয়া লইল, অর্থাৎ ভাবিল, অন্যত্র টাকা পাইয়াছে বেশি, কাজেই পূর্ব্বের দল ছাড়িয়া দিয়াছে, কিংবা নাম বাহির হইয়াছে, সুতরাং মূল্য বাড়াইবার এ একটা ফন্দি, অথবা এই রকম গোছের একটা কিছু হইবে। কিন্তু তাহার একটু ধাঁধা লাগিল, যখন প্রশ্ন করায় বেলা ছোট্ট করিয়া জবাব দিল, এমনিই ছেড়ে দিলাম। না, অন্য জায়গায় কাজ পাই নি।

সরোজ বিস্মিতভাবে মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, কিন্তু বড় লোকসান হ'ল যে?

বেলা বলিল, অত লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখি নি; ওসব আর তেমন ভাল লাগে না, তাই ছেড়ে দিলাম।—বলিয়া মুখের দিকে চাহিয়া অপ্রতিভভাবে একটু হাসিল।

সরোজ মাথাটা নীচু করিয়া একটু নিরুত্তর রহিল। কথাটা তেমন সে বুঝিতে পারিতেছিল না। সচরাচর যে কারণগুলা খাটে, তাহার কোনটা এ ক্ষেত্রে লাগে না দেখিয়া সে একটা অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিল, ভাল করলে কি? এ সময় অভিনয়গুলো তোমার বেশ স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। বাজারে বেশ—

অসহিষ্ণুভাবে বেলা বলিল, অভিনয় স্বাভাবিক করবার জন্যে নিজেকে কতটা অস্বাভাবিক ক'রে এনেছি জানেন সরোজবাবু? থাক্ সে কথা। নিন, বলুন, আজ কি করবেন আমায় নিয়ে! এখনও তো এই দাঁড়ানো-বসা-শোওয়ার অভিনয় চলবেই; না হয় কথার অভিনয়েই জবাব দিয়ে এসেছি।

মডেলের স্বরে আজকাল প্রায়ই এই রকম একটা মিশ্রণ থাকে, যাহা তাহার চিরন্তন হর্ষ-কৌতুকের নয়। সরোজ লক্ষ্য করিল, একটু ভাবিলও, তাহার সেই দিনটার কথাও মনে পড়িয়া গেল, কিন্তু বেশি ভাবিয়া অবসর নষ্ট করিল না। উঠিয়া মডেলকে বলিল, হ্যাঁ, নাও তো, আজ দাঁড়াতে হবে এই ভাবে। ব'স, আইডিয়াটা আগে তোমায় ব'লে দিই; ধর, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, সে এসেছে নদীর ঘাটে জল নিতে। সমস্ত পথটা ঘোমটা ছিল; এখানে এসে নিশ্চিন্দি হয়ে খুলতে যাবে, এমন সময় খানিকটা দূরে কোন নৌকোতেই কিংবা ডাঙাতেই কাউকে দেখে হঠাৎ

আধখানা ঘোমটা খুলে থেমে গেছে। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারছে না ব'লে ঘাড়টি বাঁকিয়ে ভ্রূ দুটি চোখের ওপর চেপে দাঁড়িয়ে আছে। দুটি পা সিঁড়ির দুটি ধাপে উঁচু নীচু হয়ে আছে, কলসীটি কাঁকাল থেকে নামিয়েছে, এখন কলসী রেখে ঘোমটাটি খুলবে কি তার আড়াল থেকে সন্দেহটা একেবারে মিটিয়েই নেবে, তা ঠিক করতে পারছে না।—আমার ছবিটা হবে ঠিক এই সময়কার, বুঝলে? কাঠের সিঁড়ি ওই তোয়ের ক'রে রেখেছি; এই কলসীটা ধর। নাও, দাঁড়াও দিকিন।

বাবা বাবা, মাথায় এতও খেলে আপনার!—বলিয়া একটু হাসিয়া বেলা কাঠের সিঁড়ির প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে পা দিয়া, সুগৌর বাম হস্তটিতে কলসী লইয়া এবং নিজের যৌবনশ্রীমণ্ডিত অপরূপ দেহখানির হিল্লোল সংযত বসনের রেখা-তরঙ্গে ফুটাইয়া বঙ্কিম ঠামে দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল, তাড়াতাড়ি সেরে নেবেন; আজ কি অপরাধে বেঞ্চির ওপর দাঁড় করানো হ'ল, জানি না।

আঁচলের ঝুল, কি কাপড়ের ভাঁজ, কি কোথাও ঘোমটার পাড়ের একটা বাঁক ঠিক করিতে করিতে চিত্রকর হাসিয়া জবাব দিল, থিয়েটারের চাকরি ছেড়ে নিজের প্রতি যে অন্যায় করেছ, তার জন্যে। তুমি আজকাল বেজায় দুষ্টু হয়ে পড়েছ বেলা!—বলিয়া একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া আঁকিতে শুরু করিয়া দিল।

একটা রেখার টানে একটু সন্দেহ হওয়ায় দেখিয়া লইবার জন্য মুখ তুলিল। দেখিল, মডেলের মুখের ভাব বদলাইয়া গিয়াছে। শুধরাইয়া দিবার জন্য বলিল, উঁহু, বদলে ফেলেছ যে! ভ্রূ আরও নামিয়ে দাও, আর চাউনিটা আর একটু আড়ে হবে, সন্দেহের ভাবটি ঠিক ফোটে নি যে!

বেলার ঠিক করিয়া লইতে দেরি হইল না। চিত্রকর আঁকিতে

লাগিল। একটু পরে চোখ তুলিয়া দেখিল, সে আবার সব মাটি করিয়া বসিয়াছে। কি যে হইয়াছে তাহার, বলা যায় না। গ্রীবার ঈষৎ ঝোঁকটিতে যে একটা আচম্বিতের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেটা আর নাই এবং তীক্ষ্ণ কৌতূহলের ভাব তিরোহিত হইয়া চোখে একটা উদাস আনমনা ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। সরোজ একটু অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল। মডেলের কাছ হইতে আজ সে মোটেই সহযোগ পাইতেছিল না; অথচ এইই পূর্ব্বে একই ভঙ্গিমায় এবং একই ভাব ফুটাইয়া একটানা প্রয়োজন-মত দাঁড়াইয়া থাকিত। সে হাসিয়া বলিল, তোমার কি হয়েছে বেলা? তোমায় দেখে বোধ হচ্ছে, বেচারা ঘাটে এসে এমন কাউকে দেখেছে, যাকে দেখে একেবারে মন হারিয়ে ফেলেছে, সতর্ক স্ত্রীলোকের যে ত্রস্ত অথচ সুসংযত ভাব থাকে, সেটা কই? এ যেন বেচারার সব এলোমেলো হয়ে গেছে। এ ভাবটা যদি তোমার মনে এতই আধিপত্য ক'রে থাকে, অন্য একদিন না হয় তোলা যাবে 'খন; আজকে আমার ভাবটা একেবারে নষ্ট করছ যে!—বলিয়া সরল-ভাবে হাসিতে লাগিল। বেলা নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। শুধরাইবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু সরোজ ক্রমাগতই অপছন্দসূচক ঘাড় নাড়িতে লাগিল। তখন আর সে পারিল না, নামিয়া আসিয়া একটা সোফায় লজ্জিতভাবে বসিয়া পড়িল, কহিল, না সরোজবাবু, আজ কেমন হয়ে উঠছে না।

সরোজ পেন্সিলটা রাখিয়া দিল। তাহার পানে চাহিয়া বলিল, থাক্ তবে এখন; কিন্তু এ আবার কি হ'ল?

হবার তো কিছু দেখি না; বোধ হয় কদিন থেকে শরীরটা তেমন—মরুকগে, আবার কবে হাজরি দিতে হবে বলুন।—বলিতে বলিতে দুয়ারের নিকট চলিয়া গেল।

সরোজ উত্তর করিল, খবর দোব 'খন।

বেশ।—বলিয়া বেলা বাহির হইয়া গেল।

চিত্রকর একটু অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করিয়া নিজের মনেই বলিল, হুঁ। তাহার সেদিনকার ঘটনাও মনে পড়িল; কিন্তু আর সময় নষ্ট না করিয়া অন্য একটা ছবিতে রঙ ফলাইতে বসিয়া গেল।

এই রকমই হইতে লাগিল। দুই মাস গেল, চার মাস গেল, একখানা আর ভাল ছবি শেষ করা হয় না। ছিন্নতন্ত্রীর বীণার সুরের মত সবগুলাই অসময়ে গতিহীন হইয়া পড়ে, আর কিছুই করা যায় না। শিল্পী নিজের খেয়াল ছাড়িয়া দিয়া মডেল যে ভাবে আবিষ্ট থাকে, তাহাই তাহার চিত্র-ফলকে মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু বৃথা, নির্ব্বোধ ঔদাসীন্যের সময় তাহার কোথা হইতে যে সঙ্কোচ আসিয়া পড়ে এবং গভীর সঙ্কোচের মাঝে কখন যে মনটা মুক্তপক্ষ হইয়া দূর দিগন্তে বিলীন হইয়া যায়, কিছু বলা যায় না। চিত্রকর তুলিকা ছাড়িয়া দেয় এবং অপ্রকাশের ব্যথা লইয়া হতাশভাবে বসিয়া থাকে।

সন্তপ্ত চিত্তে বেলা প্রতিদিনই অনুরোধ করে, আমায় ছেড়ে দিন; আমি কোনমতেই পেরে উঠছি না, হাজার চেষ্টা ক'রেও না। আমি নিজেই অন্য কাউকে না হয় ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

শিল্পী বলে, সে না হয় হ'ল; কিন্তু কি হয়েছে তোমার বল দিকি?

তবুও ছাড়ে না। ভাবে, ইহাকে লইয়াই তাহার এত প্রতিষ্ঠা; মানসিক চাঞ্চল্যের সময়ই এটা; দুই দিন পরে কাটিয়া গেলে আবার ঠিক হইয়া যাইবে। চাই কি ইহার মধ্য দিয়াই এই তরুণীর একটা নূতন রূপ ফুটিতে পারে, সেটা তাহার চিত্ররচনায় একটা অভিনব সম্পদ হইয়া দাঁড়াইবে। এই রকম গোছের একটা আশাও ছিল, তা ছাড়া এই ঘরের প্রত্যেক জায়গাটির সহিত, তাহার নিজের আঁকা প্রত্যেক ছবিটির

সহিত বেলার স্মৃতি একান্তভাবে জড়িত। তাহার সৌন্দর্য্যসৃষ্টির ইতিহাসে যে এতটা স্থান জুড়িয়া আছে, তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিবার কথা কি ভাবিতে পারা যায়?

তাহা না যাক; কিন্তু বেলার তরফ হইতে ছুটির তাগাদা বড় জোর হইয়া পড়িল। তাহার মনের যে বেদনা, সেটা বেশিদিন কিছু তাহার কাছে রহস্যাবৃত রহিল না। তখন সে মনে মনে শিল্পীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমার দেহ অর্থাৎ দেহের ললিত ভঙ্গিমা লইয়াই তো তোমার কারবার? সে দিকটা যখন আমার চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, তখন আর কেন? আমাকে বিদায় দাও। নিজের হাতে বাঁধন ছিঁড়িয়া যাইব, সে শক্তি আমার রাখ নাই; তাই ভিক্ষা—তুমি নিজের মুখেই বিদায় দাও; এইটিই তোমার মহাদান বলিয়া মনে রাখিব।

এই রকম আরও সব কথা, যার একটাও স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারে না।

মুখ ফুটিয়া বলে শুধু, আর পারি না সরোজবাবু, আমায় ছেড়ে দিন, আমায় মুক্তি দিন।

তাহার পর দুইটি মর্ম্মাহত প্রাণীর ক্লিষ্ট নীরবতায় ঘরের হাওয়াটা থমথম করিতে থাকে।

একদিন নিতান্ত আড়ম্বরহীন বেশে অসময়ে স্টুডিওতে প্রবেশ করিয়া বেলা একটা সোফায় বসিয়া পড়িল, অশ্রুনিরুদ্ধ ভারী আওয়াজে বলিল, আজ বিদায় নিতে এলাম।

সরোজ অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া তুলি লইয়া নিতান্ত নিবিষ্ট মনে কি একটা আঁকিতেছিল একেবারে তন্ময় হইয়া। মুখ না ফিরাইয়া, তুলির একটা দীর্ঘ টান দিতে দিতে অন্যমনস্কভাবেই বলিল, নিতা—ন্তই

বিদা—য়। তা বেশ।—বলিয়া আঁকিয়া চলিল। কাজটুকু শেষ হইবার পূর্ব্বেই কিন্তু তাহার চমক ভাঙিল, সন্ত্রস্তভাবে কি একটা বলিবার জন্য ফিরিয়া দেখিল, বেলা নাই।

একটা বিষম আঘাত লাগিল, এবং সেই সংযত শিল্পীর মনের দুর্গে এতদিনে এই আঘাতটি একটা বিদারণ-চিহ্ন অঙ্কিত করিল। হঠাৎ মনে *হইল, বোধ হয় এইমাত্র উঠিয়া গিয়াছে, ফিরাইয়া আনি; এ ভাবে বিদায় দেওয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরতা।* কিন্তু নিম্নতল পর্য্যন্ত নামিয়া রাস্তায় গিয়াও দেখিল, সে নাই। সে ফিরিয়া আসিয়া সোফাটায় হেলিয়া পড়িল এবং অনুভব করিল, তাহার অস্তিত্বের কোন্‌খানটায় হঠাৎ খানিকটা যেন বেজায় শূন্যময় হালকা ঠেকিতেছে।

তাহার আর সেদিন আঁকা হইল না। এতদিন কাজের সময়টাকে সে নিতান্ত সমাদরের চোখে দেখিত। আজ কিন্তু তাহার মনে হইল, যেন সময়ের এবং সেই সময়টাকে পূর্ণ করিবার জন্য যে কর্ম্ম, জীবনে তাহার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই।

কেন এমন হইল, ভাবিতে গিয়া চিত্রীর ভ্রূতে সংশয়ের কুঞ্চন ফুটিয়া উঠিল, এমন কি চক্ষু দুইটাও দুই বিন্দু অশ্রুর আলোকে ঝলমল করিয়া উঠিল; এবং অনেকক্ষণ পরে যখন সে উঠিল, তখন একটা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে জানাইয়া দিল যে, ভিতরে তাহার একটা জায়গা উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

৪

বেলা বিদায় লইল। ভাবিল, অভিমানের একটা প্রচণ্ড আঘাত দিয়া সে ইহকালের জন্য সুদূর হইয়া পড়িবে। এই শহর, এই দেশ, এমন কি শেষে এই পৃথিবী হইতেও এত আলাদা হইবে যে, কখনও যদি

অনুতপ্ত শিল্পী প্রয়োজন বোধ করে, তাহা হইলে তাহাকে আর খুঁজিয়া পাইবে না। তখন যে একটা বেশ প্রতিশোধ লওয়া হইবে, সে চিন্তা তাহাকে বড় তৃপ্তি দিল, যদিও সে ভাবিয়া দেখিল না, কিসের সে প্রতিশোধ, অপরাধ কোন্‌খানটায় এবং তাহার এ অভিমানের দাবিই বা উদয় হইল কোথা হইতে।

সুদূর এবং অলভ্য হইতে চাহিল বটে, কিন্তু তাহাও আবার সহজ হইল না। বহুদিনের বাড়িটা ত্যাগ করিল; কিন্তু শহর না ছাড়িয়া সরোজের বাড়ির আরও নিকটে একটা বাসায় আসিয়া উঠিল এবং তাহাতে নিজের প্রতি বিরক্ত হইল। একটা বড রকম সক্ষমতায় এই ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতাকে চাপা দিবার জন্য সে একেবারে দেশ ছাড়িবার জন্যই আয়োজন জুড়িয়া দিল।

কিন্তু তাহাও আর শেষ হইয়া উঠে না। কিছুই গুছাইবার নাই। বিলাস-সম্পর্কিত আলয় ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর দৈন্যে শূন্য হইয়া গিয়াছে; শৌখিন পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, আসবাব বিশেষ কিছুই আর নাই; কিন্তু তবু তাহার আর গোছানো হইয়া উঠে না। তাহার প্রবল উৎসাহ সমস্ত ব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎ নিবিয়া যায়; সজল নয়নে বেলা নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকে। জোয়ারের জল যেমন ভিতর হইতে ফুলিয়া সাগরের প্রান্ত চাপিয়া ধরে, একটা নিদারুণ অভিমান তেমনই করিয়া তাহার মনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠে; এবং সেই আত্মনিরুদ্ধ অভিমান কাহারও উপর উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতে পায় না বলিয়া অসহ্য বেদনায় বক্ষের শিরা-উপশিরাগুলি চাপিয়া ধরে।

শহর দেশ কিছুই ছাড়া হইল না, সুদীর্ঘ একটা বৎসর এই দূরত্বহীন কঠোর অজ্ঞাতবাসে কাটিয়া গেল; এবং সকলের অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার এই হইল যে, তরুণী একদিন হঠাৎ শিল্পীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত

হইল। তাহার মনে কি যে তর্ক উঠিল, যাহার এই অদ্ভুত মীমাংসা, তাহা বলা যায় না; তবে এই পর্য্যন্ত দেখা গেল, বেলা এক গ্রীষ্মাবসানের মধ্যাহ্নে দর্পণের সামনে বসিয়া সুচারুরূপে কেশ বাঁধিল, মণিবন্ধে সোনার চুড়ি এবং বাহুতে বহুদিনের অনাদৃত অনন্ত পরিল, একটা খয়ের রঙের বেনারসী শাড়িতে তাহার তরুণ যৌবনখানি মুড়িয়া কটিতে চন্দ্রহার দুলাইয়া দিল এবং রক্তাধরে তাহার সকলের চেয়ে মদির হাস্যটি ফুটাইয়া গাড়িতে উঠিল। যাইবার সময় হুকুম রাখিয়া গেল, আজ সব যেন প্রস্তুত থাকে, এখানে আজ শেষ দিন।

দাসী জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যেতে হবে?

দর্পণের সামনে তোলা হাসিটিকে বেলা নষ্ট হইতে দিল না; তেমনই ভাবে বলিল, জাহান্নমে, কারণ আমার দুনিয়ায় মাত্র দুটি বিভাগ আছে—এক—এই স্বর্গ, দ্বিতীয়—জাহান্নম।

দাসদাসীরা পরস্পরের সহিত দৃষ্টিবিনিময় করিল, অর্থাৎ শুভ লক্ষণ; কর্ত্রীর মুখে অভিনয়ের বুলি দেখা দিয়াছে; বোধ হয় এবার দিন ফিরিবে।

এক বৎসর পরে বেলা আবার সেই ঘরটিতে প্রবেশ করিল। শিল্পী তখন ছিল না। বেলা পুরাতন অভ্যাসমত সোফাটায় গিয়া বসিল; কিন্তু বসিবার আগে সেটাকে একবার ভাল করিয়া ঝাড়িয়া লইতে হইল, কেন না চিরন্তন প্রথানুযায়ী যেরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত, সেটা সেরূপ ছিল না। শুধু তাহাই নয়, বেলা লক্ষ্য করিল, ঘরটার আর সর্ব্বত্রও একটা করুণ শ্রীহীনতা ছাইয়া রহিয়াছে। সামনের বদ্ধ জানালার খড়খড়িতে ধূলা জমিয়াছে এবং তাহার উপর কয়েকটা মাকড়সা সূক্ষ্ম জালের পর্দ্দা বুনিয়া নিরুপদ্রবে বসবাস করিতেছে। বুঝিতে পারিল, অনেকদিন ওই জানালা খোলা হয় নাই। দেওয়ালে ঠেস দেওয়া

ছবিগুলায়ও ধূলা, এমন কি ঘরের মেঝেয়ও অনেকদিন ঝাঁট পড়ে নাই, এবং বেশি যে কেহ ঘরটাতে প্রবেশ করে না, তাহাও স্পষ্ট বোঝা গেল।

সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠান গৃহটির এই আতুর ভাবটি বেলার মনের এক জায়গায় বেদনা জাগাইল বটে, কারণ সে ইহাতে অভ্যস্ত ছিল না; কিন্তু সেই বেদনার পাশে একটা সুখের আভাস যে না ফুটিল, এমন নয়; কারণ অন্তরের অন্তরে সে বুঝিতে পারিল, এ তাহারই অভাবে।

বেলা অন্যমনস্কভাবে উঠিল এবং জানালাটি খুলিয়া দিয়া একে একে ছবিগুলা ঝাড়িতে লাগিল।

সবগুলিই প্রায় তাহারই দেহপ্রাণের সহিত জড়িত, তাহারই সৌন্দর্য্যের মূক সাক্ষী। আজ কি একটা ভাবিয়া বেলা অনেকদিন পরে নিজের হতাদর যৌবনশ্রীর পানে চাহিয়াছে, সুতরাং একান্ত নূতন-ভাবে সে তাহারই এই আলেখ্যগুলাকে আজ ভালবাসিল। এক-একটাকে সে দুরন্ত আবেগভরে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। এই স্ফুট-চেতনা, ব্যথিতা, নিঃসঙ্গা নারীর মনে হইল, তাহার রক্তমাংসের প্রতিরূপ এই চিত্রগুলায় তাহার মর্ম্মের হাহাকারও বোধ হয় সঞ্চারিত হইয়া থাকিবে, বক্ষের কাছে চাপিয়া ধরিলে সমবেদনাময়ী সখীর মত ইহাদেরও বুঝানো যাইবে, তাহার বেদনা কিসে এবং কতই না গভীর!

হঠাৎ একটি ছবির উপর তাহার চোখ পড়িয়া নিস্পন্দ হইয়া রহিল। পুরাতন ছবি, যে মালিক, সে বোধ হয় সংস্কারের জন্য রাখিয়া গিয়াছে। এক লতাকুঞ্জের দ্বারে হেলান দিয়া একটি নারী দাঁড়াইয়া আছে, দৃষ্টি তাহার বহুদূরে নিবদ্ধ, যেখানে বিতানের সঙ্কীর্ণ পথ অস্পষ্ট হইয়া চক্রবাল-রেখায় মিলাইয়া গিয়াছে। বসন্ত বহিয়া গিয়াছে। রিক্ত কুঞ্জ, সুখের ক্ষীয়মান স্মৃতির মত দুই-একটা ফুল এখানে ওখানে ধরিয়া রাখিয়াছে; নিদাঘের উষ্ণ নিশ্বাসে সেগুলাও তেমন ভাল করিয়া ফুটিতে পায় নাই,

কেমন যেন মুছিয়া গিয়াছে। এই ম্রিয়মাণ সৌন্দর্য্যের সহিত একই ছন্দে *মিলানো সেই রমণীমূর্ত্তি। তাহার পূর্ণায়ত চক্ষে বেদনার গাঢ় ছায়া,* আবেগের উগ্র শিখা আর আশার সৌম্য জ্যোতি কেমন করিয়া মিলিয়া গিয়া এক অতল রহস্যের সৃষ্টি করিয়াছে। নীচে লেখা আছে, "প্রতীক্ষা"। প্রতি রেখা, বর্ণের প্রতি অনুপরমাণু হইতে একটা ব্যাকুল ভাষা যেন মৌনতা ভাঙিয়া আসিতে চায়, ওগো নিষ্ঠুর, কেন 'আসি' বলিয়া এখনও আসিলে না? আর কতদিন এ বিফল পথ-চাওয়া? হে অবিচারী, তোমারই জন্য সজ্জিত এ কুঞ্জশোভা লুব্ধ কাল তিল তিল করিয়া হরণ করিয়া লয় যে! হে নিষ্ঠুর, কি সে তোমার কঠোর বৈরাগ্য, যাহা এই মর্ম্মন্তুদ কাহিনীর কাছেও এত অটল? কুঞ্জের বসন্ত কাঁদিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, আর হে দেবতা, এই যৌবন-পুষ্পপাত্রের সব ফুল যে শুষ্কপ্রায়! তবুও এস, এ জীবনে এই বিপুল ব্যর্থতার অর্ঘ্য দিয়াই তোমার পূজা সাঙ্গ হইবে। তোমার হৃদয়হীন পাষাণ-মূর্ত্তিতে এই চির-প্রতীক্ষমানা ভক্তই অন্তরের নিবিড় বেদনা দিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। তুমি শুধু সকল নিরাশার মধ্যে একটি মাত্র আশা সফল করিও; তোমার বাণী চাহি না, তোমার স্পর্শ চাহি না, শুধু একটি মুহূর্ত্ত-যুগব্যাপী প্রসন্ন দৃষ্টিতে এই ব্যর্থ জীবনে একটি স্মৃতিমাত্রের সম্বল দিয়া, এই ক্ষুদ্র অপ্রয়োজনের নিকট হইতে সংসারের নির্ম্মম প্রয়োজনে ফিরিয়া যাইও।

কিন্তু কে শোনে অন্তস্তলের এই গভীর ক্রন্দন?

তীব্র অভিমানে বেলার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সেই কঠিন গৃহপ্রাচীরের গায়ে বাম হস্তের আবেষ্টনীর মধ্যে বদ্ধকবরী মস্তকটি রাখিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সোনার কাজ করা ভারী আঁচলখানি সোনার দেহ হইতে বস্ত্রাবরণ খসাইয়া দিয়া ভূমে লুটাইতে লাগিল, এবং স্থানভ্রষ্ট কটিহারটা গতাশ্রয়া ক্ষুদ্র লতিকার মত ক্ষীণ কটির

একটা লঘু বাঁকের অবলম্বন ধরিয়া অধোদেশ ঘেরিয়া দুলিতে লাগিল। *দেহটি দুই-তিন স্থানে নুইয়া গিয়াছে—যেন অন্তরের অভিমান-ভরেই।*

এই অনাদৃতা যুবতী আজ নিজেই উন্মুখ হইয়া আসিয়াছিল বটে; কিন্তু স্থির করিল, না, আর কথা কহিবে না, হাজার সাধিলেও না। শিল্পীর একটা অনুতপ্ত কাল্পনিক মূর্ত্তিকে নিজের পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া সে অভিমানে মুখ ফিরাইয়া রহিল। এমন সময় সরোজ তাহার সত্য-মূর্ত্তিতেই ঘরে প্রবেশ করিল এবং অসংযতভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল, বেলা!

কোন উত্তর হইল না। শুধু সেই দেহবল্লরী ঈষৎ স্পন্দিত হইয়া আবার নিশ্চল হইয়া গেল।

সরোজ একটু দাঁড়াইল; তাহার পর ধীরে ধীরে কাছে গিয়া বেদনার স্বরে বলিল, বিদায় কি ওই ভাবেই নেয় বেলা?—ইচ্ছা হইল, অন্তত কাঁধের উপর একটা হাত দিয়া কথাটা বলে; কিন্তু কি ভাবিয়া তাহা করিল না।

মনে হইল, যেন রুদ্ধ অভিমানের ঢেউ ভিতর হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া এই তন্বীর দেহটিকে ভাঙিয়া খানখান করিয়া দিবে। বেলা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে; কোন কথা বলিল না, কিংবা ফিরিয়াও চাহিল না।

সরোজ নির্ব্বাকভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। এই বিক্ষুব্ধা সুন্দরীর পাশে দাঁড়াইয়া সৌন্দর্য্য-উপাসক পুরুষের মনে কি হইতেছিল, কে বুঝিবে? সে একটাও সান্ত্বনার কথা বলিতে পারিল না। তাহার স্থির ঈষৎ-সিক্ত চক্ষে হৃদয়ের মধ্যকার একটা তুমুল দ্বন্দ্বের আভাস ফুটিয়া উঠিতেছিল। ক্রমে এই সংযমী যুবার বাহুদ্বয় অবশভাবে আলিঙ্গনের আকারে সেই ক্রন্দমানা রমণীর দেহ ঘিরিয়া ফেলিল; কিন্তু স্পর্শ হইবার পূর্ব্বেই তাহার চমক ভাঙিয়া গেল।

তখন এই মনুষ্যটির মধ্যে ব্যথিতের পরিবর্ত্তে চিত্রীই প্রধান হইয়া পড়িল। সে ভাবিল, অনুশোচনার কথা, সান্ত্বনার কথা বলিবার ঢের সময় পাওয়া যাইবে, কিন্তু সাক্ষাৎ অভিমানেব মূর্ত্তি ধরিয়া এই যে একটি নবীনা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া—এ সুবিধাটুকু ছাড়িয়া দিলে আর তাহার আপসোস রাখিবার কি ঠাঁই থাকিবে? বেলা তো ফিরিয়াই আসিয়াছে, তাহার সাময়িক চাঞ্চল্য কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই সুদীর্ঘ বর্ষকাল পরে নিতান্ত অজ্ঞাতসারে সে যে একটিমাত্র নিখুঁত ভাবের ভঙ্গিমা তাহার সামনে ধরিয়াছে, যাহার মধ্যে এতটুকুও কৃত্রিমতার খাদ নাই—সেটিকে যদি বিচলিত করিয়া নষ্ট করে তো সে ভুল কি আর সারা জন্মে মিটাইতে পারিবে? তাহার চিত্তে যে দরদ উঠে নাই এমন নয়, তবে সে দরদ তাহার গভীর সৌন্দর্য্যানুভূতিকে লুপ্ত করিতে পারিল না। সে এই অভিমানিনীর শোকবিদীর্ণ অভ্যন্তর হইতে চক্ষু সরাইয়া বাহিরে ন্যস্ত করিল, মুগ্ধ নেত্রে দেখিতে লাগিল, অবশ অঙ্গের প্রতি রেখায় রেখায় এবং স্রস্ত বসনের পরতে পরতে কি পূর্ণভাবেই না সেই শোক ফুটিয়া উঠিয়াছে!

তাই, এই সমব্যথার পিয়াসী নারীর হৃদয়ে যখন রুদ্ধ বিক্ষোভের ঝড় তাহার প্রতি শিরা-উপশিরা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেছিল, সেই সময় চোরের মত অতি সন্তর্পণে, সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার হইতে কিছু সঞ্চয়ের জন্য সেই যশস্বী শিল্পী তুলিকা লইয়া বসিয়া গেল। সে ভাবিল, বেলা তো ফিরিয়াই আসিয়াছে, তাহার দুই দিনের চাঞ্চল্য কাটিয়া গিয়াছে, সৌন্দর্য্যের সাগরে মুহূর্ত্তের জন্য এই যে হিল্লোলটি উঠিয়াছে, ইহাকে তো আর ধরিয়া রাখা যাইবে না।
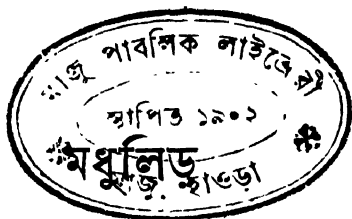
১ দাগ দিবেন না।

আমার নূতন প্রতিবেশী গৌরীকান্তবাবু নেহাত সাদামাটা চালের লোক। বিকালের দিকে নির্দ্দিষ্ট নিমতলাটিতে রোজ আমাদের একবার করিয়া দেখা হয়, আমি সে সময় খেলিতে বাহির হই, আর তিনি ফেরেন আপিস হইতে। সেই রেলির বাঁশের বাঁটের ভারী ছাতা, উপরে আবার সাদা কাপড় বসানো, রেলির মোটা জিনের চীনে কোট, জিনের প্যাণ্ট, দুইটিতে স্থূল উদরের মাঝামাঝি হইতে গোল হইয়া বুকের আর পায়ের দিকে যে যাহার ঘুরিয়া গিয়াছে, পায়ে চীনাবাড়ির জুতা, ফিতা-টিতার হাঙ্গামা নাই।

মনটিও এই রকম নির্ঝঞ্ঝাট। দেখা হইলেই মুখে এবং সমস্ত শরীরটিতে হাসির তরঙ্গ তুলিয়া বলেন, এই যে, টেনিসে চলেছেন! বেশ বেশ, মন্দ নয়, তবে হ্যাপা অনেক, গোড়ালি-চাঁছা জুতো রে, ব্যাট রে, তার রবাটের জামা রে, ওর চেয়ে একটা বউ পোষা ঢের সহজ। আরও জোরে হাসি উঠে।

তাহার পর প্রায়ই আপিসের কোন একটি গল্প উঠে, খুব আড়ম্বরের সহিত আরম্ভ করিয়া মাঝপথে হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া বলেন, আমি ওসব সাতেও নেই, পাঁচেও নেই রে দাদা, খাই-দাই গাজন গাই; বলি অ্যাকাউণ্টের দপ্তর হাতে তুলে নিয়েছি, সেখানে যেদিন কোন গলদ দেখবে, ব'লো। যান, আপনার আবার খানিকটা দেরি হয়ে গেল। একদিন আসুন না গরিবের বাসায়, ইয়ে বাবু—কি যে দিব্যি নামটি, আবার ভুলে গেলাম।

তাঁহার বিশ্লেষণের ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া হয়তো নামটা মনে করাইয়া দিলাম, গোবর্দ্ধন।

ঠিক ঠিক, গোবর্দ্ধনবাবু, গোবর্-ধনবাবু; এত লোক আর এত নাম হয়ে পড়েছে যে, আর হিসেব রাখা যায় না। এই এতটুকু শহরটার কথাই ধরা যাক না, কটা ক'রেই বা নাম মিটুচ্ছে বছরে? অথচ কোন্ না শ খানেক ক'রে বাড়ছে ফি বছরে! দশ বছরের সেন্সস মিলিয়ে দেখুন না। সেদিন পিওন ব্যাটা দাঁত বের ক'রে এসে হাজির, ছুটি চাই। কি রে, ব্যাপারখানা কি? ব্যাপার, পনরো দিন হ'ল তার একটি ছেলে হয়েছে, তারই নামকরণ। নিন, এই আর একটি বাড়ল।

অযথা একটা নামের বোঝা ঘাড়ে করিয়া পৃথিবীতে ভিড় জমাইয়া লোককে কি অসুবিধাতেই ফেলিয়াছি, জানিতে পারিয়া অপরাধীর মত মাথা নীচু করিয়া নিরুত্তর থাকি।

কোন দিন হয়তো বা কথাটা পারিবারিক প্রসঙ্গে আসিয়া ঠেকিল; গৌরীকান্তবাবু হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, পুরুষে অত হাঙ্গাম ক'রে বিয়ে করে কেন মশাই?

এক কথায় এতবড় সমস্যার কি সদুত্তর হইতে পারে ভাবিতেছি, গৌরীকান্তবাবু নিজেই বলিলেন, একটু জুতসই ক'রে আহার করতে পাবে, এই তো, না, আরও কিছু?

স্বস্তির সহিত বলিলাম, কই, আর কোন উদ্দেশ্য তো চোখে পড়ে না।

ওঁরা কিন্তু মনে করেন, স্বামীর শখের জ্যান্ত আসবাব ঘরে উঠলাম; বিশেষ ক'রে যদি আবার লেখাপড়ার বালাই থাকে।

আমার মুখের দিকে একটু চাহিয়া রহিলেন; সপক্ষে কি বিপক্ষে কোন রকম উত্তর না পাইয়া বলিলেন, তবে গোড়া থেকে আপনাকে বলতে হয়। এ পক্ষের ইনি আসবার অনেকদিন পর্য্যন্ত আশায় আশায়

কেটে গেল ; কিন্তু রান্না খোলে না। তারপর টের পাওয়া গেল, কলেজ মাড়িয়ে এসেছেন। আমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসলাম রে দাদা। ক্রমে সব একে একে দেখা দিতে লাগলেন—শরৎ চাটুজ্জে, ডি. এল. রায়, রবিবাবু, কস্মিন কালে যাঁদের সব নামও শুনি নি, একে একে সব ট্রাঙ্ক থেকে বেরুতে লাগলেন। তখন বুঝলাম ব্যাপারটা, রান্নার হাত দিন দিন এমন হচ্ছে কেন, কোথায় দিন দিন পাকবে, না—। তা শাজাহান তেল-মসলার খবর দেবে কেন ইয়েবাবু? তখন থেকে তক্কে তক্কে রইলাম ; যিনি বেরুচ্ছেন তাঁকে আর ঢুকতে হচ্ছে না, বাড়ির ত্রিসীমানার বার ক'রে এসে ট্রাঙ্ক হালকা করতে লাগলাম। বেশিদিন আর লুকোনো রইল না কথাটা। দিন কতক রাগ, তম্বি, বাপের বাড়ি, অনেক রকম চলল, কুরুক্ষেত্র কাণ্ড আর কি! কলকাতার মেয়ে, তায় নতুন রক্তের তেজ ; আমি কিন্তু কড়া ক'রে রাশ টেনে রাখলাম। ক্রমে রসটি ম'রে এসেছে ; বলতে নেই, হেঁসেলেরও শ্রী ফিরেছে, আমিও নিশ্চিন্দি হয়ে হাত পা গুটিয়ে, আপনারা যাকে বলেন, পবিত্র দাম্পত্য-জীবন, তাই একটু ভোগ করব করব করছি, এমন সময়—। কি? বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে, না? আচ্ছা, থাক্ তা হ'লে ; একদিন বলব 'খন সব কথা, একখানি আস্ত মহাভারত রে দাদা, বলেন কেন!

সেদিন একটা কাজের হিড়িকে পড়িয়া প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল বলিয়া আর বাহির হইলাম না। বাড়ির সামনে খোলা উঠানটিতে একটা আরাম-কেদারা বিছাইয়া পড়িয়া রহিলাম।

পাশে একটি বাগান করিয়াছি। এতটুকু এক ফালি জায়গা,

আমাদের তিনজনের শখে শখে একেবারে নিরবচ্ছিন্নভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, বাড়ির একটি মাত্র মেয়ে যেমন অনেকের স্নেহের নিদর্শনে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। আমার গোলাপ আছে, ম্যাগ্নোলিয়া আছে, বারো-মেসে ডালিয়া আছে, একটা কেয়ার ঝাড় আছে; ওর আছে মল্লিকা, যূথী, মালতী, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, আরও কত কি; আর এরই মধ্যে মার গাম্ভীর্য্য আর সৌম্যতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে মার শখের সজনেগাছ, বকফুলের গাছ, করঞ্চাগাছ, এবং কুমড়া, লাউ, ঝিঙা, উচ্ছে শত শত হস্তে ফলের ভার তুলিয়া ধরিয়া।

বোধ হয় একটু পরিচ্ছন্নতার অভাব আছে। তা থাক্; ওখানে কিন্তু আমরা—মাতা, পুত্র, বধূ তিনজনে সংসারের বাহিরে, এক প্রচুর মুক্তির মাঝে আর এক ভাবে মিলিয়া গিয়াছি।

গরমের এই সময়টা সব ফুল ফোটে। একটু বাতাস ছিল, যেন ফুলের গন্ধের নেশা ধরিয়াছে—ভারী, অলস, আর একটু দিক্‌ভ্রান্ত। সন্ধ্যা গাঢ় হইতে আকাশে চাঁদটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল; বোধ হয় পূর্ণিমা কি ওই গোছের একটা তিথি হইবে।

বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম পৃথিবীটার কথা। একে বুঝিয়া উঠা গেল না; এই সৌন্দর্য্যও আছে, আবার ওই গৌরীকান্তও আছে। কলেজে-পড়া বিড়ম্বিত জীবটির কথা মনে পড়িল, তাহার পর বোধ হয় এই কথাটাই মনে হইল যে, আমরা নারীকে ঠিকমত পাইতে জানি না। অল্প-বিস্তরভাবে সব পুরুষই গৌরীকান্ত। সুযোগ আসে, অবসর আসে রচিত মাল্য হাতে লইয়া; আমরা বুঝিতেই পারি না—কখন আসিল, কখন ফিরিয়া গেল।

চাকরটাকে বলিলাম, আর একখানা ঈজি-চেয়ার নামিয়ে দিয়ে যা তো এখানে।

চেয়ার বসাইয়া দিলে প্রশ্ন করিলাম, তোর বহুমাঈজী কি করছে রে?

উত্তর করিল, ডেকে দোব নাকি?

সংসার-সংক্রান্ত কোন কাজ নাই কিনা—হাঁ বলিতে কেমন বাধিল একটু। সে ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে কিন্তু।

একটু পরেই সামনের দুয়ারটার পর্দ্দা ঝনাৎ করিয়া এক পাশে সরিয়া গেল। নিজের চেয়ারটা সেই প্রতীক্ষ্যমান চেয়ারটার কাছে একটু টানিয়া লইতেছি, এমন সময় পিছনে পুরুষকণ্ঠে শুনিলাম, এই যে ইয়ে-বাবু, কি যে দিব্যি নামটি, আবার ভুলে গেলাম!

সত্য গোপন করিয়া লাভ নাই, একটা যেন বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল,—কোথায় গেল আলো, কোথায় হাওয়া, কোথায় গন্ধ! একখানি রাগিণীর সমস্ত সুরটিকে বিকৃত করিয়া একটা বিসম্বাদীর পর্দ্দা যেন ঝঙ্কার করিয়া উঠিল। একবার করুণ নেত্রে সেই চেয়ারটার দিকে চাহিলাম, এক মুহূর্ত্তের বিভ্রম মাত্র, তখনই আবার নিজেকে সামলাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, এই যে, আসুন আসুন।

গৌরীকান্ত বসিতে বসিতে বলিলেন, আসতেই হ'ল। আপনিও বোধ হয় আমার জন্যেই হাঁ ক'রে ব'সে আছেন, চেয়ার পর্য্যন্ত মজুত দেখছি যে। ও হতেই হবে কিনা; রোজকার দেখা-শোনায় একটু অভ্যেস হয়ে গেছে। সেই নিমতলাটিতে আজ আর দেখতে পেলাম না, মনটা বড় খারাপ হয়ে রইল। এ সময়টা আবার প্লেগ-ট্লেগ আরম্ভ হয়ে থাকে; ভাবলাম, হয়তো প্রথম আমাদের বাঙালীকেই ধরলে এবার। ওখান থেকে বাইরে হাওয়ায় ব'সে থাকতে দেখে আপনাকে প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'ল, না, যা ভেবেছি তবে তা নয়। তবুও মাঝে মাঝে বগলটা গলাটা টিপে দেখবেন মশাই, সাবধানের মার নেই।

কথাগুলো চরম গালাগালির এত কাছাকাছি যে, কি রকম একটা

অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। নিরুপায়ভাবে বসিয়া রহিলাম; গৌরীকান্ত-বাবু বেশ সরলভাবেই বলিয়া চলিলেন, সাবধানের কথায় কাল সন্ধ্যের কথা মনে প'ড়ে গেল। বেড়িয়ে এসে দেখি, খোলা ছাতে দিব্যি শেতলপাটিটিতে গিন্নী এক রকম গা আদুড় ক'রেই শুয়ে। ওপরে বেশ হাওয়া; আর চাঁদের একটা ঠাণ্ডা এফেক্ট আছে তা তো জানেনেই, কাল আবার মশাই পূর্ণিমা ছিল বোধ হয়। জানে, এই সময়টা বাড়ি ফিরি আমি, তবু জেনে শুনে এই বেয়াক্কেলেপনা। বেড়িয়ে এসে কোথায় একটু আয়েশ করব, না, দেখে তো গা জ্ব'লে গেল মশায়। একলা মানুষ—এই দোরসার সময়, দরকার কি চটাচটি ক'রে? বুঝিয়েই বললাম, ওগো, এটি হচ্ছে বেহারে প্লেগের সময়। এবারটা এখনও ভাল আছে ব'লে অতটা এলে দিও না। বড় বিষম রোগ, একবার ধরলে ত্রিসীমানার মধ্যে কেউ ঘেঁষবে না। খদ্দর তো ভালবাস বাপু, তবু ওই পাতলা শেমিজটা প'রে কেন সময় বুঝে? চুল এলো করা মশায়!—গা ধুয়ে এসে শুয়েছে আর কি, চুলে জল লেগে গেছে,—দেখলাম কিনা, চাঁদের আলোয় জায়গায় জায়গায় ঝিকমিক করছে, তাই শুকোনো হচ্ছে আর কি। খোঁচা দিতে ছাড়ব কেন ইয়েবাবু, বললাম, সূর্য্যের আলোতেই তো চুল শুকোয় জানি, চাঁদ বেচারা—। ঠিক এই পর্য্যন্ত বলেছি; সে রাগ দেখে কে! গটগট ক'রে নেমে গিয়ে রান্নাঘরে খিল দিলে, সেই গরম গুমট ঘর! কথাগুলো তো শুনলেন, রাগের কিছু পেয়েছেন? ফল, ভাত গেল গ'লে, ডাল গেল ধ'রে, তরকারি হ'ল নুনে বিষ। কি, না একটু বুঝিয়ে বলতে গিয়েছিলাম ব'লে। কিসের জন্যে তবে সংসার করা, বলুন না?

আমি বোধ হয় একটু বেশি রকম অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে-ছিলাম, গৌরীকান্তবাবুর কথাতেই আবার চমক ভাঙিল; বলিতেছেন,

আক্কেলখানা দেখে ভাবছেন তো? চুলোয় যাক; কপালের লেখন কে মেটাবে বলুন? আজ যে বেরোন নি?

একটা কথা কহিবার সুবিধা পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিলাম, সন্ধ্যের সময় বেরুতাম, কিন্তু চমৎকার জ্যোৎস্নাটির লোভ—

এতটা বলিয়া হুঁশ হইল, জ্যোৎস্নার তারিফ করিবার খুব লোক পাইয়াছি তো!

গৌরীকান্তবাবু ততক্ষণে কথাটা লুফিয়া লইয়াছেন, বলিতেছেন, হ্যাঁ, দিব্যি জ্যোৎস্নাটা। এ কথা একশো বার স্বীকার করি। তা আপনার আমার আর কি বলুন? লাভ মিউনিসিপ্যালিটির।

সপ্রশ্ন নেত্রে মুখের দিকে চাহিতে আমার মূঢ়তার জন্য সদয়ভাবে বলিলেন, সে খোঁজ বুঝি রাখেন না? রাস্তায় ল্যাম্প-পোস্টগুলোর দিকে চেয়ে দেখুন দিকি—জ্বেলেছে একটাও? স্রেফ হিসেবের খেলা। ওই যে সকালে সিঁড়ি ঘাড়ে ক'রে পোস্টে পোস্টে তেল যুগিয়ে যুগিয়ে বেড়ায়, ওদের বুঝি সোজা ভাবেন? কি তিথিজ্ঞান মশায়! আজ এই মাসের এই তিথি,—এতটা তেল লাগবে। চাঁদ উঠেছে কি আলো নিবল, মুখ-দেখাদেখি নেই। ওই যে বললাম, চাঁদ ওঠে মিউনিসিপ্যালিটির বরাতে; মারা পড়ে কবি, বিরহিণী আর চোর।

একটু গুমট ছিল খানিকক্ষণ, সেটাকে ছিন্ন করিয়া একটা দমকা হাওয়া বহিল। গৌরীকান্তবাবু হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া দ্রুত নিশ্বাস টানার সঙ্গে সঙ্গে দুই-তিন বার নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন। অনেকটা যেন নিজের মনেই বলিলেন, ফুলের গন্ধ পাচ্ছি যেন, কাছে-পিঠে বাগান-টাগান আছে নাকি?

ভয়ে একেবারে কাঁটা হইয়া রহিলাম, সাক্ষাৎ ফুলের বাগান রাখার লাঞ্ছনা মনে মনে আন্দাজ করিয়া আর কথা কহিতে সাহস হইল না।

এই সময় বাতাসের ঢেউয়ের গায়ে আর একটা ঢেউ ভাঙিয়া পড়িল, আরও বেশি গন্ধ লুটিয়া আনিয়াছে, আরও বিলাসোচ্ছল।

গৌরীকান্তবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়া বলিলেন, এ যে রজনীগন্ধার গন্ধ ইয়েবাবু, কি যে দিব্যি নামটি, ভুলে গেলাম; বাগানের শখ আছে নাকি আপনার?

৩

আমতা আমতা করিয়া বলিলাম, বাগান না ছাই; ওই পাশে এক টুকরো জমি প'ড়ে ছিল, ওরা সব কি দু-একটা ফুলের ডাল বুঝি কবে—

নিজের ঘাড়ে দায়িত্ব লইতে আর সাহস হইল না। গৌরীকান্তবাবু বলিলেন, দুটো একটা ফুলের ডালই বা এ কাটখোট্টার দেশে কে বসাবে বলুন তো? আমি তো এসে পর্য্যন্ত হা-ফুল জো-ফুল ক'রে বেড়াচ্ছি। কই, আপনি তো কখনও বলেন নি আমায়? ইঃ!

আমি তো নিজের চক্ষুকর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না; এই কি সেই গৌরীকান্তবাবু নাকি? বিস্ময়ের উগ্রতায় এমন একটা অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি, মনে হইতেছে, এখনই বুঝি দেবমূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া বলেন, বৎস, এতদিন তোমায় ছলনা করিতেছিলাম মাত্র।

সেই মানবমূর্ত্তিতেই বলিয়া যাইতেছিলেন, উঃ, কি আপসোস বলুন দেখি! আপনাদের বাড়িতে তা হ'লে দেখছি উল্টো। আপনার স্ত্রীরই শখ। আমার তো তিনি বাড়িতে ফুল দেখলে আগুন হয়ে ওঠেন। আর দুঃখের কথা বলবেন না।

আচ্ছা সমস্যা তো!

ভাবিলাম, হইতেও পারে; লোকচরিত্র বোঝা কঠিন। মনস্তত্ত্ববিৎ হইলে বোঝা যাইত, মস্তিষ্কের মধ্যে সৌন্দর্য্যজ্ঞানের কোন্ সূক্ষ্ম কোষগুলি এঁর বেশি প্রবুদ্ধ। হইতে পারে, ফুলের উপরেই নিজের প্রীতিধারা এমন নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন যে, অন্য কিছুর উপরই আর রসসিঞ্চন হয় না; বাকি সবই ফিকা ওঁর কাছে।

যাক ওসব বড় কথা। লোকটি তাহা হইলে যে একেবারেই নীরস, তাহা নয়। ইদানীং ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে ক্রমেই এত বিব্রত হইয়া পড়িতেছিলাম যে, মনে মনে একটা স্বস্তি অনুভব করিলাম। সাহস করিয়া, যদিও খুব সন্তর্পণের সহিত, বলিলাম, ওর নাম কি, আমিও বোধ হয় কখনও দু-একটা এ গাছ সে গাছ লাগিয়ে থাকব।

তা হ'লে উঠতেই হচ্ছে মশায়; ও যে আমার কি নেশা—কোন্ দিক দিয়ে রাস্তা বলুন দিকি?

দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন। আমি কৃতকৃতার্থ হইয়া গিয়াছি; এ অনাড়ম্বর, প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্য-উপাসকের দর্শনেও পুণ্য। কিন্তু রাত্রিকাল—। বলিলাম, এখন না হয় থাক্ গৌরীকান্তবাবু, বাগানটা একটু জঙ্গুলে, তায় গোটাকতক কেয়া ফুটেছে, গরমের রাত্রি—

কেয়াফুল! না ইয়েবাবু, আমার ফুলের বাতিক দেখে আপনি নিশ্চয় ঠাট্টা করছেন। এই মরুভূমির মাঝখানে কেয়াফুল! এ হতেই পারে না।

না, সত্যিই ফুটেছে। এক ঝাড় গাছ করেছি কিনা। এঃ, আপনি ফুলের এত ভক্ত জানলে মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দিতাম; কত ফুলই যে রোজ নষ্ট হয়!

ফুল আমার প্রাণ মশায়; না হ'লে দিন চলে না; ওই যে বললাম,

ফুল এক মৌমাছিই চেনে, কি গৌরীকান্তই চেনে; এইটুকু গুমর আমার আছে, হ্যাঁ। কাব্যচঞ্চু মশায় নাম রেখেছিলেন মধুলিড়, মধু লেঢ়ি, অর্থাৎ লেহন করে ইতি মধুলিট্ কিনা ভ্রমর—তাই তো—নাঃ, এখন মোটেই বাগানে যাওয়া সমীচীন নয়, কি বলেন? তাঁরা আবার আমাদের চেয়েও শৌখিন, ঘাঁটানো ঠিক নয়।

আস্তে আস্তে আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। এমন সমদরদী কখনও পাই নাই, মধুলিড়ই বটে, বাহিরটাতে কি আসিয়া যায় তাহার? একটা গুমর ছিল; কিন্তু ফুলের আদর তো দেখিতেছি, আমরা কিছুই জানি না। এঁকে সামান্য একটুও তৃপ্ত করা যায় না? চাকরটাকে ডাক দিলাম। আসিলে বলিলাম, দেখ দিকিন, আজ ফুল কিছু তুলেছে কি না, থাকে তো নিয়ে আয়।

প্রায়ই কিছু ফুল তোলা থাকে। একটা তোড়া আর কতকগুলা আলগা ফুল লইয়া আসিল—বেলা, গন্ধরাজ, একটা লবঙ্গলতার গুচ্ছ, হালকাভাবে জলের ছিটা দেওয়া।

এত আগ্রহ কখনও দেখি নাই; গৌরীকান্তবাবু এক রকম লাফাইয়াই উঠিয়া হাত দুইটা প্রসারিত করিয়া ধরিলেন, বলিলেন, ইস, স্বর্গ যে উজোড় ক'রে এনেছে! এসব আপনার নিজের বাগানে ফুটেছে? কাল সকালেই আবার বিরক্ত করতে আসছি—যাই না মনে করুন।

গদগদ হইয়া বলিলাম, নিশ্চয়ই আসবেন। আমি নয় ডেকে নিয়ে আসব 'খন খুব ভোরবেলা; সে সময় যা হয়ে থাকে!

ছোট শিশুর মত আনন্দ সমস্ত মানুষটিকে এত স্বচ্ছ করিয়া দিয়াছে—যেন অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখা যায়। শিশুর মতই হাসিয়া বলিলেন, আপনি আমায় ডাকবেন? তবেই হয়েছে। দেখবেন, রাত থাকতে এসে হানা দিয়েছি; যা নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন!

আমার যাইবার আগে তিনিই আসিয়া হাজির অতি প্রত্যুষে। প্রথম কথা—সমস্ত রাত ঘুম হয় নি মশায়; চলুন, কোন্ দিকটা?

বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুগ্ধ প্রশংসায় গৌরীকান্ত দুয়ারটির কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যে দিকটায় চান, দৃষ্টি যেন আর ফিরাইতে পারেন না। মুখে কথা নাই, শুধু একটা আবেগমাখা হাসি।

ফুলের গন্ধও তাহাদের এই উষার অতিথিদের অভিনন্দিত করিবার জন্য যেন ভিড় করিয়া পড়িয়াছে।

পরিচয় দিতে লাগিলাম, এটা ডালিয়া; ঠিক এখন ফোটবার সময় নয়; তবুও একটা না একটা ফুল থাকেই, এই ফুটন্তদের দলে প'ড়ে বেচারা যেন চক্ষুলজ্জায় প'ড়ে গেছে আর কি। এ রকম বেলা আপনি এ তল্লাটে পাবেন না। যোগাড় করতে যা বেগটা পেতে হয়েছে, লিখলে একটা ইতিহাস হয়ে যায়; ওর চেয়ে রাজপুতরা তাদের কনে উঠিয়ে আনত ঢের সহজে। খোশামোদ করতে হয়েছে, ঘুষ খাওয়াতে হয়েছে, তাতেও যখন হ'ল না, তখন চোর বনতে হ'ল; একটা ডাল কেটে এনেছিলাম।

গৌরীকান্ত বলিলেন, এ চুরিতে পাপ নেই। আমি তো ভেবেছিলাম সাদা গোলাপ। বেলার এত পাপড়ি! আর রসে যেন ভেঙে পড়ছে পাপড়িগুলো!

এমন উৎসাহভরে কখনও ফুলের ব্যাখ্যান করি নাই। কোথায় এমন সমঝদারই বা এ রুক্ষ পৃথিবীতে?

গোলাপ ফুটিয়াছে—মার্শাল নীল। তাহার চাঁপার মত রঙে কোথাও একটু গোলাপী রেখা—কাঁচা সোনার যাহার রঙ, তাহারই রাঙা ঠোঁটের হাসির মত। তুলিতে হাত উঠে না; কিন্তু পূজার আগ্রহটা প্রবল। একটা তুলিয়া হাতে দিলাম। বলিলাম, 'সটন্'স প্রাইড' নাম

দিয়েছে। এর সগোত্র প্যারিস একজিবিশনে প্রথম প্রাইজ পায়; দেখুন না, ফোটার মধ্যে বেশ একটি দেমাকের ভাব নেই? আর একটা জিনিস দেখাচ্ছি, এই দিকে আসুন।

পথে মার কুমড়ালতা অবহেলায় লঙ্ঘন করিয়া যাইতেছিলাম। গৌরীকান্তবাবু পিছনে আসিতেছিলেন; থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়েবাবু! কি যে দিব্যি নামটি, ভুলে গেলাম—

বলিলাম, গোবর্দ্ধন।

হ্যাঁ, ঠিক। মশায়, এ কি কুমড়োর ফুল?

বলিলাম, হ্যাঁ, কাঁচড়াপাড়া থেকে বিচি আনানো; মার একেবারে প্রাণ বললেই চলে; বোধ হয় আমি ছেলে হয়েও অত যত্ন পাই নি।

এ জিনিস আমার গোটাকতক চাইই চাই—এ যে বাগান আলো ক'রে রয়েছে একেবারে!

কাল সন্ধ্যার সময় যখন অমন জ্যোৎস্না-রাত্রিটার লাঞ্ছনার কথা শুনিতেছিলাম, মনে মনে ভাবিতেছিলাম, কি করিয়া এই শুষ্ক কাষ্ঠের মত অতি নীরস মানবটিকে সৌন্দর্য্যরসে দীক্ষিত করা যায়!

এখন দেখিলাম, ইহার মধ্যেই রসের গূঢ় রহস্যটি ধরা পড়িয়াছে। এই তো দরদ, যাহা প্রভেদ বোঝে না, যাহা উচ্চ-নীচ-নির্ব্বিশেষে সমস্তর উপরেই উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। নূতন চক্ষে কুমড়ার ফুল দেখিতে লাগিলাম। মৃণালের চেয়েও শীর্ণ, সুকুমার বৃন্তের উপর গোলাপী-মেশা হলুদরঙের ফুলগুলি, তাহাদের একটি দলেই কি সুষমাই না ফুটিয়া উঠিয়াছে! নিজেকে এমন পরিপূর্ণভাবে মেলিয়া কোন ফুলই বোধ হয় ফুটিতে পারে না। গোটাকতক তুলিলাম; আমার আঙুলগুলা যেন আবীরে ভরিয়া গেল।

গৌরীকান্তবাবু তাড়াতাড়ি অথচ খুব আলগা হাতে আমার নিকট

হইতে ফুলগুলা তুলিয়া লইলেন, বলিলেন, দেখবেন, ওগুলো হ'ল পরাগ, খুব বাঁচিয়ে, ওই তো আসল। ওই যে রজনীগন্ধা! তাই তো বলি, এত ফুল না হ'লে কাল অত গন্ধ আসছিল কোথা থেকে! ওর কেরামতি রাত্তিরে; থাক্, রাত্তিরেই এসে নিয়ে যাব 'খন; ততক্ষণ যতটা রস টানে। চলুন, এইবার আপনার কেয়া দেখিগে, সংস্কৃতে হলেন কেতকী—

কেতকীরেণু খদির রসে দিয়া,—
শুকায়ে নিও কমল কিশলয়ে;
অধর তাতে সুরভি ক'রে প্রিয়া,
আমারে দিও মরণ বিলাইয়ে।

একটুখানির মধ্যে কেয়া-খয়েরের ফর্মুলাটি কেমন দিয়ে দিয়েছে। খয়েরের রস ক'রে তাতে কেয়ার ধুলো দিয়ে কচি পদ্মপাতায় শুকিয়ে নেবে। আগেকার তারা সব ফুলপাতার সঙ্গে ঘর করত। সেদিন ওর একখানি বইয়ে দেখছিলাম না! শকুন্তলার জ্বর এল, তক্ষুনি চন্দন ঘ'ষে পদ্মপাতায় লেপে বসিয়ে দিলে; এখন হ'লে—ছোটা মোটর, ডাক্ সিবিল সার্জনকে—

৪

আমরা পুষ্পলোকে বাস করিতেছি বলিলেও চলে। সমস্ত দিন কেবল ফুল, ফুল আর ফুল।

গৌরীকান্তবাবু সকালে আসেন, সন্ধ্যায় আসেন। সময়টা প্রায়ই বাগানে কাটিয়া যায়। ফুলের পরিচর্য্যা, ফুলের আলোচনা, আর পাত্র

ভরিয়া ফুল সঞ্চয়, এই কাজ। বলেন, নন্দনকানন সম্বন্ধে যা শোনা যায়, তা কতকটা এই রকম হবে ; কি বলেন ইয়েবাবু ?

তাঁহার জন্য একটি সাজি কিনিয়াছি ; সেইটিই পূর্ণ করিয়া ফুল দিই। সাজি ভরিয়া ফুল দিয়া মনে হয়, এ পূজা, তাঁহার অন্তরের মন্দিরে যে সৌন্দর্য্যের দেবতা আছেন, তাঁহাকে অর্ঘ্য দিতেছি।

দেবতার সংস্পর্শে আমার বাগানের শ্রীবৃদ্ধিও হইয়াছে। কোথায় এঞ্জিনীয়ারের বাগান, কোথায় কমিশনার সাহেবের গ্রীন-হাউস, এই সব দুষ্প্রবেশ্য স্থান হইতে কতকগুলি নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য আর দামী ফুল আমার বাগানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ; বেশির ভাগই গৌরীকান্তবাবুর চেষ্টায়। সে সবের মধ্যে একটি আছে নীলপদ্ম। কাশ্মীর স্টেট-গার্ডেন্‌স হইতে আমদানি করা, ভূস্বর্গের পারিজাত। বাগানের মাঝখানে উহারই জন্য একটি হৌস হইবে স্থির হইয়াছে, মাঝখানে থাকিবে একটি ঝরনা।

বলি, এত কষ্ট ক'রে যোগাড় ক'রে সব আমায়ই দিয়ে দিচ্ছেন ; কিছু তো আপনিও রাখলে পারেন।

বিমর্ষভাবে কপাল স্পর্শ করিয়া বলেন, সে অদৃষ্ট করি নি ইয়েবাবু, তা হ'লে আর ভাবনা কি ! হাজির হতে দেরি হবে না, গিন্নী সঙ্গে সঙ্গে টান মেরে ফেলে দেবেন। কি যে আক্রোশ, দেখেন নি তো। সে পক্ষের সঙ্গে কিছুই মেলে না, মেলে শুধু এইখানটায়।

রহস্য এইখানেই শেষ নয়, আরও আছে। আজকাল আমাদের দুইটি বাড়ির স্ত্রীমহলেও ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, আমার স্ত্রী প্রায়ই যান। ফিরিয়া আসিয়া রোজই বলেন, আচ্ছা, এই যে ঠাকুরপূজোর ভাগ থেকে কেটে কেটে নিত্যি সাজি-ভরা ফুল পাঠাও, কই, বাড়িতে তো কোথাও একটা পাপড়িও দেখতে পাই না !

বলি, তুমি বোধ হয় খোঁজ কর না।

উত্তর হয়, ওমা, অবাক করলে যে! বলে গোয়েন্দাগিরি করতেই আজকাল আমার যাওয়া। আর ফুল কি শুধু দেখতে হবে! যা ফুল যায়, তাতে সারা বাড়িটা গমগম করবে না? কি যে বল!

বলি, দু বেলা টাটকা ফুল যাচ্ছে, তাই বাসী হওয়া মাত্রই নিশ্চয় ফেলে দেন। তুমি যাও তো সেই তিনটে-চারটের সময়, তখন বোধ হয় তাই আর দেখতে পাও না।

তাহাও নয়; কেন না, আমার গোয়েন্দাটি দুই দিন পরে আসিয়া খবর দিলেন, আজ ওত পেতে ছিলাম, কর্ত্তা আপিসে বেরিয়ে যেতেই হাজির হয়েছি, ঠিক এগারোটা দশ। ফুলের বিন্দুবিসর্গ নেই। সাতটা-আটটার সময় তোলা ফুল দশটা-এগারোটার সময় বাসী মনে করে, এমন পুষ্পবিলাসীও আছে নাকি?

বলিলাম, ওঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখলে তো পার।

সেও হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করলেই কথা উল্টে নেয়, মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে পড়ে, তার ওপর খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করা চলে না। এমনিই তো বেশ আমুদে মানুষটি!

একটু হতবুদ্ধি হইয়া রহিলাম। তাহার পর একটা কথা মনে উদয় হইল, বলিলাম, হয়েছে গো, নিশ্চয় পুজো-টুজো করেন; কথাটা আমাদের কাছ থেকে গোপন—

স্ত্রী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, স্বামী পুজো-আর্চ্চা করলে, নিষ্ঠাবান হ'লে হিন্দুর মেয়ের লজ্জিত হবার তো কথাই! বরং নাস্তিক, অনাচারী হ'লে—

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কথাটা পাল্টাইয়া লইতে যাইতেছিলাম, স্ত্রী বলিলেন, আমি যা ভেবে ঠিক করেছি, শুনবে?

আমি আগ্রহভরে বলিয়া উঠিলাম, বল না। মনে ঠিক আছে,

যতই সম্ভবপর আন্দাজ হউক না কেন, একটা খুঁত বাহির করিয়া আক্রোশ মিটাইবই—টাটকা-টাটকি।

স্ত্রী বলিলেন, আমার মনে হচ্ছে, সাহেব-টাহেবের বাড়ি ভেট পাঠায়।

অসম্ভব নয়। আমি কিন্তু তাচ্ছিল্যের সহিত হাসিয়া বলিলাম, আরে দূৎ, রোজ রোজ—

তিনি সহজ দৃঢ়তার সহিত বলিয়া চলিলেন, না হ'লে সাহেবের কাছে অত খাতির আছে শোনা যায়, সে কি ক'রে হয়? মাইনেও বেড়েছে এর মধ্যে বলছিলে। ফুল দিয়ে খোশামোদ করবার ফল নিশ্চয়।

যুক্তিটা সহজেই খণ্ডন করিবার নয়, সেইজন্যই বেশি অবহেলা দেখাইয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া তর্কটা চাপা দিলাম।

সন্ধ্যার সময় গৌরীকান্তবাবু আসিলে বলিলাম, মশায়, আপনি ফুলের কি ভাবে সদ্ব্যবহার করেন, সেই নিয়ে আমাদের স্ত্রী-পুরুষে কাল সমস্ত রাত গভীর গবেষণায় কেটেছে। আপনার ভাদ্দরবউয়ের যত আজগুবি আন্দাজ, বলে—বাড়িতে ফুল দেখতে পাই না, নিশ্চয়ই একটু বাসী হ'লেই ফেলে দেন। বললাম, আরে ধ্যাৎ—একেই বলে মেয়েলী বুদ্ধি। বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে আলাপ, তাদের সব ভেট-টেট দেন নিশ্চয়। বলে—হ্যাঁ, তোমার যা বুদ্ধি, অমন চমৎকার ফুলগুলো ওই মেলেচ্ছ-গুলোর পায়ে ঢালতে যাবেন! সাত্ত্বিক মানুষ, নিশ্চয় পূজো-টুজো ক'রে বাসী হ'লে আবার ফেলে দেন।

গৌরীকান্তবাবু খুব মনোযোগসহকারে শুনিতেছিলেন, এইবার প্রবল বেগে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, দেখছিলাম, কার কতটা বুদ্ধির দৌড়! সে ধরবার জো নেই তো গবেষণা ক'রে কি হবে? তবুও উনি পূজোর দিকে গেছেন, অনেকটা কাছাকাছি; তবে কার পূজো, ধরতে পারেন

নি, হাঃ—হাঃ—। তবে, আর দেরি নয়, এইবার জানাব। তখন বুঝতে পারবেন, ফুলগুলো এতদিন কি ভাবেই না নষ্ট ক'রে এসেছেন। একটু দেরি করছিলাম, ওদিকে মল্লিকার গোড়েটা ঠিক তোয়ের হয় নি এতদিন। এদিকে বোধ হয় পদ্ম দুটোও ঠিক পুরন্ত হয়ে ফুটেছে, আর সেই কেয়াটা—চলুন, দেখা যাক।

বাগানের মাঝে দাঁড়াইয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, নাঃ, সব ঠিক আছে। তবে আজই হোক, বুঝলেন ইয়েবাবু? কি যে দিব্যি নামটি—

বলিলাম, গোবর্দ্ধন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। আজ ফুলের বাহার দেখবার নেমন্তন্ন; ওইখানেই পায়ের ধূলো দেবেন। ভাগ্যগুণে আজ খাসা একটি মিরগেল মাছও পাওয়া গেছে। আর ডিম নিশ্চয় খান—ছোট? তবে হ্যাঁ, ঠাকুরটিকে চাই আপনার। গিন্নী বলেন, আমি আজ রান্নাঘরের ত্রিসীমানার মধ্যে ঢুকতে পারব না। কাজ কি ও জাতকে ঘাঁটিয়ে মশায়? বললাম, বেশ, ওঁর ঠাকুরকে ডেকে আনছি, দেখিয়ে শুনিয়ে দোব 'খন; তুমিও তো আজ আমার কাছে থেকেই গুণী। আর ওঁর স্ত্রী বোন সব আসছেন, তোমার এদিকে থাকলে চলবেই বা কেন?

আহারে বসিয়াছি। গলদঘর্ম্ম গৌরীকান্তবাবু সামনে একটি টুলে বসিয়া পাখার হাওয়া খাইতেছেন; এতক্ষণ রান্নাঘরে ছিলেন। নানা ফুলের একটা ক্ষীণ মিশ্র গন্ধ যেন মাঝে মাঝে নিশ্বাসে ধরা দেয়; কিন্তু ফুল কোথাও দেখিলাম না। শুধু সামনে একটা ছোট ঝুড়িতে আর সব আবর্জ্জনার সঙ্গে সেই পদ্মের কতকগুলা পাপড়ি, আর কেয়াফুলের কচি

পাতা। বোঝাই যায়, ছোট মেয়েটির কীর্ত্তি। 'ফুলের বাহার' নিশ্চয় উপরে শোবার ঘরে, খাওয়া-দাওয়ার পর লইয়া যাইবেন।

বলিলেন, ঠাকুর, এইবার নিয়ে এস চপ-টপগুলো। কি রকম হয়েছে কে জানে, একেবারে আনাড়ী লোক!

ঠাকুর একটি রেকাবিতে এক প্রস্থ তরকারি, ভাজা আনিয়া হাজির করিল। গৌরীকান্তবাবু প্রবল উৎসাহে নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন, আগে ওইটে দাও; বাতলান দিকি জিনিসটা কি?

রজনীগন্ধার বাসের সঙ্গে ছোলার বেসমের সোঁদাটে গন্ধ। একেবারে জলের মত পাতলা ক'রে নিতে হবে বেসনটা—আগার দিকটা কেমন, মুচমুচে তো? এইবার গোড়ার দিকটা একটু জিবের চাপ দিন; বেশ একটু মিষ্টি নয়? ওইটি হ'ল মধু, ভাজার কারচুপিটা বুঝুন। এইবার ওইটি দাও বাবাজী। না বললেও নিশ্চয় ধ'রে নেবেন, গন্ধই যে ওকে ধরিয়ে দিচ্ছে; কেয়াফুলের চপ—মাছটিকে সেদ্ধ ক'রে নিয়ে কাঁটা বেছে ফেলবেন, তারপর আস্তে আস্তে কেয়াফুলের ওপরকার কচি পাতাগুলো তুলে ফেলে ফুলটা কুচিকুচি ক'রে ফেললেন, মাইণ্ড ইউ—কেয়ার ধুলো-গুলো সব মাছেই পড়া চাই; তারপর—না না, ও তিনটেই খেতে হবে। গিন্নী করলেও একটা কথা ছিল; দেখছেন তো, যেন ফুলের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ ক'রে উঠেছি, কম মেহনৎ! আচ্ছা, অন্তত আর একটা। এইবার এইটে দেখুন তো। দাও ঠাকুর। আপনার সেই নীলপদ্মের ডালনা, আপনি সাধ ক'রে যার নাম রেখেছেন নীলা। কখনও এ ব্যাপার মাথায় ঢুকেছিল? সব পদ্মরই হয়, তবে এমনটি হয় না। এ জিনিসটির জন্যে আমি মাড়োয়ারীদের কাছে ঋণী। দেখবেন, পদ্মের সিজনে দোকানে ঝুড়ি ঝুড়ি পদ্ম কিনে রেখেছে, ভাবছেন বুঝি খদ্দের মারবার জন্যে রামচন্দ্রের মত অকালবোধন করছে সব, হাঃ—হাঃ—হাঃ।

আমারও ফুলের দিকে ঝোঁক, একদিন ধরলাম, বলি শেঠজী—। ও কি ইয়েবাবু! ফুল খাবেন ফুলের মত তাজা হয়ে, এ যেন ফাঁসিতে উঠতে যাচ্ছেন! নিন, পেয়াদা ব'সে আছি, হাত গুটোলে ছাড়ছি না। হ্যাঁ, কি যে বলছিলাম, সেই শেঠজীই আমায় বাতলে দিলে। একটু কামড় দিয়ে বললে, বাবু, ফুল তোমরা ব্যাভার করতে জান না। লজ্জায় ঘাড় হেঁট হয়ে গেল মশায়। অথচ এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। প্রথমটা পাপড়ি-টাপড়ি বাজে হিস্তেগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিলেন, পাখিটির রোঁয়া তুলে ফেলবার মত আর কি—দেখবেন নরম প্যাডের মতন একটা জিনিস, ছিঁড়ে ফাটিয়ে ফেলুন—দেখবেন ভাতের মত দানা দানা, সবই ঘিয়ে ভেজে নিন—ওটা দিয়ে দাও ঠাকুর—খাবেন বইকি। তুমি ততক্ষণ ওদের কাছ থেকে বেলফুলের গোড়ের মোরব্বাটা নিয়ে এস। ওইটি বড় শক্ত জিনিস মশায়, একটু ভাজবার তারতম্য হ'ল, কি রসের বে-আন্দাজ হ'ল তো বাস্—বড্ড মোলায়েম জিনিস কিনা—এ তো আর আমলকিও নয়, কুমড়োও নয়—আপনার ঠাকুর তো এদিককার সব শিখেই ফেললে; যাক, যদি চ'লেও যাই এখান থেকে তো মাঝে মাঝে নাম করতে হবে। এর পরে কলকেফুলের শুক্তনি, শিউলির ঘণ্ট, চন্দ্রমল্লিকার গুড়-অম্বল—শিখিয়ে দোব 'খন।

ঠাকুর খালি-হাতে আসিয়া বলিল, মাইজী বললেন, আমি ছুঁতে পারব না, নিজে এসে বের ক'রে নিয়ে যেতে বল।

ওইঃ, তবু আপনারা কাব্যি ক'রে বলবেন, নারী হ'ল পুষ্পের জাত, মেয়েমানুষেরই ফুলের দিকে টান বেশি। কি যে বিষদৃষ্টি! সে গুমর করব আমি। সেই যে বলছিলাম না? কাব্যচঞ্চু মশায় বলতেন, গৌরীকান্ত, তুমি মধুলিড়। বসুন, আমি নিজের হাতেই নিয়ে আসছি।

পূর্ণ চাঁদের অট্টহাসি

১
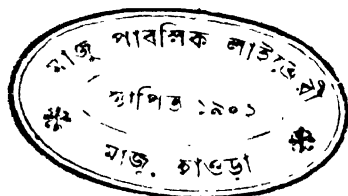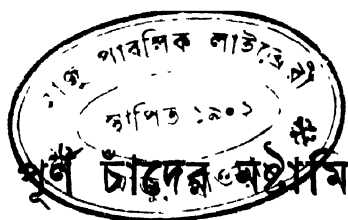
পূর্ণিমা-রাত্রি। আকাশের মহাপ্রাঙ্গণ থেকে পৃথিবীর রন্ধ্র পর্য্যন্ত জ্যোৎস্না যেন আর ধরে না। সামনে প্রশস্ত গঙ্গা, কূলের শেষ সীমা পর্য্যন্ত জোয়ারের জল ঠেলিয়া উঠিতেছে, আর একটানা সজোর দক্ষিণা হাওয়ায় তাহার উপর বড় বড় ঢেউয়ের সারি জাগাইয়া তুলিয়াছে। পাশের খোলা জায়গাটায় কোথায় একটা হেনার ঝাড় আছে, তাহা হইতে মাঝে মাঝে একটা তীব্র মিঠা গন্ধের গমক ভাসিয়া আসিয়া যেন নেশা ধরাইয়া দিতেছে। একটা পাখি ক্রমাগতই ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই মাহেন্দ্রলগ্নে যেন একটা সঙ্গীতরাজ্যের সৃষ্টিতে মাতিয়া উঠিয়াছে।

সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতায় রাত্রিটা যেন আর নিজের মধ্যে আঁটিয়া উঠিতেছে না।

এমন একটি রাত্রির নিকট সতর্ক থাকাই ভাল, কেন না প্রত্যেক সুন্দরীর মতই এও কখনও কখনও একটা বিশ্রী রকম আত্মবিস্মৃতি ঘটায়। আমি যে গুটি ষাট টাকার একটা কেরানী, আজিকার চাঁদের প্রশান্ত অনবদ্য সৌন্দর্য্যের চেয়ে আমার যে বড়বাবুর ভ্রূকুটিকুটিল মুখটির ধ্যান করাই বেশি দরকার, আজ এই দক্ষিণা হাওয়ায় মনের পাল না তুলিয়া দিয়া কাল আমার পাওনাদারদের মেজাজের হাওয়া কোন্ দিকে বহিবে তাহার হিসাব রাখিলে যে বেশি কাজ হয়, এসব প্রত্যক্ষ সত্যগুলা মনেই আসে না। এমন রাত্রে, বিশ্বের এই সীমাহীন প্রসারতা, বায়ুর এই বেহিসাব ছড়াছড়ি দেখিতে দেখিতে মনে হয়, আমিও একটা প্রকাণ্ড কিছু হইতে পারিতাম। ওপারের ওই বিদ্যুৎ-আলোকিত কলের

একাধিপতি হওয়া, কি গঙ্গার ওই যে পুলটা গড়িয়া উঠিতেছে, ওর চীফ এঞ্জিনীয়ার হওয়া তাহার কাছে কিছুই নয়। তবে হইলাম না কেন? এর মীমাংসা করিতে গিয়া অনেক কথাই মনে পড়ে; সংসারের নানান রকম ছোট বড় প্রতিকূলতা। বহুদিন অতীত সে সবের কোনটাকেই কিন্তু বেশ বাগাইয়া ধরিয়া আক্রোশ মেটানো যায় না। এই সুদীর্ঘ চিন্তাধারার শেষে আসিয়া পড়ে বিবাহ ব্যাপারটা, যেন কূল পাই এবং রাগের সমস্ত উচ্ছ্বাস লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়ি বউয়ের উপর।

আমার প্রথম যৌবনের অপরিমেয় প্রাণশক্তি—যাহা শত দিকে শত কল্পনায় বিকশিত হইয়া উঠিত—স্বদেশ, স্বাধীনতা, সাহেব ঠেঙানো, বাণিজ্য, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনা, সব জিনিসকেই ফুঁয়ে উড়াইয়া দিবার স্পর্দ্ধা—কে তাহা বিনষ্ট করিল? বউ। যত নষ্টের কু এই বউ। কি যে এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে ধরা পড়িয়াছি, তাহার পর প্রতিদিনই নিম্নগতি, প্রতিনিয়তই মনের এক-একটা মহৎ বৃত্তির বলিদান। এখনও কি চেষ্টা করিলে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না? আমি কি সেই আমি নই? একবার গা-ঝাড়া দিয়া দেখিলে হয় না? ভৈরব হুঙ্কারে একটা নাড়া দিয়া মৃণালবদ্ধ হস্তী যেমন পদ্মবন দলিত করিয়া উঠিয়া আসে, তেমনই ভাবে ওর সমস্ত মাধুর্য্যের বাঁধন ছিঁড়িয়া কি একবার বাহির হইয়া আসা যায় না? মুক্তি যে চাইই, এ রাত্রি যেন তাহারই বাণী ঘোষণা করিতেছে, আজই আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্রত শুরু করিয়া দিতে হইবে যে।

এই রকম সব উদ্ভট চিন্তা মনে আসে। অন্তত এই বিশেষ পূর্ণিমা-রাত্রিটিতে, গঙ্গার সামনে ছোট বাড়ির খোলা ছাদটুকুতে বসিয়া অ্যাণ্ড্রিউ-ডেভিডসন কোম্পানির ফোর্থ ক্লার্ক, আমাদের অনুকূল ভাদুড়ীর মনে এই চিন্তার জোয়ার ঠেলিয়া উঠিতেছিল।

ইহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি ছিল না। বাঁধা জীবন-প্রণালীর

কোনখানে কোন ছন্দপতন ঘটিত না, রাত্রে দিব্য ভাল ছেলেটির মত বিছানায় শুইয়া শুইয়া বধূ মালতীর নিকট সেই দিনটির একঘেয়ে হিসাব শুনিতে শুনিতে নিদ্রা, সকালে চটকলের বাঁশি শুনিয়া জাগরণ, ত্বরিত স্নান, আহার, আটটা ছত্রিশের গাড়ি ধরা, অফিস, আবার সন্ধ্যার সময় সেই বাড়ি—সব নির্ব্বিবাদে, বিনা ওজরে চলিয়া যাইত; কিন্তু এই সময় বাড়ির মধ্যে একটি ব্যাপার ঘটিতেছিল, যাহা সব ওলটপালট করিয়া দিল।

মালতীকেও আজ পূর্ণিমায় পাইয়াছে; কিন্তু অন্য ভাবে। সে রন্ধন করিতেছিল, এমন সময় কেরোসিনের ডিবরিটা নিবিয়া যাওয়ায় খোলা জানালার মধ্য দিয়া ঘরটা হঠাৎ নীলাভ জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে যে পঞ্চশরে বিদ্ধ হইয়া অচেতন হইবার দাখিল হইল, এমন কথা নয়; তবে এই আগন্তুক জ্যোৎস্নাটা তাহার হঠাৎ যেন বেশি রকম মিঠা ঠেকিল, এবং যে হাওয়াটা তাহার প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া কাজের অগোছ করিয়া দিল, সেই আবার তাহার মনের কোথায় অন্য একটা প্রদীপ জ্বালিয়া কবেকার কতকগুলা বিস্মৃত ঘটনাকে আলোকিত করিয়া তুলিল। ফলে এই হইল যে, মালতীর হাতা-বেড়ি ঠনঠনাইয়া রোজকার এই রন্ধন-কার্য্যটা বিশেষ ভাল লাগিল না। ডালের হাঙ্গামাটা উঠাইয়া দিল এবং ডালনা ও ভাজার কুটনা একত্র করিয়া তাড়াতাড়ি যেমন-তেমন করিয়া একটা ঝোল নামাইয়া লইল ও দুধটা জাল দিয়া রান্নাঘরের শিকল তুলিয়া দিয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে রাত্রিটা আরও সুন্দর; মনে পড়িল, এই রকম একটি ফুটফুটে রাত্রে, আজ হইতে নয় বৎসর পূর্ব্বে একটি উৎসবের কথা, তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ উৎসব। সেদিনকার নিজেকে মনে পড়িল, আর মনে পড়িল রাঙা চেলি পরা একজনকে, মুখে খড়কে দিয়া আঁকা চন্দনের বঙ্কিম রেখা, ঠোঁটে সলজ্জ হাসির আভাস—

বড় মেয়েটি একটা ছবির বই পড়িতেছিল; মালতী একটু দ্বিধার স্বরে প্রশ্ন করিল, কোথায় রে? বেরিয়েছে বুঝি?

মেয়ে একটু অন্যমনস্ক ছিল, প্রশ্ন করিল, কে মা?

তোর বাবা।—কথা দুইটি বলিতে একটু লজ্জা হইল আজ, কিন্তু লাগিল বড় মিঠা।

মেয়ে উত্তর করিল, ছাতের ওপর, ডেকে দোব?

না, তুমি পড়।

মালতী মেয়ের আনত মুখখানির পানে একটু চাহিয়া রহিল, সুন্দর মুখখানি, বাপের চোখ দুইটি আর কোকঁড়ানো চুল পাইয়াছে, আর ছোট্ট কপালটি এবং টুকটুকে ঠোঁট দুইখানি নাকি তাহার নিজের দেওয়া।

ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দুইজনের মধ্যে কতদিনের কত তর্কবিতর্কের কথা মনে পড়ে।

মালতী ঘরের মধ্যে গেল। রাত্রে আরশি দেখিতে মানা, তবুও যে চকিত ছায়াটি পড়িল, তাহাতে টের পাওয়া গেল, কতকগুলা ছোট চুলের ঘুঙরি ঘামে ভিজিয়া কপালে জড়াইয়া গিয়াছে, মেয়ের ছাঁচের ছোট্ট কপালটিতে।

চুলের গোড়া খুলিয়া আবার ভাল করিয়া আঁটিয়া বাঁধিল। আজ খোঁপা বাঁধা হয় নাই, ঠাকুরঝি যাওয়া পর্য্যন্ত এদিকে প্রায়ই হয় না। থাক্, ও এলো খোঁপাই ভালবাসে। ওর এই শখের কথা মনে পড়ায় আবার লজ্জা আসে।

গন্ধরাজের গাছটি ফুলে আলো করিয়া রহিয়াছে; আজ ঠাকুরঝি থাকিলে জোর করিয়া পরাইয়া দিত চুলে, যা দুষ্টু! তাই বলিয়া নিজে তুলিয়া খোঁপায় গোঁজা যায় না—না না, কোনমতেই নয়।

কাপড়খানায় হলুদ আর তেলের দাগ। মালতী আলনায় আপনার

কোঁচানো নীলাম্বরী শাড়িটির দিকে লুব্ধভাবে চাহিল, কিন্তু লজ্জাকে অতটা অতিক্রম করিতে না পারায় একটি কাচা আটপৌরে শাড়িই পরিধান করিল। দুইটি পান সাজিল। একটি নিজের মুখে দিয়া অপরটি হাতে রাখিল, ওপরে যাইবার ছুতা।

বেশ জ্যোৎস্না! চমৎকার, দিব্য হাওয়া! ও কতবার বলিয়াছে, তুমি রান্নাবান্না তাড়াতাড়ি সেরে একটু বাইরে হাওয়ায় এসে ব'স না কেন? হইয়া উঠে না। তা ছাড়া ওর যে মতলবে বলা—সে সবের আর বয়স আছে নাকি?

জ্যোৎস্নার কথা ভাবিতে ভাবিতে জ্যোৎস্নার ডেলার মত কখন দুইটি গন্ধরাজ ফুল তুলিয়া ফেলিয়াছে অন্যমনস্কভাবে। খোঁপার নিকট হাত লইয়া যাইতে মনে পড়িল; ভাবিল, দূর, খোঁপায় পরা চলে না; হাতে থাকে থাক্ গিয়া, কি আর এমন দোষ হইবে তাহাতে?

তাড়াতাড়ি শুধরাইয়া লওয়া নিজের রূপটির উপর মনে মনে একটু চক্ষু বুলাইয়া লইল। লজ্জাও করে, যেন নিজের কাছে ধরা পড়িয়া যাওয়া। যা কবি-মানুষ, একরাশ উচ্ছ্বাসের ছড়াছড়ি হইবে এখনই।

আরশিতে আবার ভ্রূজোড়াটির উপর হঠাৎ নজর পড়িল, ওই যাঃ, টিপ পরা হয় নাই—টিপ ওর চাইই যে!

মালতী ক্রমেই বেজায় কুণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিল; তাহারই মধ্যে কে যেন ক্রমাগত একটা চটুল হাসি হাসিয়া যাইতেছে, যেন ঠাকুরঝি তাহার মনের অন্তরালে বাসা বাঁধিয়াছে।

মালতী যেন এই অন্তরালবর্ত্তিনীকেই লক্ষ্য করিয়া বলিল, তা কি করব, বল? মেয়েমানুষকে অন্যের শখেই যে চলতে হবে; নয়তো এত রাত্রে টিপ পরতে আমার ব'য়ে গেছে।

কপালে একটি খয়েরের টিপ পরিল।

এই সময়-বরাবর ওদিকে স্বামী অনুকূল প্রকাণ্ড একটা কিছু না হইতে পারার সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত করিয়া ভাবিতেছিল, যত নষ্টের কু এই বউ, *কি যে একটা দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে ধরা পড়িয়াছি !*

ভাবিতেছিল, মৃণালবদ্ধ হস্তী যেমন পদ্মবন দলিয়া পিষিয়া উঠিয়া আসে, তেমনই ভাবে ওর সমস্ত মাধুর্য্যের বাঁধন ছিঁড়িয়া কি বাহির হইয়া আসা যায় না ? সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে নিজেকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়া দাঁড়ানো যায় না ?

২

মালতী সিঁড়ি বাহিয়া ছাতের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, আজ মশাইয়ের জোচ্ছনা আর মলয় খেয়েই কাটবে, না আরও কিছু চাই ?

সকলেই জানেন, দাম্পত্য-ভাষায় এগুলো লিডিং-কোশ্চেন জাতীয়, এর উত্তর একটি মাত্রই ছিল, জানাইয়া দেওয়া—না প্রিয়ে, আজ বরং যাহা খাইয়া কাটিতে পারে, তাহা তোমার দুইটি অধরে সঞ্চিত আছে, এই জ্যোৎস্না আর মলয় বায়ু তাহার ক্ষুধাটা তীক্ষ্ণই করিয়া দিয়াছে।

ইহার পর যাহা হইবার আপনিই হইয়া যায়। মোটের উপর এ খোরাকটিও জোটে, অথচ পেটের খোরাক যে বন্ধ হয় এমন নয়, বরং প্রীতি-সেবার মাধুর্য্যে আরও উপভোগ্য হইয়া উঠে।

কিন্তু অনুকূলের মাথায় আজ ভূত চাপিয়াছিল ; সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পরীক্ষার এমন বিপুল সরঞ্জাম দেখিয়া সে মনে মনে সর্ব্ববিজয়ী বীরের মত দৃপ্ত হইয়া উঠিল। দুয়ারের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিল, ওঃ,

আজ যে দেখি সব অস্ত্র শানিয়ে এসেছ! র'স। আমাদের যতটা গোলাম ভাব, ততটা নয়; অন্তত অনুকূল শর্ম্মা তো নয়ই।

নিতান্ত অবিচলিতভাবে বলিল, না, তা আর কাটে কবে? কতদূর ভাতের?

মালতী যেন থতমত খাইয়া গেল। চৌকাঠ হইতে পা বাড়াইয়াছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া একটু শুষ্ক কণ্ঠেই বলিল, দেরি? দেরি কিসের, তাই জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম, বাড়া হবে?

রান্নাঘরের তাতে মুখটা এখনও লাল হইয়া আছে, তাহার উপর পূর্ণিমার জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, আবার এই নূতন আঘাতে অপ্রতিভ ভাবটা, ক্ষণিক দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়েই যে! তবুও অনুকূল মনকে অতিরিক্ত রকম কড়া করিয়া আরও রূঢ় আঘাত হানিল; বলিল, তা এত সাজের ধুম যে!

মালতী অন্তরে অন্তরে যেন লজ্জায় ঘৃণায় মরিয়া গেল। মনে হইল, তাহার এই কপালের টিপ, গালে-টেপা পান আর কোঁচানো শাড়িটা তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত যেন দাহ করিয়া দিতেছে। স্বামীর প্রথম উত্তরে একটু অপ্রতিভ মাত্র হইয়াছিল—একটা সন্দেহের সান্ত্বনা ছিল যে, হয়তো সে সরলভাবেই কথাটা বলিয়াছে; কিন্তু এখন বেশ বুঝিতে পারিল, এ জানিয়া শুনিয়া প্রত্যাখ্যানের আঘাত। হঠাৎ এ মনোভাবের কারণ বুঝিতে পারিল না, বুঝিবার স্পৃহাও ছিল না; তবে এই অন্যায় অপমানটা তাহাকে বড় তীক্ষ্ণভাবে বিদ্ধ করিল। ওইটুকুর মধ্যেই সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যেন গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল। অথচ পিছাইতেও পা উঠে না; আর সামনের পথ তো নাইই।

এই সঙ্কট হইতে স্বামীর প্রশ্নই আবার তাহাকে পরিত্রাণের পথ

দেখাইল। অনুকূল জিজ্ঞাসা করিল, শুনলে কথাটা? বলি, সেজে-গুজে কোথাও বেড়াতে চললে নাকি? না, এমনিই?

মালতী শুষ্ক গলায় একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, একবার সইয়ের বাড়ি যাব ভেবে কাপড়টা ছেড়েছি।

উত্তরটিতে অনুকূলের একটু হার ছিল। তবে আঘাতটা যে লাগিয়াছে, তাহা বেশ বোঝা যায়। প্রশ্ন করিল, তা কি?

তাই বলছিলাম খেয়ে নিতে; একটু দেরি হয়ে যেতে পারে; অনেক দিন যাই নি।

অনুকূল একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল, তা দুটো ভাত বেড়ে নিতে বেশ পারব। এত অপদার্থ ভাব কেন বল দিকিন? অথচ এতদিন দেখছ আমায়।

মালতীর মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল, এতদিন দেখছি ব'লেই ভাবি; কিন্তু এই সময় তাহার মাথায় একটা খলবুদ্ধি আসিয়া জুটিয়া গেল। বলিল, সে বলতে গেলে তো রান্না-বান্নাও ক'রে নিতে পার, কিন্তু—

অনুকূল রোখের মাথায় জালের মধ্যে একটা পা বাড়াইয়া দিল, একটু গর্ব্বের সহিত বলিল, আবার 'কিন্তু' কি, পারিই তো, বেটাছেলে হয়ে জন্মেছি—

মালতীর দুষ্টু প্ল্যান মাথার মধ্যে জাঁকিয়া উঠিতেছিল, বলিল, ছেলেপুলে মানুষ করতেও—

স্বচ্ছন্দে। একটা সান্ত্বনাও থাকে যে, প্রায়শ্চিত্ত করছি।—দৃষ্টিটা ওপারের কলের বিজলী বাতির উপর গিয়া পড়িল।

মালতী কথাটা সহ্য করিতে না পারিয়া ভ্রূজোড়াটা একটু কুঞ্চিত করিয়া বলিল, প্রায়শ্চিত্ত!

প্রায়শ্চিত্ত। সামনের ওই কলটা দেখছ? একজন মাড়োয়ারীর;

ওতে বোধ হয় ক্রোর টাকা খাটছে। সমস্ত দিনের পর রাত বারোটা একটায় একবার অন্দর-মহলে এল কি না এল! বাস্, ওই পর্য্যন্ত। মোহ আছে; তবে সেটা কাজের মোহ, লক্ষ্মীর মোহ—

বাধা দিয়া মালতী বলিল, বুঝেছি, অর্থাৎ অলক্ষ্মীর মোহ নেই আর কি।

অনুকূলের যেন একটু চমক ভাঙিল; বুঝিতে পারিল, কথাটা অত্যন্ত রূঢ় হইয়া গিয়াছে; এতটা রূঢ় করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। তবুও একেবারে অনুতাপের দুর্ব্বলতাটা প্রকাশ করিতে কেমন কেমন বোধ হইল; তাই শুধু একটু নালিশের সুরে বলিল, অমনই রাগ হ'ল? আমি কি তাই বললাম? কথাটা বেঁকিয়ে না বললে—

গ্রহের দোষ হইলে শোধরাইবার সময়ই ভুলগুলা আরও ঠেলাঠেলি করিয়া আসিয়া জোটে, অনুকূল আর কথাটা শেষ করিতে সাহস করিল না।

অবসরও ছিল না; কারণ শেষ করিবার পূর্ব্বেই মালতী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, আমার কথা তো ব্যাঁকা হবেই; আমার মন ব্যাঁকা, আমার কপাল ব্যাঁকা, কথা আর সোজা হবে কোত্থেকে? দেখতে যখন পার না, তখন আমার চলন পর্য্যন্ত ব্যাঁকা ঠেকবে। আর সবচেয়ে ব্যাঁকা আমার বুদ্ধি, তাই সোজা মহাপুরুষদের কথায় থাকতে যাই। ভাত বাড়া হবে কি না, বলা হোক।—সিঁড়িতে সজোরে পায়ের ঘা দিতে দিতে মালতী নামিতে লাগিল।

অনুকূলের মেজাজটা খাদে নামিতেছিল; আবার সপ্তমে চড়িয়া বসিল। ক্রমে তাহার মনে হইল, সে দুনিয়ার কাহাকেও কেয়ার করে না। ষোলকলায় পূর্ণ চাঁদটা মাথার উপর উঠিয়া আসিয়াছে; আকাশে ছোট ছোট তারাগুলা লুপ্ত। চাই ওই রকম সর্ব্বগ্রাসী পরিপূর্ণতা।

সে কাহারও কাছে মাথা নোয়াইবে না। ঘরে বউয়ের কাছে নয়, অফিসে বড়বাবুর কাছে নয়, আরও অনেক জায়গায় অনেক লোকের কাছে নয়। কি বউ? তাহার আবার মোহ! কিসের বড়বাবু? তাহার আবার অত দেমাক! আর সেই ব্যাটা সার্জেণ্ট, সেদিন অত তাড়াতাড়ির মধ্যে তাহার ট্যাক্সিটা যে স্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়ে অতক্ষণ দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল, কেরদানি করিয়া একটা হাত বাড়াইয়া দিয়া ব্যাটা নিজেকে ভাবে কি? এই যে প্রকাণ্ড পৃথিবী, আলো তাহার হাজার বাহু দিয়াও যাহাকে ধরিতে পারিতেছে না, তাহার মধ্যে ইহাদের কর্ম্মক্ষেত্র কত সঙ্কীর্ণ! আর সে নিজে, কত বড়ই না সে হইতে পারিত! এখনও যদি ইচ্ছা করে, যদি শুধু মন দিয়া ইচ্ছা করে মাত্র তো এতবড় হইতে পারে যে, এ পৃথিবীতে তাহার সঙ্কুলানই হয় না। না, আর দুর্ব্বলতা নয়, নিজেকে চিনিতে হইবে, চেনাইতে হইবে। দাঁড়াও অনুকূল, তুমি মাথা তুলিয়া; পৃথিবী তোমার পায়ে লুটাইয়া নিজেকে চরিতার্থ মনে করুক।

৩

মেয়েটি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাত দেওয়া হবে বাবা? মা জিজ্ঞেস করলেন।

অনুকূল বলিল, তাঁকে যেতে বল্ বেড়াতে।

মেয়েটি নামিয়া গেল; তখনই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, বললেন, বেড়াতে আর যাবেন না; বড় মাথা ধরেছে, যাচ্ছেন শুতে।

অনুকূল মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া একটু চুপ করিয়া রহিল। মাথা

ধরার মানে সব সময় মাথা ধরা নয়—মেয়েদের পক্ষে আবার বেশির ভাগ সময়েই নয়।

জিজ্ঞাসা করিল, কাপড়-টাপড় ছেড়ে ফেলেছে নাকি?

ছাড়ছেন।

হুঁ! আচ্ছা, বল্‌গে যা শুতে; বলবি, আমি বেড়ে নোব খ'ন যখন খিদে পাবে। উঃ!

আবার আত্ম-চিন্তা চলিতে লাগিল। এবার আরও জোরের সঙ্গে চালাইবার চেষ্টা ছিল; কিন্তু এবারে গতির জন্য যেন মাঝে মাঝে লেজ-মোড়া দিতে হইতেছিল। জোৎস্নাটাও যেন ক্রমেই একটু একটু করিয়া খাদ মিশিয়া মলিন হইয়া উঠিতে লাগিল। খাসা দক্ষিণা হাওয়া, কিন্তু দক্ষিণা হাওয়ায় আবার যেন ক্ষুধাও বাড়ায় বলিয়া অনুকূলের বোধ হইতে লাগিল; আবার এই জ্ঞানটিকে সে যতই অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই যেন পেটের অনুভূতির মধ্য দিয়া সেটা স্পষ্ট হইয়া উঠে।

তখন স্ত্রীলোকের প্রতি তাহার দয়া হইল। আহা, বড্ড সামান্য, বড্ড ছোট ওরা, একটু কথার আদর পাইলেই বর্ত্তিয়া যায়, আবার ইঙ্গিতের মধ্যেও সামান্য অনাদরের ভাব দেখিলেই মুষড়াইয়া পড়ে। পুরুষের এই বিরাট জীবন, তাহার কোথায় এক কোণে একটু জায়গা করিয়া বেচারীরা পড়িয়া আছে, কাজ কি ওদের চোট দিয়া? আমাদের জীবনে কতটুকুই বা প্রভাব ওদের?

একটু পরে মেয়েটি আসিয়া সিঁড়ির দুয়ারের কাছে মাথাটি নীচু করিয়া দাঁড়াইল। মুখটি ভার-ভার।

অনুকূল মনে মনে হাসিল, মনে মনেই বলিল, দেখ ব্যাপার! বাপ খাবে না, একটু দেরি ক'রে খাবে, অমনই মেয়ের মুখভার, আর তার মা শয্যাধরা!

মেয়ে এবং তাহার মাকে কৃতার্থ করিবার জন্য অনুকূল বলিল, আচ্ছা, যাও, বল ভাত বাড়তে, আমি আসছি।

মেয়েটি কাছে সরিয়া আসিল; কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, মা কাউকেও ভাত দেবে না বললে, আমার খিদে পেয়েছে বাবা।

অনুকূল বড় কৌতুক অনুভব করিল; মেয়ের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, আচ্ছা তুমি বলগে দিকিন—বাবা খেতে আসছে, তা হ'লে তোমায়ও দেবে; কিংবা বলগে—বাবা ডাকছে, আমায় ভাত দিয়ে ওপরে যাও; না হয় বরং বল—বাবা একবার—

মেয়ে অভিমানের সুরে বলিল, না বাবা, তোমার নাম করলে খিঁচিয়ে উঠছেন, বললেন—বাবা বাবা করতে হবে না আমার কানের কাছে, বেরো, দূর হ। তুমি চল বাবা, মার কি হয়েছে, আমার ভয় করছে।

অনুকূল একটু অন্যমনস্কভাবে বলিল, বেশ ভাল ক'রে গুছিয়ে শুয়েছে নাকি? মশারি ফেলে?

মশারি ফেলতে গিয়ে একটা কোণ ছিঁড়ে গিয়েছিল; টেনে সবটা ছিঁড়ে ফেলেছেন। খোকাকে তোমার বিছানায় মশারির ভেতর শুইয়ে দিয়েছেন।

অনুকূল একটু শিহরিয়া উঠিয়াই কহিল, আমার বিছানায়? দেখ দিকিন অত্যাচার, নীচে অয়েল-ক্লথটা পেতে দিয়েছে তো?

না, নিজে পাট ক'রে মাথায় দিয়ে শুয়েছেন। বললেন—এটা নিয়ে যেন কেউ টানাটানি না করে, ব'লে দিস; আমার মাথাটা ঠাণ্ডা থাকবে একটু, বড্ড যেন জ্বলছে।

অনুকূল ব্যস্তভাবে মাদুর ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, মুখে ক্রমাগতই—কি গেরো বল দিকিন! না বাপু, ভ্যালা বিপদ তো!

যাইতে যাইতে মেয়েকে প্রশ্ন করিল, আর মিন্তু, সে খেয়েছে?

বাপ উঠিতে মেয়ে সাহস পাইয়া মার বিরুদ্ধে সজোরেই নালিশ করিল, হ্যাঁ, খেয়েছে! মা তেমনই কিনা, একটা থাপ্পড় খেয়েছে, বেচারী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ল।

একটু পরে আবার বলিল, সেও তোমারই বিছানায় শুয়েছে বাবা।

ততক্ষণ নীচে আসিয়াছে। নামিতেই জাপানী দেওয়াল-ঘড়িটা যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া তাহার ভাঙা গলায় গৃহস্বামীকে গৃহস্থালির মধ্যে অভ্যর্থনা করিল।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া অনুকূল সত্রাসে কহিল, বারোটা! আর তোরা দিব্যি নিশ্চিন্দি হয়ে রয়েছিস? জানাতে হয় না আমায়?

ওটা তো ঠিক নেই বাবা। বাঞ্ছা মিস্ত্রী আজই মোটে কলে তেল দিয়ে গেল কিনা। বললে—তেল খেয়েছে, এখন যদি দুদিন একটু জোর চলে তো ঘাবড়ো না মাঠাকরুণ।

অনুকূল বিরক্তভাবে চেঁচাইয়া উঠিল, কে ওর হাতে আবার ঘড়ি দিতে বলেছিল? যত বারণ করি—

'উঃ' করিয়া বিছানা হইতে একটি করুণ শব্দ উঠিল; মালতী আড়-মোড়া ভাঙিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, তোরা আর কানের কাছে চীৎকার হানিস নি সবি। আমায় একটু শান্তিতে মরতে দে, উঃ বাবা!

অনুকূল একবার নিজের শয্যার দিকে এবং ঘরের সাধারণ বিশৃঙ্খলার দিকে চাহিল; তাহার পর আস্তে আস্তে বধূর কাছে গিয়া শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, সত্যি সত্যিই মাথাটা ধরল নাকি? সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুলটা শোধরাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, এ যে সত্যি সত্যিই মাথা ধরেছে দেখছি; আমি ভাবলাম, এক-একবার যেমন—

আরও বেশি রকম ভুল হইয়া যায় দেখিয়া জড়িত জিহ্বায় আমতা

আমতা করিয়া বলিল, দেখছি, এই সামান্যের মধ্যে বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে—

তাহার পর আর সামলাইতে না পারিয়া একেবারে ওদিকটাই ছাড়িয়া দিয়া বলিল, ওডিকলোনটা কোথায় আছে ?

ক্ষীণ কণ্ঠে যতটা আওয়াজ চড়ানো যায়, সে পরিমাণ চীৎকার করিয়া (নেহাত কমও হইল না) মালতী বলিয়া উঠিল, সবি, পোড়ারমুখী, কে তোদের মায়া দেখাতে ডেকেছে লা ? আমার মিথ্যে, আমার সামান্য, বাড়াবাড়ি, আমার আদিখ্যেতো আমার থাক, কে তোদের—আঃ, বাবা গো !

চেঁচামেচিতে খোকা জাগিয়া উঠিল, এবং কাঁদুনির সঙ্গে সঙ্গে বাপের বিছানাটা ভিজাইয়া দিয়া হাত পা ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। মিন্তু জাগিবার পূর্ব্ব-সূচনাস্বরূপ পাশ ফিরিয়া ক্রন্দনের ভঙ্গীতে একবার মুখটা কুঁচকাইয়া সে ঝোঁকটা কাটাইয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

অনুকূল বেচারী নির্ব্বাক আতঙ্কে সবটা দেখিয়া শুনিয়া খানিকটা সেই ভাবেই বসিয়া রহিল। অবস্থাটা এতই অপ্রত্যাশিত, তাহার মনে হইল, যেন হঠাৎ নূতন কোথায় একা আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার মাথার মগজ আলগা হইয়া যেন খুলির মধ্যে ঘোরপাক খাইতে লাগিল। একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া উঠিয়া বলিল, যাই তবে, দেখিগে— বলছিলাম, একটু অডিকলোন লাগালে ভাল হ'ত।

কোন উত্তর পাওয়া গেল না। অনুকূল সেইখানেই একটু দাঁড়াইয়া রহিল ; তাহার পর প্রয়োজনমত সাহস সঞ্চয় করিয়া আবার কহিল, বলছিলাম, ওডিকলোনটা না হয় বের ক'রে—

মালতী কনুইয়ে ভর দিয়া খানিকটা উঠিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, ওগো, না—না—না—না—না, শুনতে পেয়েছ কথাটা এবার ?

অনুকূল আস্তে আস্তে জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সেই প্রশস্ত গঙ্গা—অগাধ জ্যোৎস্না আর মুক্ত বাতাস, উহাদের আত্মশক্তি যেন কূল ছাপাইয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে। উহাদের এই দুই হাতে বিলানো শিক্ষা সে কি কিছুতেই গ্রহণ করিবে না? কেন এই হীনতা? কেন এই অপমান?

মেয়ে সবিতা ধীরে ধীরে আসিয়া গায়ে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, খোকা বড্ড কাঁদছে বাবা, দুধ গরম ক'রে দোব?

অনুকূল মেয়ের মাথাটি সস্নেহে উরুতে চাপিয়া বলিল, কেন, বাবা পারে না বুঝি? তুমি বরং ওকে একটু চুপ করাও গিয়ে।

কোঁচাটা তুলিয়া কোমরে গুঁজিয়া সপৌরুষে কাজে লাগিয়া গেল। উঁচু করিয়া টাঙানো শিকায় দুধের কড়া তোলা ছিল।

সকলেই স্বীকার করিবেন বোধ হয় যে, গৃহস্থালির মধ্যে শিকা হইতে জিনিস নামানোর চেয়ে শক্ত কাজ আর দ্বিতীয়টি নাই, বিশেষ করিয়া একটু বেঁটে লোকের পক্ষে। প্রথমত, আপনি ধরিতে গেলেন, আপনার স্পর্শ পাওয়া মাত্রই শিকাটি পাত্রসমেত সামনে একটু আগাইয়া গেল এবং সেখান হইতে একটি গতিবেগ লইয়া আপনার মাথার উপর দিয়া সাঁ করিয়া গোটা তিন চার দোল খাইয়া গেল। আপনি বুদ্ধিমানের মত সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, আরও একটু বুদ্ধি খরচ করিয়া স্থির করিলেন—না, পাত্রের তলদেশ ধরিতে যাওয়াটা ঠিক হয় নাই, একেবারে শিকার দড়িটা বাগাইয়া ধরিতে হইবে। এবার তাহাই করিলেন, এবং শিকা যেমন পূর্ব্বের মত নিজের ঝোঁকে সামনের দিকে হটিয়া গেল, আপনিও বুদ্ধি করিয়া সঙ্গে সঙ্গে দুই পা আগাইয়া গেলেন, বুদ্ধি করিয়া দড়িটা আর ছাড়িলেন না। কিন্তু ছাড়িলেই যেন আসল বুদ্ধিমানের কাজ হইত, শুধু দড়ি নয়,—দড়ি, পাত্র, এমন কি সে ঘরটা পর্য্যন্ত। সেটা টের

পাইলেন পরে, যখন পাত্রস্থ তরল পদার্থের খানিকটা আপনার মাথার ব্রহ্মতলে পড়িয়া বুকে পিঠে গোটাকতক তীব্র স্রোতের সৃষ্টি করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

আপনি যতক্ষণে আপনার সেই মাথার টিকি হইতে পায়ের নখ পর্য্যন্ত মুছিয়া পরিষ্কার হইবেন, ততক্ষণে নিজের অভিরুচিমত দোল খাওয়া রোধ করিয়া শিকাটি স্বস্থানে সুস্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উঠিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া দেখিলেন, পাত্রটি ঈষৎ নমিত মুখে আপনার দুরবস্থার দিকে চাহিয়া আছে—আপনার বোধ হইল, যেন একটু মিটিমিটি হাসির ভাবও আছে তাহাতে।

এই বিশেষ ক্ষেত্রে অনুকূল দুধ-মোছা গামছাটা মেয়ের হাতে দিয়া খুব সন্তর্পণে কড়াটিকে সিধা করিয়া বসাইল। মেয়ের নিকট লজ্জাটাকে চাপা দিবার জন্য বলিল, একেবারে ছাপাছাপি দুধ ছিল।

মেয়েও বাপকে সপ্রতিভ করিবার জন্য উৎসাহভরে বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ-ই তো; ওথলানো দুধ ছিল বাবা, যেই উথলে উঠেছে, আর মা কড়া নামিয়ে সেই ওথলানো দুধ সুদ্ধু—

বিছানা হইতে একটা কি রকম শব্দ হইল; অনুকূলের মনে হইল, যেন চাপা হাসির; কিন্তু পরক্ষণেই বেশ স্পষ্ট শুনিল—না, যন্ত্রণাজনিত উঃ-আঃ শব্দ মাত্র।

কন্যাকে বলিল, খোকাকে একটু হাওয়ায় নিয়ে যা দিকিন, ডেঁপোমি করতে হবে না।

নামাইবার সময় খুব সাবধান হইয়াছিল; এবার আর দুধ মাথায় পড়িল না, পড়িল নাকের উপর—অল্প একটু; দেখিবারও কেহ সামনে ছিল না। সেটা আর গোঁফের সরটুকু তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিল।

উনানে আগুন আর সামান্যই আছে; সেই একেবারে পেটের মধ্যে;

উপরটা নিবিয়া গিয়াছে। অনুকূল তাতটা দেখিল—দুধটা গরম হইয়া যাইতে পারে ; যদি একটা বুদ্ধি করা যায়—

অনুকূল একটা চিমটা লইয়া উপরের নিবানো কয়লাগুলি এক-একটি করিয়া অতি ধীরে ধীরে বাহিরে ফেলিতে লাগিল। এ আর এক বিপদ—এত নিবানো কয়লা যে উনানের মধ্যে ছিল, আগে তাহা জানা যায় নাই। যখন প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে, অনুকূল লক্ষ্য করিয়া দেখিল, একটি কয়লা তুলিলেই তাহার নীচের আধজ্বলন্ত রাঙা কয়লাটি মলিন হইয়া যাইতেছে। তখন নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়া এক-একখানি করিয়া তপ্ত কয়লাগুলি উনানে আবার তুলিয়া রাখিতে লাগিল।

কয়েকখানি রাখিবার পর হু—স করিয়া একটা শব্দের সঙ্গে সমস্ত উনানের কয়লাগুলি একেবারে গহ্বরে নামিয়া গিয়া খানিকটা আলগা ছাই সজোরে বাহির হইয়া আসিল।

সবিতা আসিয়া বলিল, বাবা, খোকা যে কোনমতেই—

অনুকূল ধমক দিয়া বলিল, আঃ, যা না একটু বাইরে, সবাই একসঙ্গে ভিড় ক'রে দাঁড়ালে—দেশলাইটা কোথায় ?

দেশলাই-খোঁজা পর্ব্ব শেষ হইলে, কাগজ পোড়াইয়া এবং ঘরময় ছড়াইয়া যখন দুধজ্বাল সারা হইল, তখন জাপানী ঘড়িটার মতে একটা। সবি বেচারী ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অনুকূল বাটিতে দুধ ঢালিয়া জুড়াইয়া, খোকাকে বিছানা হইতে তুলিয়া আনিতে গেল, নিজের কৃতকার্য্যতায় মনটা একটু প্রসন্ন হইয়াছে। এস, বাবা এস।—বলিয়া পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইল। খোকা কোলে উঠিয়া মুখটা একটু সরাইয়া লইয়া পিতাকে নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর হঠাৎ এমন ডুকরাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল যে, একসঙ্গে সবিতা ও তাহার মা

ধড়মড়িয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। সবিতা ভীত অসহায় ভাবে বলিয়া উঠিল, বাবা, ও বাবা, বাবা গো!

তাহার মা স্বামীকে কিছু না বলিয়া মেয়েকে ধমকাইয়া বলিল, ভয় করছে! কেন, একটা আরশি এনে দিতে পার না ততক্ষণ? দেখে আক্কেল হয়—এই ঠিক দুপুর রাত্তিরে, নাঃ, পোড়া সংসারে ম'লেও সোয়াস্তি নেই—

আবার কপাল টিপিয়া শুইয়া পড়িল।

খোকার মিন্তুর কান্না চলিয়াছে পর্দ্দার পর পর্দ্দা চড়াইয়া, মাঝে মাঝে বাপের পানে চায় আর বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়ে। আর সবির সেই ভীত অনুযোগ।

অনুকূল নিজেই আরশিটা লইয়া আলোর কাছে দাঁড়াইল। ডুকরাইয়া উঠার আর দোষ কি? উনানের কয়লা ধসিয়া যে ছাইটা উঠিয়াছিল, সমস্ত তাহার মাথায় আর মুখে; যেখানটায় ছাই নাই, সেখানটায় আছে কড়ার তলার কালি, সমস্ত মুখটি সাদা-কালোর একটা দাবার ছক হইয়া উঠিয়াছে, আরশির মধ্যে কে অন্য একজন যেন অনধিকার-প্রবেশ করিয়া বসিয়াছে!

অনুকূলের মনে হইল, আরশি আছড়াইয়া, দুধ টান মারিয়া ফেলিয়া ছেলেমেয়েগুলাকে ঘা কতক বসাইয়া দিয়া শুইয়া পড়ে, কিংবা দেশত্যাগী হয়; দেশত্যাগী হইবার ইচ্ছাটাই উৎকট হইয়া উঠিল, কারণ তাহাতে মালতীর মুখ আর দেখিতে হয় না।

অনেক কষ্টে নিজকে সংযত করিয়া সাবান দিয়া মুখটা ধুইয়া ফেলিল। তাহার পর যেন মরিয়া হইয়া লাগিয়া গেল। ইতিমধ্যে মিন্তু খোকা মায়ের জন্য বায়না ধরিয়াছে, এবং তাহাদের মায়ের মমতার উদ্রেক না হইয়া শুধু মাথার যন্ত্রণা বাড়িয়া গিয়াছে।

অনুকূল ছেলে দুইটাকে এক-একটা করিয়া চড় কষাইয়া আরও কাঁদাইয়া তুলিল, এবং সেই অবস্থাতেই দুধ গিলাইয়া বিছানায় ছাড়িয়া দিল।

মেয়েকে ভাত বাড়িয়া খাওয়াইল। প্রথমে ভাবিল, নিজে উপবাস করিয়া থাকিবে, ওর রাঁধা আর নয়, এবার থেকে একেবারে স্বপাক। তাহার পর, আবার পৃথিবীর কাহাকেও গ্রাহ্য না করায় স্থির করিল, বরং অন্য দিনের চেয়ে বেশি করিয়া খাইবে। কার্য্যত দুইটা দিকই বজায় রহিল, অনেক ভাত লইয়া বসিলও, আবার তরকারির অবস্থা দেখিয়া দুই-তিন গ্রাসের পর উঠিয়াও পড়িল।

জাপানী ঘড়ির দুইটার সময় যখন মশারি তুলিয়া বিছানায় প্রবেশ করিল, তখন মাত্র মেয়েটি জাগিয়া আছে। বিছানায় খানিকটা জোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে, বাপকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সবিতা একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিল, কেমন চমৎকার জোচ্ছনা বাবা!

বাবা বলিল, আর বক্তিমে করতে হবে না, সবাই ঘুমুল আর তোমার পোড়া চোখে বুঝি ঘুম নেই?

শেষরাত্রে অনুকূল স্বপ্ন দেখিতেছিল, ওপারের কলের মালিক গলার শিরা ফুলাইয়া দেশসুদ্ধ আবালবৃদ্ধবনিতা সবাইকে টাকা কামাইবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে উৎসাহিত করিতেছে, আর এমনই বক্তৃতার জোর যে, সবচেয়ে অপারক যারা, সেই শিশুবৃন্দ পর্য্যন্ত, যেন একেবারে মাতিয়া উঠিয়াছে।

ঘুমটা ভাঙিয়া গিয়া দেখিল, সে সব কিছু নয়, ওপারের কলে সাড়ে চারিটার ভোঁ বাজিতেছে, আর কানের কাছে মিন্তু আর খোকা পরিত্রাহি কান্না জুড়িয়া দিয়াছে।

রাত্রের অনিয়ম-অত্যাচারে তাহার নিজের মাথা ধরিয়াছে। একটু আচ্ছন্নভাবে সে পড়িয়া রহিল। দিনটা কি ভাবে কাটিবে? কাচ্চা-বাচ্চা, রেলগাড়ি, আপিস, রান্নাঘর,—সমস্ত একটার জগা-খিচুড়ি গোছের ছবি তাহার মনটাকে অভিভূত করিয়া দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া অনুকূল একবার বধূর দিকে চাহিল—স্বাস্থ্যপূর্ণ প্রগাঢ় নিদ্রার তৃপ্তি মুখখানাতে মাখানো।

অনুকূল সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করিয়া লইল। এই তোমার মাথা-ধরা! তবে দেখ, প্রকৃত যাহার মাথা ধরিয়াছে, সে কি ভাবে কাজ করে।

তবে মালতীর জাগ্রত দৃষ্টির সামনে তাহার পৌরুষটা দেখানো চাই। ছেলে দুইটাকে খুব জোরে ধমক দিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, কেন রাত থেকে 'ম্যা—ম্যা' ক'রে চেল্লাতে শুরু করেছিস? আর কেউ নেই?

বিছানা হইতে নামিয়া, মশারি গুটাইয়া মিন্তুর হাতটা ধরিয়া নামাইল। মালতী জাগিয়া উঠিয়াছিল; রাত্রের সেই ক্ষীণ আওয়াজটা টানিয়া আনিয়া বলিল, সবি, বল্ গিয়ে নিজেকে সামলাক; দিনের বেলায় অত মন্দাত্তি খাটবে না; আমি মরতে মরতে সেরে নিচ্ছি।

সবি, বল্, মন্দর মন্দাত্তি সব সময়ই খাটবে।—বলিয়া অনুকূল খোকাকে একটা ঝাঁকানি দিয়া নীচে নামাইল, তাহার পর সবিতাকে তুলিয়া বলিল, যা, দুটোকে বাইরে নিয়ে যা।

মালতী শুইয়া পড়িয়া বলিল, ভাঙে তো মচকায় না; আচ্ছা, বেশ।

অনুকূল যতক্ষণে স্নান-আহ্নিক সারিয়া উঠিল, ততক্ষণে ঝি আসিয়া পড়িয়াছে। স্ত্রীসুলভ ক্ষিপ্রতার সহিত সে উনান ধরাইয়া রান্নাবান্নার গোছ করিয়া দিল; সে সবগুলাকে পুরুষসুলভ নিপুণতার সহিত অগোছ করিয়া অনুকূল যখন রন্ধনকার্য্য সমাধা করিল, তখন আটটা ছত্রিশ কোন্ কালে হইয়া গিয়াছে। হরিশ হাঁক দিয়া গেল, কই হে, আছ, না গেছ?

একদফা কাজ শেষ হওয়ায় অনুকূলের মনটা একটু হালকা ছিল; ইয়ারকি করিয়া বলিল, এই খাবি খাচ্ছি, দেরি নেই; তুমি এগোও।

ঝিকে বলিল, উঃ, নটা পনরোয় হরিশ মিত্তির বেরিয়ে গেল, শিগগির ঠাঁই ক'রে দাও। আমি চট ক'রে জামা কাপড় প'রে নিই ততক্ষণ। আজ দিন বুঝে ধোপা ব্যাটাও কাপড় দিয়ে গেল, এখনও মেলানো হয় নি।

কাপড় ধরিয়া ফতুয়া গায়ে তুলিয়াছে, ঝি আসিয়া বলিল, ঠাঁই হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি ফতুয়ায় হাত দুইটা গলাইতে গলাইতে অনুকূল বকিতে বকিতে ছুটিল, ইস, এত কড়া ক'রে ফেলেছে। যত বলি, কড়া ইস্তিরি করিস নি—

বোতাম দেওয়ার পূর্ব্বেই ভাত বাড়িতে বসিয়া গেল। ঝি হঠাৎ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল এবং মিনিট-খানেক পরেই পাশের ঘরে যেন চাপা হাসির শব্দ শোনা গেল। মালতী কন্যাকে ডাকিয়া বলিল, সবি, ব'লে দে, যদি ব্লাউজ প'রে রান্নাবান্না করবার শখ হয়ে থাকে তো একটা তোয়ের করিয়ে নিতে; আমারটা ছেড়ে দিক এক্ষুনি; আর ওটা আমার শাড়ি, পাড়টা ফিকে হয়ে গেছে ব'লে ধুতি হয়ে যায় নি যে প'রে ব'সে আছে।

অনুকূল খাইতে শুরু করিয়া দিয়াছিল; ঘাড় নীচু করিয়া দেখিল, তাহার মেটে রঙের ফতুয়া গায়ে দেয় নাই, এটা মালতীর গোলাপী রঙের ব্লাউজটাই, আর এ নরুনপাড়ের ধুতি কোথায়!—মেয়ে আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই দুই-চার গ্রাস নাকে মুখে পুরিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

ওইটুকুর মধ্যেই ঘামিয়া উঠায় ব্লাউজের পাতলা কাপড় গায়ে সাঁটিয়া গিয়াছে, তাহার উপর সেই রকম আঁট; খুলিতে প্রায় পাঁচ মিনিট গেল।

নয়টা পনরোর গাড়ি ধরিতেই হইবে, কারণ তাহার পরেই নয়টা পঞ্চান্ন; সেটা আবার থ্রু প্যাসেঞ্জার, আকছারই লেট থাকে, আবার লিলুয়াতে পনরো মিনিট দাঁড়ায়।

কোন রকমে জুতাটা পায়ে দিয়া আর কামিজ ও চাঁদরটা কাঁধে ফেলিয়া অনুকূল এক রকম ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেল।

অর্দ্ধেক রাস্তা হইতে আবার ছুটিয়াই ফিরিল, প্রায় উর্দ্ধশ্বাসে ;—মান্থ্লি টিকিটটা ধোপের ছাড়া জামার পকেট হইতে বাহির করিয়া লওয়া হয় নাই। স্টেশনে যখন পৌঁছিল, তখন গার্ডের গাড়ির পেছনের লালটা দূরে দেখা যাইতেছে, বিদ্রূপের হাসির মত।

অনুকূল হতাশভাবে একখানি বেঞ্চে বসিয়া পড়িল। মনটা একবার আপিস হইতে ঘুরিয়া আসিল, সেখানে বড়বাবুর খোঁচা খোঁচা গোঁফগুলা শজারুর কাঁটার মত সিধা হইয়া উঠিয়াছে।

যাক, আর উপায় কি!—বলিয়া অনুকূল চাদরটা বেঞ্চের উপর রাখিয়া কামিজটা চড়াইয়া লইল।

ওপারের প্ল্যাটফরমে বেঞ্চের সমস্তটা দখল করিয়া একটি কাবুলী লম্বা চওড়া হইয়া শুইয়া নিদ্রা দিতেছিল। তাহার নিদ্রার কোনরূপ ব্যাঘাত না হয় এইরূপ দূরে থাকিয়া একজন লোক হাত পা নাড়িয়া চোখ পাকাইয়া তাহার এই অন্যায়ের আলোচনা করিতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া অনুকূল অন্যমনস্কভাবে কামিজের বোতাম দেওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিল।

যখন কোনমতেই আর বোতাম লাগে না, তখন অনুকূলের নজর কাবুলীঘটিত ব্যাপার হইতে কামিজের দিকে ফিরিয়া আসিল। দেখিল, কামিজে বোতাম নাই বলিয়া লাগিতেছে না। কড়া ইস্ত্রি দেওয়া কামিজটা মুক্তির আনন্দে যেন হাত পা ছড়াইয়া দিয়াছে।

রাগটা বউয়ের উপর হইল, কি নিজের উপর হইল, কি কলের মালিকের উপর হইল, ভাবিয়া দেখিবার সময় ছিল না। এভাবে তো যাওয়া যায় না। আবার বাড়িতে ছোটা ভিন্ন উপায় নাই। উঠিতেই দূরে ডাউন লাইনের পাখাটা ঘাড় হেঁট করিল। একটা হিন্দুস্থানী কুলী বলিল, পাগলা গাড়ি হ্যায়, কভি এক ঘণ্টা লেট আতা হ্যায়, আজ দশ মিনিট পাহলেহি আ গিয়া।

৪

দশটার সময় আপিস। বারোটা বাজিতে যখন পঁচিশ মিনিট বাকি, অনুকূল অপরাধীর মত সঙ্কুচিতভাবে নিজের টেবিলে আসিয়া বসিল। বড়বাবুর পিয়ন পরম শ্রদ্ধার সহিত একটি সেলাম ঠুকিয়া একটি স্লিপ দিল—বড়বাবুর তলব।

অনুকূল গিয়া যখন কামরায় দাঁড়াইল, বড়বাবু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তখন একটা গার্ডেন-পার্টির নিমন্ত্রণ-কার্ড দেখিতেছিলেন। অনুকূলের দিকে না চাহিয়াই বাঁ হাতটা বাড়াইয়া দিলেন। বলিলেন, দিন, সইগুলো সেরে দিই। আজ আবার এই গার্ডেন-পার্টির হাঙ্গাম আছে, ভালও লাগে না।

অনুকূল একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর মৃদুস্বরে বলিল, টোটালগুলো একটু বাকি আছে, এক্ষুনি সেরে নিয়ে আসছি।

বড়বাবু আশ্চর্য্য হইয়া মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এই দু ঘণ্টার মধ্যে টোটাল করা হ'ল না!

রাগে অপমানে কথা বাহির হইতে চাহে না; অনেক কষ্টে অনুকূল কহিল, আজ্ঞে, আজ একটু দেরি—

দু-চার মিনিট দেরি তো সবারই হতে পারে অনুকূলবাবু ; আমারই আজ সা—ত মিনিট দেরি হয়ে গেল ; কিন্তু তাতে কি কাজ আটকায় ?

অনুকূল কথাটাকে যেন ধাক্কা দিয়া গলা হইতে বাহির করিল, আজ্ঞে, একটু বেশি দেরি হয়ে গেছে আজ, এই আসছি।

এই আসছি! এখন যে বারোটা অনুকূলবাবু! না, আপনি ঠাট্টা করছেন ভাল লোক পেয়ে।

অনুকূল মাথা নীচু করিয়া রহিল।

বড়বাবু তখন ধীর কণ্ঠে প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, সাহেব আমায় এসে পর্য্যন্ত তিনবার তাগাদা করেছে অনুকূলবাবু। একটু খাতির করে ; অনেক কষ্টে ঠাণ্ডা ক'রে রেখেছি। কি জানেন ? ওরা আমাদের বিয়ে করা, ওর নাম কি, ইয়ে তো নয়, কাজ চায়। এই আজ কবার বললে, না বাবু, ও ফার্স্ট ক্লাস এম. এ.র কর্ম্ম নয়, বোধ হয় তোমার আমার মত মুখ্যুদের সম্বন্ধে শেক্স্পীয়ার কি লিখে গেছে, সেই নিয়ে রিসার্চ করতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। তার চেয়ে বরং তুমি তোমার সেই ব্রাদার-ইন-লটিকে নিয়ে নাও। জেদাজেদি, আমি বললাম, আচ্ছা, দেখি আর একবার বুঝিয়ে-সুঝিয়ে।

অনুকূলের একবার মনে হইল, বলে, ফার্স্ট ক্লাস এম. এ.র বদলে যদি আপনাদের ফার্স্ট ক্লাস রোগ-এর দরকার হয় তো তাই রাখুন। কিন্তু রাত্রের জ্যোৎস্নার প্রক্রিয়াটা অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল ; খোদ বড়-বাবুকেও না হয় এই রোখের মাথায় দুই-একটা কথা বলা যাইত ; কিন্তু বড়বাবুর শালাকে লইয়া বিদ্রূপ করিবার সাহস হইল না। তাহা ছাড়া সে কয়দিন ধরিয়া আপিসে ঘুর-ঘুর করিতেছে, কাহার চেয়ারের উপর এই শ্যালকবপুখানির শুভাধিষ্ঠান হইবে, তাহা লইয়া কেরানীমহলে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল।

আস্তে আস্তে চলিয়া আসিতেছিল; দুয়ার পর্য্যন্ত আসিলে বড়বাবু বলিলেন, হ্যাঁ, আর এক কথা; আমি আজকে পুরো আপিস করতে পারব না, দেখছেনই তো, এক ফ্যাসাদ এসে জুটেছে। আমার এই কাগজগুলো আপনাদের মধ্যেই চারিয়ে নিয়ে শেষ করতে হবে; কাল আবার মেল ডে। ভেবেছিলাম, আমার ব্রাদার-ইন-লকে দিয়ে খাটিয়ে নোব, সে যে রকম ইণ্টেলিজেণ্ট, তার এ ঘণ্টাখানেকের ওয়াস্তা; কিন্তু তাতে আবার কারুর কারুর অভিমান হয়। সেদিন শুনলেন তো নরেশ-বাবুর কথা? আমরা কি ম'রে গেছি বড়বাবু যে, ওই দুধের ছেলেকে নাহক কলম পিষিয়ে মারছেন? কাজ কি বাপু!

আপিস যাইতে যতটা দেরি হইয়া গিয়াছিল, ফিরিতে তাহার অনুপাতে আরও দেরি হইয়া গেল। স্টেশনে যখন নামিল, তখন রাত আটটা। সেই চাঁদটা অনেকখানি উঠিয়াছে, দেখিলে পিত্ত জ্বলিয়া যায়, কি আবার নূতন ফ্যাসাদ বাধাইবে!

বাড়ি ঢুকিবার পূর্ব্বেই সবিতা আসিয়া আনন্দে অধীর হইয়া জড়াইয়া ধরিয়া খবর দিল, বাবা বাবা, কেমন দিদিমা এসেছেন! আহা, অন্যের কাঁধে হাত দিয়ে চলতে হয়, তবুও তো মেয়ে বাবা! অসুখ শুনে কি থাকতে পারেন? আমি যেমন মার মেয়ে, মাও তো তেমনই।

প্রস্তরবৎ নিশ্চল হইয়া অনুকূল হতাশভাবে বলিল, দিদিমা! কখন এলেন তোর দিদিমা? তিনি তো আবার রাত্রিতে দেখতেও পান না আজকাল, আর একেবারে বদ্ধ কালা যে!

না বাবা, আহা, তবুও তো পেটের মেয়ে! বলছিলেন, ঝি গিয়ে যখন বললে, মালতী কাল থেকে উঠতে পারছে না, আর বুঝি এ যাত্রা—

ঝি! আঃ, দেখ দিকিন নষ্টামি! কে তাকে গিয়ে সেখানে খবর দিতে বললে? কালই তাকে বিদেয় ক'রে—

মা বুদ্ধি ক'রে বলেছিলেন বাবা। দিদিমাকে বলছিলেন, যখন দেখলাম, বড্ডই বাড়াবাড়ি হচ্ছে—ঝিকে বললাম, মাকে একটু খবর দে; আর দেখতে পাব কি না!

অনুকূল হাঁকিল, ঝি!

সবিতা বলিল, ঝি তো নেই। মা বললেন, ঝি, তুই এই টানা-পোড়েন করতে বড় হাক্লান্ত হয়ে গেছিস, বাড়ি যা জল-টল তুলে রেখে। সে এসে একটা দিন চালিয়ে নেবে 'খন, সাজোয়ান পুরুষ মানুষ, কাল আবার তোকে বভিবাটি ছুটতে হবে।

বভিবাটি! অনুকূল আতঙ্কে এক রকম চীৎকার করিয়া উঠিল। সেখানে তাহার পিসশাশুড়ী আর পিসশ্বশুর থাকে। ঘরদুয়ার বেচিয়া বৃদ্ধবয়সে বৈদ্যবাটিতে আসিয়া গঙ্গাবাসী হইয়াছে। প্রবল শুচিবেয়ে দম্পতি। একবার আসিয়াছিল, আড়াই মাস ধরিয়া প্রতিদিন তৈজসপত্র হইতে ধোপার বাড়ির কাপড় জামা পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিস বাঁকে করিয়া জল আনাইয়া বর্ষার গঙ্গাজলে ধোওয়া হইত। যাইবার সময় ভাইঝিকে সান্ত্বনা দিয়া গিয়াছিল, তোদের কেরেস্তানি কাণ্ডের মধ্যে দুদিনও থাকতে পারলাম না মা, তা দুঃখু করিস নি। গঙ্গার কাছে-পিঠে একটা বাসা নে; যদ্দিন বলিস, থাকব 'খন।

সে সব কথা ভুলিয়া আবার গঙ্গার কাছেই বাসা লওয়া হইয়াছে!

অনুকূল ঘরে প্রবেশ করিয়া জুতা-জোড়াটা টান মারিয়া এক কোণে ফেলিয়া দিল, কামিজটা তাহার উল্টা দিকে জ্বলন্ত প্রদীপের উপর পড়িয়া সেটাকে নিবাইয়া দিল; সে নিজে অন্ধকার ঘরের মধ্যে ততোধিক অন্ধকার মন লইয়া, বিছানার উপর হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। সবিকে হাঁকিয়া বলিল, দেখ্ সবি, তোরা যা ইচ্ছে তাই কর্, আমি আর তোদের সংসারের মধ্যে নেই; কিন্তু আমায় যদি কেউ জাগাবি তো

হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে দোব, আমি ম'রে প'চে গ'লে থাকি, কারুর দেখবার দরকার নেই, তোদের সংসারে তোরা যা ইচ্ছে তাই কর্‌গে।

তাহার পর বৈদ্যবাটির কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় যা-ইচ্ছা করার একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া অত্যন্ত দরকারী ভাবিয়া বলিল, কিন্তু যদি ঝি কাল বদ্যিবাটি যায় তো, আমি দেশত্যাগী হব, এই ব'লে রাখলাম।

* * *

বাড়ির সময়টা জাপানী ঘড়ির চার্জে, সুতরাং রাত্রি কত হইয়াছে ঠিক বলা যায় না; তবে চারিদিক অনেকটা নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে।

অনুকূলের ঘুমটা ভাঙিয়া যাইতে তাহার কপাল হইতে একটি কোমল হাত সরিয়া গেল। পাশে চাহিয়া একটু আশ্চর্য্য হইল বটে, কিন্তু অভিমানেই হউক, আর যে জন্যই হউক, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হাঁকিল, সবি, উনুন জ্বালার যোগাড় ক'রে রেখেছিস?

সেই নরম হস্তটি আবার কপালে আসিয়া সঞ্চারিত হইতে লাগিল এবং নরম গলায় মিষ্ট অনুরোধ হইল, খাবার তৈরি আছে, ওঠ, খাবে চল।

না, আমার হাত পা আছে।—বলিয়া বেশ দৃঢ়তার সহিত অনুকূল উদ্যোগী হইয়া উঠিয়া বসিল।

একটু চুপচাপ; তাহার পর সেই নরম গলায় বেশ কড়া হুকুম হইল, আমার রান্নাঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশের অধিকার নেই।

অনুকূল উঠিতে যাইতেছিল, আবার বসিয়া পড়িয়া বক্ত্রীর মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিল; নিজের কান দুইটাকে যেন বিশ্বাস করা যায় না। ভ্রূজোড়া কপালে তুলিয়া বলিল, তোমার রান্নাঘর! বিনা অনুমতি! আর আমি? আচ্ছা, বেশ, কাঁচা চাল তো আছে।

আবার ঠেলিয়া উঠিল। রান্নাঘরের মালিক আপনার অসপত্ন অধিকারের সীমাটা বাড়াইয়া হুকুম করিল, আমার ভাঁড়ারঘর থেকে চাল নেবারও কারুর অধিকার নেই।

অনুকূলের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; স্ত্রীরও বৃথা বাক্যব্যয় করা দরকার ছিল না। দুইজনে যেন দুইটি নীরব প্রশ্ন আর নীরব উত্তরের মূর্ত্তি ধরিয়া পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল।

অনুকূল ব্যাপার বেশ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না; হাল ছাড়িয়া বলিল, বেশ, উপোস ক'রে মরব, সে অধিকার তো আছে?—বলিয়া শুইয়া পড়িতে যাইতেছিল, তাহাতেও বাধা দিয়া বধূ বলিল, আমার বাড়িতে সেটা আরও হতে পারে না, অকল্যাণ হবে, একে তো মাথার ব্যথা ধ'রেই আছে। অকল্যাণে অকল্যাণে—

হাসি সামলাইতে পারিল না। স্বামীরও ঠোঁটে সে হাসির একটু ছোঁয়াচ লাগিল। দুইজনের হাসির এই শুভ্র পতাকায় যে শান্তির সূচনাটুকু পাওয়া গেল, সেটাকে প্রত্যাখ্যান করিবার প্রবৃত্তি কিংবা উৎসাহ অনুকূলের আর ছিলই না; তাই তাহার সেই যে মহাদম্ভের কাল্পনিক উচ্চপদ, যাহা আসলে রাঁধুনীর পদেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেটাতে ইস্তফা দিয়া অনুকূল চব্বিশ ঘণ্টা আগেকার পুরাতন, বাধ্য কেরানী স্বামীটির মত উঠিয়া বসিল।

আহারে বসিয়া বলিল, সামনের জানলা বন্ধ ক'রে দাও তো, চাঁদটা চোখে ঠিকরে পড়ছে।

মিছে নয়, যেন ড্যাবড্যাব করছে বাপু; এর চেয়ে যখন একটা ফালির মত থাকে, সেই ভাল।—বলিয়া স্ত্রী তাহাদের পুনর্মিলনের আসর হইতে যত ফ্যাসাদের মূল সেই পূর্ণচন্দ্রকে বাহির করিয়া দিয়া পাখা হাতে স্বামীকে আহার করাইতে বসিয়া গেল।

রংলাল

১

অনেক কাঠ-খড় পোড়াইয়া সুদূর মিথিলায় একটি চাকরি জুটিল। মনিব একজন কুঠিয়াল সাহেব।

ভাবিলাম, না, এ ধুতি-চাদরের কর্ম্ম নয়, হ্যাট-কোট সিগারেট-চুরুটে জায়গাটাতে প্রথম হইতে জাঁকিয়া বসিতে হইবে, ওদিকে এখনও এসবের কদর আছে শোনা যায়। স্ত্রী সুট্‌কেসে একজোড়া ধুতি দিতেছিলেন, প্রবলভাবে নিবারণ করিয়া বলিলাম, না না, ওসব বাতিল; আমার জীবন থেকে ও যুগই চ'লে গেছে ব'লে জেনো।

স্ত্রী বলিলেন, বুঝি না বাপু, কি মন্দ যুগটাই ছিল এমন?

বলিলাম, আমি তাকে সত্য ত্রেতা যুগ ব'লে মেনে নিতেও রাজি আছি, পবিত্র খদ্দর, দায়িত্বহীন জীবন, অর্থমনর্থমের বালাই নেই; কিন্তু আপাতত পায়জামা, স্লীপিং সুট আর হাফ-শার্ট দিতে যেন ভুলো না; পাইপ দুটো দেওয়া হয়েছে তো? গেলিসটা?

টাইয়ে গেরো কষিয়া হ্যাটটা মাথায় চাপাইয়া লইলাম। চাকর আসিয়া খবর দিল, ট্যাক্সি হাজির।

গন্তব্য স্টেশনে ট্রেন পৌঁছিল পরের দিন প্রায় তিনটার সময়। গেটের কাছে বৃদ্ধ স্টেশন-মাস্টার, আগে একটি সেলাম করিয়া টিকিটের জন্য হাত পাতিলেন, তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়া বাহিরে আসিলাম।

এইখানে আমার সম্ভ্রমে প্রথম আঘাত লাগিল। চিঠিটা বোধ হয় সময়ে পৌঁছায় নাই, কুঠির দিক হইতে কোন রকম যানবাহনের বন্দোবস্ত নাই। একটি মাত্র ভাড়াটে একা একটি বাদামগাছতলায় দাঁড়াইয়া আছে। চালক বোধ হয় আমায় দেখিয়াই, তাহার কঙ্কালসার

ঘোড়াটাকে সাধ্যমত আমার হ্যাট-কোটের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য প্রবলবেগে ডলাই-মলাই শুরু করিয়া দিয়াছে। কঞ্চি আর ধনুকাকৃতি বাঁশের গাড়ি, স্প্রিঙের নামগন্ধ নাই, ফুট তিনেক উঁচু, গজ দুয়েক লম্বা। মনটা দমিয়া গেলেও উপায়ান্তর না দেখিয়া সেইটাই ভাড়া করা গেল। 'একমান' শুকনা ঘাসের উপর একটা ছিন্ন মলিন চট বিছাইয়া গদ্গদ হইয়া বলিল, বইঠল যাও, অর্থাৎ বসিতে আজ্ঞা হোক।

সন্দিগ্ধভাবে একবার প্রশ্ন করিলাম, কুঠি যেতে হবে ; পারবে তো ?

আধ ঘণ্টার বেশি লাগবে না। বুঝতেই পারবেন না, মোটরে ব'সে আছি, কি এক্কায়।—বলিয়া গদির নীচে আরও দুইটি ঘাস দিয়া উপর হইতে ঠুকিয়া-ঠাকিয়া দিল। ঘোড়ার পিঠে একটা চাপড় মারিয়া বলিল, চল্, নয়া বড়াবাবুর কাছে বকশিশ মিলবে।

একটু রুক্ষস্বরে কহিলাম, বড়াবাবু নেহি, ছোটা সাহেব কহো।

পাঁচটা নাগাদ এক্কা আসিয়া বাসার সামনে দাঁড়াইল। দেখিলাম, এটি আমার সাহেবত্বের দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক। ছেঁচা বেড়ার ঘর, খড়ের ছাউনির উপর কুমড়াগাছে ভরিয়া গিয়াছে ; বেড়ায় ঝিঙে। সামনে একটা চাতালের উপর তুলসীগাছ, তাহার গোড়ায় একটা ভাঙা টবে মনসা। আমার পূর্ব্ববতন 'বড়াবাবু' মহিম রায় বাড়িটাকে এমন মারাত্মক রকম বাঙালী-মার্কা করিয়া গিয়াছেন যে, এখানে টুপি-প্যাণ্টালুনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা একটা রীতিমত সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় বুঝি।

এক্কার চারিদিকে শীঘ্রই একটু ভিড় জমিয়া গেল—কুঠির দুই-একজন আমলা, দুই-তিনটা পিওন, গ্রামের ইতর-ভদ্র কয়েকজন লোক। আমি বেশ একটু অস্বস্তিতে পড়িয়া গেলাম। মনে হইল, যেন এই জীর্ণ এক্কা-গাড়ি আর সামনের ওই বাড়ি—এই দুইটাতে চক্রান্ত করিয়া আমার পোশাকসুদ্ধ আমাকে সকলের সামনে পরম দ্রষ্টব্যরূপে তুলিয়া ধরিয়াছে।

সকলের লম্বা সেলাম আর নির্ব্বাক সশ্রদ্ধ ভাবটাতে মনের সঙ্কোচটা একটু কাটাইয়া নামিতে যাইব, এমন সময় একটা বেশ বলিষ্ঠ গোছের দেশী কুকুর সবার পায়ের মধ্য হইতে সামান্য একটু আগাইয়া আসিয়া ঠিক আমার সামনেটিতে মুখ উঁচু করিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত শরীরটা রাঙা, ডান চোখের চারিদিকে একটা গোল সাদা দাগ, এক দিকের কানটা খাড়া, অন্য দিকেরটা ঝোলা, দেখিতে হইয়াছে, যেন একটি মাত্র চশমা-পরা একটা অতি বখাটে ছোকরা তাহার টুপিটা লক্ষ্ণৌয়ী কায়দায় বাঁকা করিয়া পরিয়াছে। দাঁড়াইয়া, যে দিকের কানটা খাড়া, সেই দিকের ঘাড়টা অল্প একটু উঁচু করিয়া পরম অভিনিবেশের সহিত আমায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অন্য কুকুর হইলে বোধ হয় ডাকিয়া পাড়া মাথায় করিত, এ একেবারে সে দিক দিয়াও গেল না, শুধু একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল মাত্র।

হোক কুকুর, কিন্তু ভাবটা এতই মানুষের অনুরূপ যে, আমি সেলামে সমীহে যে সঙ্কোচটা কাটাইয়া উঠিতেছিলাম, তাহা হঠাৎ দ্বিগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়া আমায় একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। মনে হইল, যেন হ্যাট-কোটধারী কালা সাহেব আমি সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া শেষ পর্য্যন্ত এক মহা বিচক্ষণ সমালোচকের হাতে পড়িয়া গিয়াছি। আর সকলে সম্মান করুক, কিন্তু এই একটি জীব ততক্ষণ আমার অপরূপত্বটুকু সমস্ত অন্তর দিয়া উপভোগ করিয়া লইতেছে।

নামিতে গিয়া পায়ে প্যাণ্টালুন আটকাইয়া একটু পড়-পড় হইলাম। কয়েকজন ব্যস্তভাবে আগাইয়া আসিল, কুকুরটা এক পা পিছাইয়া গিয়া মুখটা অন্য দিকে ফিরাইয়া লইয়া হুফ করিয়া একটা হ্রস্ব আওয়াজ করিল। স্পষ্ট যেন বলিল, হুঁ, এই তো সাহেব, তার আবার—! যদি কথা কহিয়া বলিত, এর চেয়ে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না।

একমানটাকে আনা পাঁচেক ভাড়া দিলেই যথেষ্ট হইত, একটা টাকা

বাহির করিয়া দিলাম। কেন দিলাম যে স্পষ্ট বলিতে পারি না, তবে ওই বেয়াড়া কুকুরটার কাছে সাহেবী চালটা বজায় রাখা নিতান্ত দরকার, বোধ হয় আবছা আবছা এই রকম একটা কথা মনে হইয়াছিল।

একমান একেবারে তিন-চারটা সেলাম করিয়া অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইল। চারিদিকের মৃদু গুঞ্জনে বুঝিলাম, আর সবার কাছেও সাহেবিয়ানাটা দ্রুত অনুমোদিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু কুকুরটা কোথায়—যাহার জন্য এত? দেখি, ভিড় হইতে সরিয়া কয়েক গজ দূরে, একমানটা যেখানে একটা ইটের উপর টাকাটা বারংবার বাজাইয়া যাচাই করিতেছে, কুকুরটা পাশে জুটিয়া উঁচু কানের দিকে মাথাটা ঈষৎ তুলিয়া সেই রকম স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছে। মুখে হাসি। অন্য কুকুর হইলে বলা চলিত, জিভ বাহির করিয়া মাথা দুলাইয়া একটু একটু হাঁপাইতেছে, কিন্তু এর সম্বন্ধে আর আমার সন্দেহ রহিল না যে, ওটা কুটিল হাসি—অর্থ হইতেছে, কেমন হে, ঠিক আছে তো? বোকারামকে খুব ঠকানো গেল, হিঃ—হিঃ—

স্বীকার করি, আমার মনের ভুল; কিন্তু তখন এর চেয়ে সরল সত্য সেখানে আর কিছু ছিল না।

২

বাসায় আসিয়া উঠিলাম। উঠানের মাঝখানে একটা চট-মোড়া তেলচিটে ডেক-চেয়ার, দেখিয়াই মনে হইল, মহিমবাবু ইহাতে আট-হাতী কাপড় পরিয়া থেলো হুঁকায় তামাক টানিতেন। পাশে একটি চৌকি—রোদে বৃষ্টিতে মাঝখানটি বাঁকিয়া গিয়াছে, একটা পায়া নাই, সেখানে তিনখানা ইটের ঠেকনা দেওয়া। আমি বসিতে আগন্তুকদের কয়েকজন চৌকির উপর বসিল। ইহারা আমলা।

একটু পরিচয়াদি হইল। খুব বৃদ্ধ গোছের একজন অগ্রণী হইলেন, উনি পেশকার সাহেব, ইনি হাজরিনবিস, ইনি তহশীলদার ; ইনি হচ্ছেন একৃমণ্টবাবু (অ্যাকাউণ্টেণ্ট)।

হুজুরের কোন রকম কষ্ট হয় নি তো পথে ?

অপর একজন বৃদ্ধের পরিচয় দিলেন, আর ইনি দেওয়ানজী লালা রামকিষুণলাল ; সবচেয়ে প্রাচীন লোক এখানে।

দেওয়ানজী দন্তলেশহীন মুখে হাসিয়া সেলাম করিয়া বলিলেন, সব হুজুরকা মেহেরবানি।

তাঁহার প্রাচীনত্বে আমার কি মেহেরবানি থাকিতে পারে বুঝিতে না পারিলেও বলিলাম, বড় আনন্দের বিষয়।

একটু চুপচাপ রহিল। দেওয়ানজী গলা পরিষ্কার করিয়া কি একটা বলিবেন, এমন সময় একজন পিওন একটা মাঝবয়সী কালো তেল-চুকচুকে লোককে সামনে হাজির করিল। দেওয়ানজী বলিলেন, হুজুরের 'টহলু' (চাকর), নাম লোট্‌না। নে, সাহেবের সব গোছগাছ ক'রে ফেল্ ; খবরদার, যেন কোন রকম কষ্ট না হয়, তা হ'লে—

চাকর পাইয়া মনটা একটু প্রফুল্ল হইল, কিন্তু দেখি, লোট্‌নার পাশে সেই কুকুরটা দাঁড়াইয়া। বুঝিলাম, পিওনের সঙ্গে সঙ্গে সেও লোট্‌নাকে ডাকিয়া আনিতে গিয়াছিল। দেওয়ানজীর কথা শেষ হইলে একটু সামনে আসিয়া লোট্‌নার মুখের দিকে ঘাড়টা বাঁকাইয়া চাহিল, জিব বাহির করা, ডান চোখটা একটু টেপা ; ভাবটা যেন, এর কথাই তোকে জানাতে গিয়েছিলাম—কেমন ঠেকছে ?

একটু পরে সবাই উঠিয়া গেলে লোট্‌না খুব লম্বা একটা সেলাম করিয়া বলিল, হাম নৈহট্টি থাকছিল—তিন বরষ।—বলিয়া একটা সেলাম করিয়া দন্ত বিকশিত করিয়া দাঁড়াইল।

প্রথম এ রকম অদ্ভুত আত্মপরিচয়ে একটু রাগ হইল। তা ছাড়া সাহেবের সামনে ও-রকম হাসির মানে কি? একটা ধমক দিয়া চৈতন্য-সঞ্চার করিতে যাইতেছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল—না, এই এখন আশা-ভরসা, খুশি রাখাই ভাল। তাহা ছাড়া আমার হিন্দীর পুঁজি যে রকম, ওর বাংলা জ্ঞানে অনেকটা সামলাইয়া লইবে। আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, তিন বছর নৈহাটি ছিলি'? তাই বলি, যেন চেনা চেনা মুখ। আমার বাড়ি সেরামপুর কিনা—

লোট্না হাতজোড় করিয়া কৃতার্থ হইয়া বলিল, হাম সিরামপুর খুব জানে, হুঁয়ামে আদালত থেকে আমার মাসীর ছেইলার জেহল হয়েছিল।

এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জায়গা সম্বন্ধে আরও একটা এমন নূতন তথ্য পাইয়া অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলাম, সত্যি নাকি? সেরামপুর আদালত থেকেই জেলের হুকুম হয়েছিল? তবে তো দেখছি—

লোট্না আনন্দে হাত কচলাইতে লাগিল।

চাবির রিঙটা প্যাণ্টালুনের পকেট হইতে বাহির করিয়া দিয়া বলিলাম, যা, স্যুট্‌কেসটা নিয়ে আয় তো—চামড়ার বাক্স।

লোট্না স্যুট্‌কেসটা আনিয়া চৌকির উপর রাখিল।

ডালাটা খুলিতেই কুকুরটা সরিয়া আসিয়া চৌকির উপর দুইটি পা তুলিয়া দিয়া দাঁড়াইল; আড়চোখে দেখিলাম, দুইটি কানই খাড়া করিয়া গভীর কৌতূহলের সহিত বাক্সের ভিতর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছে। ভ্যালা বিপদ তো!

লোট্না পরিচয় দিল, বলিল, ওর নাম রংলাল আছে; সাধু ভালা আদমিদের কুছভি বোলে না, চোরদের খুব পহছান্‌তে আছে।

ব্যাটা উজবুক কোথাকার! মনের রাগ মনে চাপিয়া বলিলাম, আচ্ছা, তুই যা, দু বালতি জল তুলে নিয়ে আয় দিকিন। চা করতে জানিস?

লোটনা হাসিয়া বলিল, লৈহট্টিমে আমার চায়েরভি দোকান ছিল। এক টাকায় ষোড়্হো আনা নফা থাকত।

ক্ষুদ্র ডাকাত! বিস্মিতভাবে একবার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, আচ্ছা, আয় জল নিয়ে, বাতলে দিচ্ছি; সে দরের চা করলে চলবে না।

সুট্‌কেস হইতে পায়জামা, তোয়ালে, খাটো শার্ট, হালকা চটি, সাবান প্রভৃতি বাহির করিলাম। লোট্‌না যতক্ষণে জল লইয়া আসিল, আমি ততক্ষণে ধড়াচূড়া ছাড়িয়া ঢিলা পায়জামা, শার্ট, ঘাসের চটি পরিয়া তৈয়ার হইয়া গিয়াছি। এইবার হাতমুখ ধুইয়া লওয়া, চাটুকু হইলে চা পান করিয়া সাহেবের সহিত একটু দেখা করিয়া আসা। তাহা হইলে এক প্রস্থ কাজ শেষ হইয়া যায়।

রংলাল চাকরটার সঙ্গে ইঁদারায় গিয়াছিল। ঘুরিয়া আসিয়া একটু যেন অবাক হইয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। ভঙ্গীটা ভাষায় প্রকাশ করিলে দাঁড়ায়, এ আবার কি রূপ! একটু পরে আমার পায়ের কাছে আসিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া আঘ্রাণ লইতে লাগিল।

চাকরটা ধমক দিয়া বলিল, খবরদার, মালিক হ্যায়।

আমি একেবারে এতটুক হইয়া গেলাম। কথাটা ঠিক এই রকম দাঁড়াইল, যেন, হ্যাঁ, আমার বহিরাবরণ, বিশেষ করিয়া মিনিটে মিনিটে তাহা পরিবর্ত্তিত করায়, এমন কিছু আছে বটে, যাহাতে অন্য কিছু বলিয়া সন্দেহ হইবারই কথা, তবে আসলে আমি এদের মনিব। আমি মাঝখানে অসহায়ভাবে পড়িয়া আছি, ইহারা দুইজনে এখন যেটুকু দাঁড় করায়।

কুকুরটা কথাটা ভাল করিয়া যাচাই করিবার জন্য চৌকির ওই কোণটার উপর গিয়া দাঁড়াইল। একবার ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিল, তাহার পর হঠাৎ যেন চিনিতে পারিয়া, কৌতুকরসে পরিপ্লুত হইয়া, দুই সারি দন্ত বিকশিত করিয়া বাহিরের দিকে ছুটিয়া গেল।

যাক, আপদ গেল। উঠিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বেশ ভাল করিয়া হাত মুখ ধুইয়া লইলাম, একটি টাটকা চুরুট ধরাইলাম, তাহার পর চৌকির উপর সাহেবী কায়দায় পা ছড়াইয়া ডেক-চেয়ারটায় গা ঢালিয়া দিলাম। লোট্‌না চায়ের যোগাড় করিতে লাগিল।

চায়ের সুমিষ্ট প্রত্যাশার সঙ্গে এই নবীনতম পদমর্য্যাদার উপলব্ধিতে মনটি বেশ একটি আত্মতৃপ্তিতে মজিয়া আসিতেছে, এমন সময় দোর-গোড়ায় নজর করিতেই দেখি, সারবন্দী একেবারে পাঁচ-পাঁচটি কুকুর, মাঝেরটি রংলাল।

বোধ হয় যে, এইমাত্র আসিয়াছে। কিন্তু তাহাদের তদ্গতভাবে দাঁড়াইবার ভঙ্গীতে আমার যেন মনে হইল, তাহারা অনেকক্ষণ আসিয়া আমায় নিঃশব্দে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। একটি কুকুর মাদী, রংলাল যেন তাহার বান্ধবীকে এক আজগবি চিজ দেখাইয়া তাহার মনোরঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আমার ঘাড়ের উপর দিয়া খাতির জমাইয়া লওয়া গোছের।

আমি মুখ তুলিয়া চাহিতেই সবগুলার মধ্যে একটা চঞ্চলতা পড়িয়া গেল। রংলাল মাদীটার ঘাড়ের কাছটা দাঁত দিয়া চুলকাইবার ভান করিয়া বোধ হয় কানে কানে কি বলিল, পাশের কুকুরটা হঠাৎ ঘুরিয়া আসিয়া সেইখানটাতে জিজ্ঞাসুভাবে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর এ ওর ল্যাজে একটা কামড় দিল; ও তাহার পাটা ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিল এবং এই ভাবে জড়াজড়ি করিতে করিতে সামনের জমিটাতে গিয়া লুটাপুটি গড়াগড়ি শুরু করিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে হিঃ—হাঃ—ওফ প্রভৃতি নানা রকম অস্পষ্ট চাপা আওয়াজ।

ব্যাপারটা হাসিয়া খুন হইয়া যাইবার মত, এত কাছাকাছি যে, আমি কোনমতেই নিজের সহজ ভাবটি রক্ষা করিতে পারিলাম না।

আমায় উঠিতেই হইল, ট্রাঙ্ক হইতে আয়নাটা বাহির করিয়া, যতটা সম্ভব পোশাকের ছায়া ফেলিয়া মনের দ্বিধাটা মিটাইতে চেষ্টা করিলাম। এতই কি হাস্যকর একটা কিছু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহাতে, শুধু কথার কথায় নয়, নিতান্ত বাস্তবরূপে কুকুর-বিড়ালের পর্য্যন্ত হাসিয়া পেটে খিল ধরিয়া যায়?

চায়ের স্বাদ পাওয়া গেল না। স্ত্রীর উপরও একটু রাগ হইল, না হয় করিয়াছিলামই একটু বারণ, দিয়া দিলেই হইত কাপড়-জোড়াটা, সময় আছে, অসময় আছে; আর কিই যে আমার এমন বাধ্য তিনি! ঢের দেখা গেল!

৩

চাকরি বেশ চলিতেছে। সাহেব সদয়, আমলারা বেশ অনুগত, ছোটা সাহেব নামটাও চালাইয়া লইয়াছি; কিন্তু জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে।

কুকুরটার উপর দিয়া অনেক পরীক্ষা করা গেল। প্রথমটা এক কোণে চেন দিয়া বাঁধিয়া রাখা গেল, যাহাতে আমায় যখন তখন দেখিতে না পারে। তাহাতে সদাসর্ব্বদা পাড়ার নানা জাতীয় কুকুরে তাহার কুশল-সমাচারের জন্য এত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল যে, ক্রমাগত কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া তাহাদের পিছনে লাগিয়া থাকার চেয়ে রংলালকে মুক্ত করিয়া তাহাদের নিশ্চিন্ত করাই সমীচীন বলিয়া মনে হইল।

এক এক করিয়া দুই-তিনজনকে দান করিয়া দিলাম। যাহাকেই দান কর, তিন-চার দিনের মধ্যেই তাহার বাড়ি হইতে চেনটা হারাইয়া যায়, তাহার পর রংলাল ফিরিয়া আসে। এই করিয়া প্রায় দুইটি টাকা ওই দিক দিয়া দণ্ড দিলাম।

মুশকিল এই যে, খোলাখুলি মারধোর করিতে পারি না। বাস্তবিক তাহার অপরাধটা কি? দিব্য কাছে কাছে থাকে, কামড়াটে নয়, কিছু নয়, এমন নিমকহালাল কুকুরকে তাড়না করিবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণই নাই; তবুও যখন বাড়িতে কেহ নাই, অথচ কুকুরটা একটা কান নামাইয়া, আর একটা কান খাড়া করিয়া পরম দার্শনিকের মত আমায় অবলোকন করিতেছে, তাহাকে তাড়া যে না করিয়াছি এমন নয়। প্রথমটা উপেক্ষা করিয়াছি, আছে তো আছে, সামান্য একটা কুকুর তো! চাহিয়াও দেখি নাই। ক্রমে এমন একটা অস্বস্তি মনে খচখচ করিতে থাকে যে, একবার চাহিতেই হয়; তাহার পর থাকিয়া থাকিয়া ক্রমাগতই চাহিতে হয় এবং যদিও অপলক দৃষ্টিতে আমায় নিরীক্ষণ করা ভিন্ন তাহার কোনও দোষই থাকে না, তথাপি আমার মাথায় ক্রমশ যেন আগুন ধরিয়া উঠিতে থাকে, হাতের কাছে যাহা পাই, তাহা লইয়াই উঠি। খুন চাপিয়া যায়, ক্ষতিবৃদ্ধি-জ্ঞান থাকে না।

নিজেকেও বদলাইয়া দেখা গিয়াছে। হাফপ্যাণ্ট পরিয়া দেখিয়াছি অর্থাৎ বিলাতী পোশাক অর্দ্ধেক বলি দিয়া ফল হয় নাই। লুঙ্গি পরিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে রংলাল পাড়ার তাবৎ কুকুরকে ডাকিয়া আনিয়া এমন সমারোহের সহিত আপ্যায়িত করিয়াছে যে, লুঙ্গিটা সেই দিনই সাহেবের খানসামা করিম শেখকে দান করিয়া দিয়াছি।

বাকি ছিল ধুতি-চাদরের পরীক্ষা। প্রাণের জ্বালায় ধরিতামও; কিন্তু হায় রে! এদিকে যে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিয়া বসিয়া আছি। 'ছোটা সাহেব' নামটা এমন সাংঘাতিকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, এখানে ধুতি পাঞ্জাবি পাম্পশু আর আমায় এ জন্মে পরিতে হইবে না।

চারিদিকে নিরাশ হইয়া অবশেষে খোশামোদ ধরিয়াছি—ডাহা হীন খোশামোদ। কাছে ডাকিয়া আদর করি, আয় রংলাল, ব্যাটা আয়, চ্যু-চ্যু। শুনছিস লোট্‌না? কুকুরটাকে মাঝে মাঝে একটু ক'রে নাইয়ে দিস। জানিস তো কি ক'রে নাওয়াতে হয় কুকুরকে?

লোট্‌না বিজ্ঞভাবে হাসিয়া বলে, নৈহট্টিমে আমার একটা কুকুর থাকছিল, গঙ্গাজলে চান করতে গিয়ে ডুবে গেল।

মনে মনে আশান্বিত হইয়া বলিলাম, হ্যাঁ, তোর জানা আছে তা হ'লে। রোজ চান করাবি, বাড়িতে নয়, পুকুরে নিয়ে গিয়ে। বড্ড উঁচুদরের কুকুর, টের পাওয়া যাচ্ছে কিনা।

কিছুই ফল হয় না। সেই সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি; সেই ব্যঙ্গভাবে এক কান নামানো, বেড়াইতে বাহির হইলে পাড়ার যত কুকুর জড় করিয়া সেই পিছু পিছু অনুসরণ, কিছুরই এতটুকু ব্যতিক্রম হয় নাই।

এসব অত্যাচারের উপর আবার খরচের জন্য মনস্তাপ আছে। রোজ মাংসের বন্দোবস্ত করিয়াছি, রাত্রে ভাতের সঙ্গে আধ সের দুধ। সাক্ষাৎ আমারই বশীভূত হইবে বলিয়া, অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইলেও, নিজের হাতে খাওয়াই। এদিকে কয়েকদিন হইতে মাদীটাকে রোজ ডাকিয়া আনে; মাংস দুধ আর একটু বাড়াইয়া দিয়াছি, তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিলে, রংলাল শীঘ্র বশ মানিবে এই আশায়।

আশা কতটা সফলতার পথে জানি না, তবে ঘাড় নীচু করিয়া খাইতে খাইতে রংলাল যে ভাবে সঙ্গিনীর দিকে এক-একবার তাহার সেই মারাত্মক হাসির ভঙ্গীতে আড়চোখে চায়, তাহাতে যেন মনে হয়, স্পষ্ট বলিতেছে, বোকারামকে ঠকাইয়া চলিতেছে মন্দ নয়, কি বল গো?

পূজার ছুটিতে পনরো দিনের ছুটি পাইয়া বাড়ি আসিয়াছি। স্ত্রী দেখিয়াই বিস্মিত হইয়া বলিলেন, এ কি, একেবারে যে আধখানা হয়ে গেছ! অথচ শুনি, এমন ভাল জায়গা, পশ্চিম—

তাহা হইলে শরীরটাও ভাঙিয়াছে! আশ্চর্য্য কি? যা অশান্তি!

উত্তর করিলাম, বিরহটা সবার ধাতে সয় না।

স্ত্রী রাগিয়া বলিলেন রঙ্গ রাখ; এ যেন কুনজরে পড়ার লক্ষণ, শরীর যেন কালি মেরে গেছে!

একটু চুপ করিলেন বটে, কিন্তু মনের কথাটা আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না; বলিলেন, লোকে বলে, জায়গাটা কামিখ্যের নাকি খুব কাছে? ওখানেও নাকি ভেড়া-টেড়া করে?

বলিলাম, এই তো আমারই ওপর ঝুঁকেছিল, যখন দেখলে, ভেড়া হয়েই গেছি এখান থেকে, তখন ভাবলে, আর মরা ভেড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা কেন?

তাঁহার মনের অবস্থার হিসাবে তামশাটা বোধ হয় খুবই অসাময়িক হইল। মুখভার করিয়া কহিলেন, আচ্ছা, হয়েছে, থাক্। তোমার কিন্তু আর ওখানে যাওয়া হবে না।—বলিয়া পোশাক-পরিচ্ছদ জিনিসপত্র গুছাইয়া এমন দৃঢ়তার সহিত বাক্সে ভরিয়া চাবি দিতে লাগিলেন, যেন এ বিষয়ে একেবারে চরম নিষ্পত্তি হইয়া গেল।

ছুটির প্রথম দিকটা ভালই কাটিল। রংলালও নাই, প্যাণ্ট-কোটও বাক্সের ভিতর, কটা দিন ধুতি-চাদরের মধ্যে শরীরটাকে মুক্তি দিয়া এবং লোটনার বাংলার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

ক্রমেই ছুটি যেমন ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, কর্ম্মস্থানের রংলালময় ছবিগুলি চোখের সামনে স্পষ্টতর হইয়া মনটাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। কি ভাবিলাম জানি না; একদিন স্ত্রীর কাছে কথাটা হঠাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম; হাসিচ্ছলেই বলিলাম, সেখানে একটা ভারি মজা হয়েছে, কুকুর যে এত মানুষের মত লক্ষ্য করতে পারে, জানতাম না; অন্তত তার রং-ঢং দেখলে তোমার মনে হতেই হবে, সে খুব বিবেচকের মত তোমার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করছে।

কাহিনীটা আগাগোড়া বলিয়া গেলাম।

হাসিচ্ছলে আরম্ভ করিলাম বটে, কিন্তু ব্যাপারটা মূলত আমার কাছে লঘু ছিল না বলিয়াই হোক আর যে জন্যই হোক, বর্ণনাটা বেশ স্পষ্ট এবং একটানা হইল না। বাক্যে বাক্যে জড়াজড়ি করিয়া শুধু এইটুকুই স্পষ্ট করিয়া দিল যে, এর মধ্যে কোথায় যেন আমার একটু দুর্ব্বলতা আছে, যা আমি গোপন করিতে চাহি।

স্ত্রী শোনার সময় কোথাও একটু হাসিলেন না, শোনার শেষে আরও গম্ভীর হইয়া গেলেন, এবং মাথা নাড়িয়া প্রশ্ন করিলেন, ওটা বুঝি তোমার কুকুর হ'ল?

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, এতক্ষণ ধ'রে তবে শুনলে কি? দিশী কুকুর, গায়ের রঙ রাঙা ব'লে—

স্ত্রী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, থাম বাপু, কুকুর তো কখনও কেউ দেখে নি! অমন একদৃষ্টে চাউনি কুকুরের?

সেইটিই তো বুঝতে পারি না; তবে আর তোমায়—

বুদ্ধি কি তোমার রেখেছে যে, বুঝবে? না, তোমরা পার এসব ব্যাপার বুঝতে? এ তো স্পষ্ট, কোন খারাপ মেয়েমানুষ কুকুরের বেশ ধ'রে—

আমি কুসংস্কারের দৌড় দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কহিলাম, সর্ব্বনাশ! একটা জলজ্যান্ত কুকুর, দিনরাত হাঁকাহাঁকি ডাকা-ডাকি ক'রে বেড়াচ্ছে, দিনের আলোর মত স্পষ্ট, আর তুমি কিনা—

যত স্পষ্ট, তত সর্ব্বনাশের গোড়া! তোমরা যখন এসব কিছু বোঝ না, তখন চুপ ক'রে থাক। বিশ্বাস না হয়, এক্ষুনি তাঁতী-বউকে ডেকে পাঠাচ্ছি, তার মুখেই শোন। চন্দোরের মাও বোঝে কিছু কিছু, লক্ষণ মিলিয়ে ঠিক ব'লে দেবে, কোন্ মেয়েমানুষ, কোথায় থাকে। আমার অদৃষ্টে শেষ পর্য্যন্ত যে কি আছে! মা মঙ্গলচণ্ডী যে—

বাড়াবাড়ির সম্ভাবনা দেখিয়া আমি বলিলাম, থাক্, আর ওদের ডেকে কাজ নেই; কিন্তু খারাপ মেয়েমানুষই যদি হ'ত কুকুরটা, অন্তত—

স্ত্রী হাত উঁচাইয়া বলিলেন, থাক, যে বোঝে না, তার সঙ্গে আর বৃথা তর্ক করতে চাই না। মোট কথা, তোমার আর ওখানে যাওয়া হবে না। আমি জানি, জায়গাটি কামিখ্যের একেবারে কাছে, তুমি আমায় লুকিয়ে ভেতরে ভেতরে এই সব—

রাগ হইয়া পড়িল। বিশেষ করিয়া উহার এই কামাখ্যা-বাতিকে তো আমার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইয়াছে। সেবারে বম্বে বেড়াইতে গেলাম, অসুখের টেলিগ্রাম দিয়া পৌঁছিবার পরদিনই আনাইয়া লইলেন; আসিয়া শুনিলাম, টের পাইয়াছেন, জায়গাটা কামাখ্যার কাছাকাছি। দিল্লী লাহোর কামাখ্যা হইতে বেশি দূর নয় বলিয়া এ পর্য্যন্ত পূজার ছুটিতে বেড়াইতে যাওয়া হইল না। রেঙ্গুন কামাখ্যা ওঁর মতে দুইটা পাশাপাশি স্টেশন। দুই দিন উপবাস করিয়া পড়িয়া রহিলেন, তিনশো টাকার অমন চাকরিটা লওয়া হইল না। আমার যাওয়ার কথা হইলে কামাখ্যা আবার রাণাঘাট কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসে, এর চেয়ে আর

বিপদ কি আছে? মা জানকীর দেশ বলিয়া এ ক্ষেত্রে কোন রকমে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম, কিন্তু মনের সন্দেহ আর কতদিন চাপা থাকিবে?

বিরক্তির সহিত বলিলাম, কামিখ্যে তো তোমার চারদিকেই—দেখ তো কাণ্ড! একটা কুকুর চেয়ে থাকে ব'লে আমায় চাকরি ছাড়তে হবে? এমন জানলে কোন মুখ্যু তোমায় বলতে যেত—

প্রথম একরাশ প্রশ্ন বর্ষিত হইল। প্রাণের চেয়ে কি চাকরি বড়? শাক ভাত খাইয়া লোকের দিন চলে না? দেশের যে সকল লোক বিদেশে চাকরি করে না, তাহাদের স্ত্রীপুত্র কি বাঁচিয়া নাই?

প্রশ্নগুলি ক্রমে ব্যক্তিগত রূপ ধারণ করিল—এই মাস চারেকেই জায়গাটার উপর এতটা টান হইল কেন আমার? কুকুরটাকে উপরে উপরে দেখিতে পারি না, অথচ তাহার দুধ মাংস বরাদ্দ করিবার কারণ কি? যদি কথাটা সোজাই ছিল তো এতদিন লুকাইবার কি কারণ ছিল? সেই বলিলাম, অথচ আসিয়াই বলি নাই কেন?

দেখিলাম, হাতে আঁচল উঠিয়াছে, চোখের পাপড়িগুলি একটু ঘন ঘন উঠানামা করিতেছে। বুঝিতে বাকি রহিল না, এবারে অশ্রুস্রোতে যে সব প্রশ্ন নামিবে, সেগুলি হইবে যেমন উত্তপ্ত, তেমনই বেগবান। আপাতত চাকরি-সমস্যার চেয়ে সেটা গুরুতর হইবে বুঝিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম।

রাত্রে আহার করিবার সময় দেখিলাম, ভাবটা প্রসন্ন। চাকরির কথাটা তুলিব তুলিব করিয়া প্রয়োজনানুরূপ শক্তি সঞ্চয় করিতেছি, বলিলেন, একটা মস্ত বড় সুখবর আছে, কি খাওয়াবে বল?

বলিলাম, ভেড়ার মাংস খাও তো লোক ডাকি, গা থেকে কেটে দিক।

রাগিতে গিয়া হাসিয়া বলিলেন, খালি তামাসা। আজ তাঁতী-গিন্নী বুড়ীকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। সব শুনে কি বললে বল তো?

শেকল গড়াতে।

শুনেই বললে, কুকুর, না হাতী! কোন মেম-পেত্নী; দিশী কোন কুমেয়েমানুষ হ'লে ও পোশাকের দিকে ঘেঁষত না। বললাম, তবু ভাল। মা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে তক্ষুনি পাঁচ সিকে মানত ক'রে তুলে রাখলাম।

তাঁতী-বউয়ের কি বিদায় হ'ল?

ওরা গরিব মানুষ, ডাকলে আপন জেনে আসে, ভাল পরামর্শ-আশটা দেয়। দোষ আর কি? উল্টে বরং বললে, ও পাপ কেরেস্তানী পোশাক আর বাড়িতে রেখো না। বার ক'রে দিলাম। বুড়ো মানুষ, বয়সের ভারে নুয়ে গেছে, তবু সেই পেল্লাই গাঁঠরি ঘাড়ে ক'রে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে গেল। শুনে অবধি এমন হয়েছিল, আদাড়ে জিনিসগুলো সরিয়ে হাড়ে যেন বাতাস লাগল। ও কি, হাত গুটোচ্ছ যে! তাঁতী-বউয়ের কল্যাণে চাকরি র'য়ে গেল, কোথায় খুশি হয়ে দুটি খাবে, না—। মাছের ডালনাটা আর একটু দিই, ব'স।

রাগে বিরক্তিতে সে রাত্রে আর কথা কহিলাম না, কেন না মুখ খুলিলেই একটু বাড়াবাড়ি হইয়া যাইত। অন্তরাল হইতে একবার কানে গেল, স্ত্রী ঝিকে সঙ্গোপনে বলিতেছেন, দেখছিস তো! ঠিক মিলে যাচ্ছে; তাঁতী-বউ ব'লেই ছিল, ও পোশাকের ওপর কুদৃষ্টির জন্যে একটা টান প'ড়ে গেছে, একচোট ভয়ঙ্কর চটবেই, দেখছিস তো রাগের বহর?

দুঃখও হইল, ন্যায়সঙ্গত রাগের এমন কদর্থ, এতটা অমর্য্যাদা, পূর্ব্বে কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না জানি না। আমি যত চটিতেছি, উহারা দিব্য বসিয়া ততই লক্ষণ মিলাইতেছে।

পরের দিন কিন্তু ব্যাপারটা আমার কাছে অন্য ভাবে দেখা দিল। ভাবিলাম, যাক, সমস্ত ব্যাপারটা গোটা ত্রিশ-চল্লিশ টাকার উপর দিয়া

যদি শেষ হয় তো মন্দের ভাল। এখন আমায় বাধ্য হইয়া ধুতি-চাদর-পরিহিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। নিজের ইচ্ছায় কোট-প্যাণ্ট ছাড়া হইত না, এতে একটা সান্ত্বনাও রহিল, আর ওদিকে রংলাল-সমস্যাও মিটিল। দুঃখ রহিল, 'ছোটা সাহেব' আবার 'বড়া বাবু' হইতে চলিলেন। তাহা হউক, মোহটা অনেক কাটিয়া আসিয়াছিল, বাকিটুকু কাটিতে দেরি হইবে না।

বাকি থাকে—হঠাৎ এ পরিবর্ত্তনের জন্য সাহেবকে এবং অনুগত আমলাবৃন্দকে একটা অজুহাত দেখানো, অন্তত জিজ্ঞাসা করিলে একটা সমীচীন উত্তর দেওয়া। একটি বেশ সভ্য এবং সুসঙ্গত মিথ্যা রচনায় ব্যাপৃত রহিলাম।

কুঠির টমটম হইতে নামিয়া দেখিলাম, অভ্যর্থনার জন্য কয়েকজন আমলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত রহিয়াছেন। সেলাম, প্রতি-সেলাম, কুশল-প্রশ্নাদি হইল। লক্ষ্য করিলাম, লালা রামকিষুণ সেলাম না করিয়া করজোড়ে প্রণাম করিলেন। মুখে একটি তৃপ্ত হাসি।

সকলের নয়ন এবং অধর কোণে একটি প্রশ্ন নাচিয়া বেড়াইতেছিল, আগুসার হইয়া আমি নিজেই সবার কৌতূহল মিটাইয়া দিলাম। বলিলাম, হ্যাঁ, আর সবই তো কুশল, তবে গাড়ি থেকে আমার সুট্কেসটা কাল রাত্রে চুরি হয়ে গেছে, পোশাক-পরিচ্ছদ যা কিছু সব তাইতেই ছিল। এই দেখুন না, ভাগ্যিস এক সেট কাপড়-চোপড় এনেছিলাম!

চারিদিক থেকে সহানুভূতির একটি মৃদু কলরব উঠিল। লালা রামকিষুণ একেবারে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, তাই নাকি? ভারি জুলুম তো!

বেশ বোঝা গেল, সকলেই ভিতরে ভিতরে খুশি, এবং আমার

ক্ষতিতে লালা রামকিষুণের আনন্দটা সকলের চেয়ে অধিক বলিয়াই তাঁহার এত আড়ম্বরের সহিত সহানুভূতি দেখানো দরকার হইয়া পড়িল। ইহার পরে যে কথাবার্ত্তা হইল, তাহার মধ্যে মর্য্যাদার ব্যবধান রক্ষা করিয়াও এমন একটি নিগূঢ় আত্মীয়তার সুর ছিল যে, তাঁতী-বউয়ের উপর আমার আক্রোশটা ধুইয়া মুছিয়া গেল। বুঝিলাম, বিদেশে 'ছোট সাহেব' হইয়া একলা একলা থাকার চেয়ে 'বড় বাবু' হইয়া সবার হৃদয়ের সান্নিধ্য-লাভ করা সমধিক ভাগ্যের কথা।

কোঁচানো চাদরের হাওয়া খাইতে খাইতে চেয়ারে বসিয়া গল্প করিতেছি, রংলাল হাজির। দূরে দাঁড়াইয়া প্রথমে দুইটা কান খাড়া করিয়া, পরে একটা কান নামাইয়া, মাথাটা কাত করিয়া শত প্রকারে লক্ষ্য করিতে লাগিল। আমিও অল্প অল্প হাসিতে হাসিতে দেখিতে লাগিলাম, কি করে! ক্ষণেক পরে বলিলাম, কি রে রংলাল, চিনতে পারিস না?

আওয়াজ শুনিতে যা দেরি, রংলাল ছুটিয়া আসিয়া একেবারে কোলে লাফাইয়া হাঁটুতে থাবা তুলিয়া, আদর খাইয়া, আমার জামা কাপড় চাটিয়া-চুটিয়া এক কাণ্ড করিয়া তুলিল।

অনেকদিন পরে দেখার জন্যই এই স্নেহের উপদ্রব; কিন্তু আমার মনে হইল, কোট-প্যাণ্টালুন-মুক্ত বলিয়াই কুকুরটা আমাকে এতদিনে এই প্রথম তাহার নির্ম্মল পশুহৃদয়ের সমস্ত প্রীতি দিয়া অভিষেক করিয়া লইল।

আমার ঘাড় হইতে মেম-পেত্নী না হউক, সাহেব-ভূত যে নামিয়া গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ওঝাগিরির যশ খানিকটা তাঁতী-বউকে দিতে হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশই যে রংলালের প্রাপ্য, সে কথা আর কেহ না জানিলেও আমি মর্ম্মে মর্ম্মে জানি।

ভূমিকম্প

১

তিন দিকে পরিত্যক্ত তেতলা হস্টেল-বাড়ি, এই দিন চারেক আগে পর্য্যন্ত ছিল আশ্রয়, এখন হইয়া দাঁড়াইয়াছে আতঙ্ক। মাঝখানে প্রশস্ত লনের উপর টেনিসের পর্দা জুড়িয়া তাঁবু খাটানো, কলেজের ছেলেরা তাহারই মধ্যে জড় হইয়াছে। মাঘের কনকনে শীত, তায় পাটনা জায়গা, ও তাঁবুতে কিছুই আটকায় না। মাথার উপর কিছু একটা আছে—এই সান্ত্বনায় যতটা কাজ হয়। গেঞ্জি হইতে ওভারকোট পর্য্যন্ত সবই গায়ে,—মাঝে মাঝে চাও আছে। বঙ্কিমের ইহাতেও কুলাইতেছে না, সে চৌকির নীচে বিছানা করিয়া এবং চৌকির চারিদিকে কম্বল ঝুলাইয়া ভিতরে শুইয়া আছে।

খোকা বলিল, কেমন বোধ হচ্ছে হে বন্ধু? কবর কি বলে?

কবরের ভিতর হইতে উত্তর আসিল, বড্ড মিষ্টি বাহুপাশ হে, বলছে, দেখ বঁধু, কেমন উষ্ণ আলিঙ্গন আমার, তবু আমায় বলে—হিমশীতল! দেখ অবিচার।

মৃগেনের চা করা শেষ হইয়াছে, খোকার হাতে একটা পেয়ালা দিয়া বলিল, ধর। সত্যি, তেতলার কথা ছেড়ে দাও, কোঠাবাড়িমাত্রেই যেন একটা বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইষ্টিশনের সামনের সেই দোতলা বাড়িটার ইতিহাস তো শুনেইছ; সিটিতে আজ একটা ছোট একতলার অবস্থা দেখলাম। মনে হয়, সৃষ্টি মুছে ফেলবার নেশায় মেতে উঠে সবাইকে বুকের মধ্যে পিষে ফেলে নিজে আছড়ে মরেছে; কবর এতটা দাগাবাজি করতে পারত না।

চৌকির ভিতরটা বিচলিত হইয়া উঠিল। কে বলে এ কথা?—

বলিয়া বঙ্কিম চৌকির পর্দ্দা ঠেলিয়া নিজের ব্যালাক্লাভা-আঁটা মুখটা হঠাৎ বাহির করিল। কালো আবেষ্টনীর মধ্যে চোখ দুইটা জ্বলজ্বল করিতেছে, এই লোকই যে একটু আগে নিজের শয্যা লইয়া লঘু আলাপ করিতেছিল, বোঝা শক্ত। বলিল, গঙ্গার এপারে আছ, তাই ও কথা বলছ, একবার ওপারে যাও—মজঃফরপুর, মোতিহারি, দ্বারভাঙ্গায় দেখবে, সারবন্দী হয়ে কবরের দল মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। পাতালের যত গ্লানি, যত ভীষণতা সঙ্গে ক'রে এক এক জায়গায় আগুনের নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে উঠেছে, এক এক জায়গায় প্লাবনের খরস্রোত বইয়েছে। বালির চাপে কচি শস্যের টুঁটি চেপে মেরেছে—

মৃগেন বলিল, তুমি ভাই, মুখটা ভেতরে টেনে নাও, অথবা সমস্ত শরীরটা বাইরে বের ক'রে নিয়ে এসে যা বলতে হয় বল, তোমার ব্যালা-ক্লাভাগ্রস্ত মুখমণ্ডল দেখে বড্ড অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, কবরই যেন আচমকা মূর্ত্তি গ্রহণ ক'রেই—

বঙ্কিম বাধা পাইয়া একটু অন্যমনস্কভাবে চুপ করিয়া ছিল। বলিল, আর যা ক'রেছে তা আরও গর্হিত, বিপন্ন মতিভ্রান্ত অসহায় মানুষের সঙ্গে নীচ প্রবঞ্চনা ক'রে তার প্রাণ নিয়েছে কবরে। খোকা, তুমি সামনের পর্দ্দাটি একটু টেনে দাও, ভেন্টিলেশন না হ'লে অবৈজ্ঞানিক প্রথায় কোন রকম ক'রে তবু বাঁচব, কিন্তু এই অবস্থায় যদি নিউমোনিয়া ধরে—

ওপারে এত ব্যাপার, অথচ এখন পর্য্যন্ত বল নি যে? ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয়েছে নাকি? শুনছি নাকি—

বঙ্কিম বলিল, বলি নি, ঘোতন ছিল ব'লে। গেছে, এবার নিজের চোখেই সব দেখবে, আমি মাঝখান থেকে একটা অত বড় দুঃসংবাদ দিতে যাই কেন?

সকলেই যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চকিতভাবে বঙ্কিমের দিকে চাহিল, একজোটেই প্রশ্ন করিল, সত্যি নাকি ?

বঙ্কিম মুখটা বিষাদে একটু কুঞ্চিত করিয়া বলিল, বড় স্যাড, বড্ড করুণ !

তাহার পর আস্তে আস্তে শরীরটা নানা প্রকারে আকুঞ্চন প্রসারণ করিয়া চৌকির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং ব্যালাক্লাভাটাকে গুটাইয়া মাথায় জড় করিয়া জামা র‍্যাপার বেশ ভাল করিয়া সামলাইয়া লইয়া বলিল, তা হ'লে মৃগেন, আর এক কাপ ক'রে—

খোকা অসহিষ্ণুতার সহিত বলিল, সে হচ্ছে, জল তো চড়ানোই রয়েছে, কিন্তু তুমি যে চিরকেলে অভ্যাসমত এফেক্টের জন্যে আমাদের চা হওয়া পর্য্যন্ত বসিয়ে রাখবে, সে হচ্ছে না ; শিগগির বল, ব্যাপারটা কি ? ঘোঁতনদের বাড়ির একজনও কি বেঁচে নেই ?

বঙ্কিম রহস্যের ভাবটা বজায় রাখিয়া বলিল, একজন বেঁচে নেই ! ঘোঁতন যে গেছে, এটা ঠিক তো ? বড্ড স্যাড ব্যাপার হে।

সে একটু মাথা নীচু করিয়া বসিল ; খোকা এবং পরেশ পুনরায় তাগাদা দিবার পূর্ব্বেই হঠাৎ মাথা তুলিয়া আবার আরম্ভ করিল, ঠিক দশটার সময় আমি কুড়হান্নি স্টেশনে পৌছলাম। গাড়ি ওই পর্য্যন্ত যাচ্ছে আজকাল, ওর ওদিকে লাইন ধ'সে গেছে। কুড়হান্নিটা মজঃফরপুর থেকে দু স্টেশন আগে, রাস্তা দিয়ে গেলে ন ক্রোশ—আঠারো মাইল—

খোকা বলিল, তুমি আঠারো মাইল দূর থেকে গল্প আরম্ভ ক'রো না বন্ধু, দোহাই। আঠারো মাইল পথ আর ভাষা বেয়ে আসতে তোমার একই রকম সময় লাগবে। বড্ড ঘুম পাচ্ছে, অথচ ঘোঁতনের বাড়ির খবর ব'লে একটা উৎকণ্ঠাও লাগিয়ে দিয়েছ ; নাও, মেলা আর্ট ফলিও না।

বঙ্কিম এসব অনুরোধ-উপরোধ কানে না তুলিয়া বলিতে লাগিল, রাস্তার দু ধারে সে এক বীভৎস কাণ্ড। খাদগুলোতে জল থৈ-থৈ করছে, জায়গায় জায়গায় জল, ওপরে উঠে এমন শ-দুশো বিঘে জমি ডুবিয়ে দিয়েছে। যেখানটা জেগে আছে, ছোট বড় বালির চাকতিতে ভরা। চাকতির মাঝখানে একটা ক'রে গর্ত্ত, ওই বেয়ে পাতালের জল বেরিয়ে এসেছিল; মাঝে মাঝে তখন পর্য্যন্ত উদ্গার ক'রে চলেছে, আটচল্লিশ ঘণ্টা পরও।

প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে এইগুলো সব মাটি ফুঁড়ে বিকট আওয়াজের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল, আমাদের এই শ্যামা ধরিত্রী একেবারে সহস্রমুখ দানব হয়ে উঠেছিল।

খাদ জলে ভরুক—সওয়া যায়, কিন্তু যখন দেখা গেল, বালির রাশি খাদ, ডোবা, নালা, ইঁদারা ভরাট ক'রে দিয়ে উঁচু রাস্তার সঙ্গে মাথামাথি হয়ে ঠেলে উঠেছে, আর কচিৎ কোথাও এক-আধটা গাছের ডগা তার মধ্যে নিঝুম হয়ে নেতিয়ে রয়েছে, তখন সত্যিই কেমন একটা অস্বস্তি জেগে ওঠে মনে; অন্তত আমার তো মনে হ'ল যে, এই যে আমাদের এত বিশ্বাসের পৃথিবী, এর ভেতরে একটা মস্ত প্রবঞ্চনা লুকানো আছে, ওটা তারই নমুনা। ওপরটা সবুজ কোমলতার মোহ, আমাদের ভুলিয়ে রাখবার যাদু, নীচেয় আছে এর এক অনন্ত অপ্রমেয় সাহারা। একদিন নিতান্ত খেয়ালের মাথায়ই যদি বুভুক্ষু তৃষ্ণাতুর মত্ত দানবকে ভেতর থেকে লেলিয়ে দিয়ে এক মুহূর্ত্তে ওপরের সমস্ত সরসতাটুকু—

মৃগেন একটা কাপে চা ঢালিয়া আগাইয়া দিয়া বলিল, থাক্, আপাতত তোমার মরু-দানবটিকে ঠাণ্ডা কর, বড় তেতে উঠেছে।

চায়ের কাপটি বঙ্কিম খালি করিয়া এক পাশে রাখিয়া দিল, রুমাল

দিয়া মুখ মুছিয়া ব্যালাক্লাভাটা ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া বলিল, মজঃফরপুর পৌঁছলাম।

খোকা বলিল, বাঁচালে; চা-পথে খুব তাড়াতাড়ি হ'ল তো!

পরেশের আগ্রহটা সবচেয়ে বেশি ছিল; প্রশ্ন করিল, আর সব কি কি দেখলে রাস্তায়? এ যাবৎ যা বললে, তা থেকে তোমার সাহিত্য বাদ দিলে তো খানিকটা জল আর খানিকটা বালি প'ড়ে থাকে, যার কথা অপেক্ষাকৃত মৃদু ভাষায় রোজ খবরের কাগজে পড়া যাচ্ছে।

বঙ্কিম বলিল, কয়েক জায়গায় নামতে হয়েছিল এক্কা থেকে, রাস্তার এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত ফাটল চ'লে গেছে, যতটুকু রাস্তা ঠিক ততটুকু মাটি দিয়ে ভরিয়ে দিলেও এক-একটা এত চওড়া যে, গাড়িসুদ্ধু পার হতে তখন সাহসে কুলোয় না, বিশেষ ক'রে রাস্তার দু পাশে ফাটলের আসল স্বরূপ দেখলে। এক জায়গায় একটা বেশ চওড়া লোহার পুল, আক্রোশে দু হাতের চেটোর মধ্যে ধ'রে কে যেন দুমড়ে দিয়েছে, ইংরেজী 'এস' অক্ষরটাকে নুইয়ে দিলে যেমন হয়। সেখানে সব শর্ম্মাকেই নামতে হয়েছিল।

এক এক জায়গায় রাস্তার দু ধারেই ধ'সে কুঁচকে গেছে। তোমার দু পাশে লম্বালম্বি ফাটল চলেছে তো চলেছেই; এক্কায় যেতে যেতে মনে হয়, যেন ও দুটো শুধু অটল দূরবিস্তৃত বিদারণমাত্রই নয়; দুটো করাল শিরাপেশীবহুল হাত তোমার পাশে পাশে এগিয়ে চলেছে, যে কোন মুহূর্ত্তেই তার এই শিরাপেশীগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে, তখন একবার হাত তুলে এই পৃথিবীর নিকট থেকে একটা আর্ত্ত বিদায় নিতেও তোমার সময় থাকবে না। একজন বললে, বাবু, যেদিন হয় কাণ্ডটা, ওই ফাটলের মুখে একটা ছোট ছেলে—

মচ করিয়া একটা শব্দ হইল। বাক্স, ট্রাঙ্ক, স্টোভের উপরকার কেটলি সবগুলি একটু কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে হস্টেলের বাকি সমস্ত ক্যাম্প হইতে—শহরের চারিদিক হইতে একটা ত্রস্ত ধ্বনি রাত্রির আকাশ মথিত করিয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কুণ্ঠিতভাবে বসিতে বসিতে বলিল, নাও, আর একটা কাঁপন হয়ে গেল, সেকেণ্ড দুয়েক ছিল বোধ হয়। তেতলা বাড়িটা ঘাড়ে না ফেলে নিষ্কৃতি দেবে না দেখছি।

বঙ্কিম বলিতে লাগিল, দেড়টার সময় মজঃফরপুরে এক্কা থেকে নামলাম। ঘোঁতনদের বাড়ি পর্য্যন্ত আগে এক্কা যেত, ভূমিকম্পের পর থেকে যাচ্ছে না। ইট, কাঠ, রাবিশ, এমন কি মানুষের—

পরেশ মুখটা বাড়াইয়া চোখ দুইটি বড় বড় করিয়া প্রশ্ন করিল, কোঠাবাড়ি বুঝি একটিও দাঁড়িয়ে নেই? রাস্তার বুঝি দু ধারেই—

বঙ্কিম পূর্ব্বের আক্রোশ মিটাইয়া একবারটি আড়ে চাহিয়া বলিল, সব তো খবরের কাগজেই পড়েছ।

আর সে শহরের বর্ণনার দিক দিয়াও গেল না। পরেশের উন্মুখ কৌতূহলকে খানিকটা অতৃপ্ত রাখিয়াই বলিতে লাগিল, ঘোঁতনদের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। তার মানে মজঃফরপুরের যে জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়ালে ঘোঁতনদের বাড়ি পৌঁছেছি বলা চলত, সেখানে গিয়ে রাশিকৃত ইটের স্তূপের মধ্যে তেরছাভাবে আটকানো একটা কড়িকাঠের ওপর দাঁড়ালাম। রাস্তার ধারের ওপরের ঘর দুটো প'ড়ে গেছে, দুটো ঘরের যত ইট নীচের তলার ছাদ ধসিয়ে দিয়ে, গলির দিকের দেওয়াল ঠেলে বেরিয়ে প্রায় সমস্ত গলিটা বুজিয়ে দিয়েছে। খুনে ইটের গাদা। ওপরতলা নিশ্চিহ্ন ক'রে স্রোতের মত নীচের লোকদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে খুনের নেশায় রাস্তা পর্য্যন্ত ছুটে এসেছে। মাঝখানে

শান-বাঁধানো উঠান ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। এক কোণে একটা টিউব-ওয়েল ছিল, প্রায় চার-পাঁচ হাত ভেতর থেকে ঠেলে তুলে দিয়েছে, পাম্পের হাতলটা মুখে ক'রে নলটা ধনুকের মত বেঁকে উঠোনের মাঝামাঝি এসে পড়েছে। একটা কাক তার ওপর ব'সে ছিল, আমি আসায় উড়ে যেতেই মাথাভারী নলটা ওপর-নীচেয় দুলতে লাগল। সেটা গৃহস্বামীর এই অতিথিকে অভ্যর্থনা করার ব্যঙ্গ-অভিনয়ের মত এমন অদ্ভুত দেখতে লাগল যে, আমি থাকতে পারলাম না একটু না হেসে। উঠোনের ওদিকে দুখানা ঘর, একটা বড় ঘর কোঠা, একটা খোলার চালের। চালটি ভেঙে, চারপাশের দেওয়াল কাত ক'রে নীচে পড়েছে, আর থেকে থেকে বালি উঠে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে সেটাকে আঁকড়ে ধরেছে। ওদিকটায় খুব বালি উঠেছে, টিউব-ওয়েলের গোড়া পর্য্যন্ত তার স্রোতে নেমে এসেছে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, কোঠাঘরটার কিছু হয় নি ; কিন্তু আমার তরফে আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই অক্ষত ঘরটাকে দেখে বেশ প্রীত হতে পারলাম না। কেন, তা ঠিক খুলে বলতে পারছি না, তবে মনে হচ্ছিল, ওর সৌভাগ্য বড় বেমানান। ওটাকে যেন একটা ভীষণতর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে হাতে রাখা হয়েছে। আমি টের পেয়েছি বটে, যাবও না কাছে, কিন্তু এক সময় না এক সময় কাল-নিয়ন্ত্রিত যে অজ্ঞাত লোকটি মোহাকৃষ্ট হয়ে ওর মধ্যে জীবন দেবে, তার জন্যে আমার মনটা বিষাদে ভ'রে উঠল।

সব দেখে শুনে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম ; হঠাৎ হুঁশ হ'ল, কাউকে ডাকা দরকার তো, কতক্ষণই বা এ রকম হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকব, আর থেকেই বা করব কি ? ডাকতে গিয়ে কিন্তু সমস্যা উদয় হ'ল, কার নাম ধ'রে ডাকি ? এই তো বাড়ির অবস্থা, এতে একজনও কি বাকি থাকতে পারে যে, আমার ডাকের উত্তর দেবে ? ঘোঁতনদের সবাইকেই আমি

জানি, পাতানো সম্বন্ধ ধ'রে কিংবা ছোটদের নাম ধ'রে ডাকতে পারতাম, কিন্তু ডাকা হয়ে উঠছিল না। যার কথাই ভাবি, কেবলই তার মুখটা মনে হচ্ছিল, আর ভয় হচ্ছিল, উত্তর পাব না। আর উত্তর পাচ্ছি না অথচ ডেকে যাচ্ছি, এ রকম বাতুলতার সম্ভাবনায় নিজের কাছে কুণ্ঠাও বোধ হচ্ছিল। শেষকালে মনে পড়ল, ঘোঁতনদের কাকা নিশ্চয় জীবিত আছেন, তাঁর চাকরি যে আপিসে সেটা ভাঙে-চোরে নি, আর ও-সময়টা তিনি সেখানেই ছিলেন। ডাকলাম, অবিনাশবাবু!

উত্তর পেলাম না। স্বরটা বিকৃত হয়ে কেঁপে যাওয়ায় তক্ষুনি আবার ডাকতেও পারলাম না। চারিদিক নিস্তব্ধ, জনমানব নেই, শুধু গলির শেষ দিকটায় একটি বেহারী ভদ্রলোক দুজন কুলি নিয়ে একটা বাড়ি পরিষ্কার করছিল, তিনজনেই কাজ ছেড়ে আমার দিকে একটু চেয়ে রইল।

একটু চেঁচিয়ে বললাম, ইস মাকানমে অবিনাশবাবু নামক—

সমস্ত শরীরটা ইলেক্‌ট্রিক শক পেয়ে যেন শিউরে উঠল। ঠিক পেছনেই ভারী আওয়াজ শুনলাম, অবিনাশবাবুকে খুঁজছেন? তিনি তো নেই।

ফিরে দেখি, একটি বাইশ-তেইশ বৎসরের যুবা, খালি পা, গায়ে একটা ছেঁড়া মটকার চাদর জড়ানো, ক্ষৌরের অভাবে মুখটা অল্প অল্প দাড়িতে ভ'রে গিয়েছে, তেলের অভাবে কোঁকড়া কোঁকড়া দীর্ঘ চুলগুলো ফুলে উঠে বয়সের অনুপাতে তাকে একটু যেন অতিরিক্ত ঢ্যাঙা ক'রে দিয়েছে।

আমি হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে বসলাম, নেই? তিনি কোথায় বলতে পারেন।

যুবা তার ফাঁপা চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে বেশ জোরেই হেসে উঠল। সে এক উৎকট হাসি, আওয়াজে যতটা না হোক, চোখের

চাউনিতে তো বটেই ; মনে হ'ল, তার চোখের ভেতর দিয়ে একটা পাগল হঠাৎ উঁকি মেরে যেন পরমুহূর্ত্তেই মিলিয়ে গেল। বললে, বেশ জিজ্ঞেস করছেন! আপনি অবিনাশবাবুর কেউ হন নাকি?

বললাম, না।

যুবক বললে, মিথ্যে কথা থেকে বাঁচালেন। কেউ হ'লে নিশ্চয় মিথ্যা বলতে হ'ত, কেন না সত্যি কথা শুনিয়ে কয়েকজনের যা অবস্থা করেছি, তাতে সত্যের ওপর আর টান নেই ততটা।

যুবক একটু কাষ্ঠহাসি হেসে মাটির পানে চেয়ে মাথাটা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে, কোথায় গেছেন জিজ্ঞেস করছেন? হ্যাঁ, আমার জানা উচিত ছিল বটে, কেন না আমার বাড়ি থেকে চার চার জন এই পথে আগেই গেছে, কিন্তু কেউ তো আর—

গলার স্বরটা বদলে গেল। একটু থেমে, রুদ্ধ গলা ঠেলেই বললে, মশাই, ছোট মেয়েটা পাঁচ দিন আগে একবার হারিয়ে গিয়েছিল—গলির শেষে হিন্দুস্থানীদের বাড়িতে চ'লে গিয়েছিল। বলেছিলাম, এবার যখন কোথাও যাবে বাস্থ, ব'লে যেও মা। এসে শুনলাম, ইটের গাদার মধ্যে থেকে অনেকবার 'বাবা' ব'লে ডেকেছিল, ব'লে যাবে ব'লে—

আমার প্রশ্নটা যে এমন ব্যথায় আঘাত দেবে, মোটেই আশঙ্কা করি নি। বললাম, শান্ত হ'ন, ভগবানের জিনিস ভগবান নিয়েছেন।

ছোকরা আমার দিকে একটু চেয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে যেন আপন মনেই বললে, ভগবান! হুঁ, ভগবান—ভগবান—

যেন তার অজ্ঞাতসারেই তার চোখ দুটো একবার চারিদিকের প্রলয়-শ্মশানের ওপর দিয়ে ঘুরে এল। অনেকক্ষণ দুজনেই চুপ ক'রে রইলাম।

বঙ্কিম ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরাইয়া তিন-চারিটা টান দিল।

দেরি হইয়া যাইতেছে দেখিয়া পরেশ বলিল, সেখানে যতটা চুপ ক'রে ছিলে, এখানে ঠিক ততটা না করলেও বুঝে নোব। তারপর?

সেই ছোকরাই আমায় অবিনাশবাবুর কথা বললে। খানিক দূরে একটা ইটের গাদার চারিদিকে কতকগুলো কাক বেজায় চেঁচামেচি করছিল, ছোকরা বললে, একটা মাড়োয়ারীর বাড়ি ছিল ওটা। পরশু মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা একজনকে টেনে তুললে। লোকটাকে যতই জিজ্ঞেস করে, আর কেউ আছে? সে শুধু কচি ছেলের মত হাত ঘুরোয়। আমার বিশ্বাস, কাকেরা একটার সন্ধান পেয়েছে।

আমি বললাম, চলুন, এখান থেকে স'রে যাই। ছোকরা আবার একবার তার সেই পাগলাটে অদ্ভুত হাসি হেসে বললে, স'রে আর মজঃফরপুরে কোথায় যাবেন? বরং চলুন ওই কাঠটার ওপর। অবিনাশবাবুর গল্পটা বলি, দেখেছেন আপনি অবিনাশবাবুকে?

আমি মিথ্যা ক'রে বললাম, না, দেখি নি।

বললে, একহারা চেহারা; কপালে শির-ওঠা; অল্প কিছুতেই বড্ড বেসামাল হয়ে যেত, আর কপালের শিরগুলো জেগে উঠত, বেজায় নার্ভাস প্রকৃতির লোক আর কি। ভূমিকম্পটা হ'ল ঠিক দুটো ষোলোয়; নিজে বাঁচতে বাড়ির ভাবনা এসে জুটল। এই ব্যাপার তো সেখানেও হয়েছে। আপিসে কাগজপত্র ফেলে পাগলের মত ছুটলাম। পৃথিবীর কাঁপন তখন আকাশে গিয়ে পৌঁছেছে, সমস্ত শহরের হাহাকারে মনে হয়, আকাশটা চুরমার হয়ে ভেঙে পড়বে। স্টেশন রোড দিয়ে মানুষের স্রোত শহরের দিকে ছুটে চলেছে, দু পাশে বাড়ি-ঘর-দোরের ভাঙনের বিকট দৃশ্য, এক-একটা দেওয়াল কি ছাদের কোণ তখনও ভেঙে ভেঙে পড়ছে, চারিধারে ধূলোয় ধূলো। স্টেশনের রাস্তা দিয়েই বোধ হয় আপনি আসছেন, না? স্টেশন থেকে খানিকটা এসেই একটা চৌমাথা

পড়ে, মাঝখানে টেলিগ্রাফের চারটে পোস্ট, তলাটা বাঁধানো। খানিকটা এগিয়ে এসেছি, এমন সময় কে ডাকলে, যদু! ফিরে দেখি, রাস্তার মাঝখানে সেই শান-বাঁধানো চত্বরটিতে অবিনাশবাবু ব'সে। গা-ময় সুরকির ধূলো, জামার একটা পকেট ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে। ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি খবর অবিনাশদা? আপনাদের বাড়ির আর সবার— ?

অবিনাশদার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, কপালের শির ফুলে উঠেছে, একটা ঢোক গিলে ভাঙা আওয়াজে বললে, যেতে পারছি না— কি হ'ল যদু, কি হবে ?

জিজ্ঞেস করলাম, পায়ে লেগেছে ?

বললে, না, বেঁচে গেছি, কিন্তু পা উঠছে না। এতটা তো এলাম কোন রকমে, কিন্তু—

ওঁর সেই নার্ভাস্‌নেস, অনিশ্চিতের সামনে এগুতে পারছেন না। হাতটা ধ'রে একটা টান দিয়ে বললাম, উঠুন শিগগির, এ কি করছেন ? আচ্ছা দুর্ব্বলচিত্ত লোক তো !

তুলতে পারলাম না, উঠলও না, ফ্যালফ্যাল ক'রে চারদিকের ভাঙা বাড়িগুলোর দিকে চেয়ে বললে, কি দেখব বল তো যদু গিয়ে? এই সময় সব ওপরের ঘরে নিশ্চিন্দি হয়ে শোয়; কি হ'ল, কি হবে ?

আমাদেরও ওপরে একখানা চালাঘর। আর দাঁড়াতে না পেরে একবার খাতিরের বলা বললাম, চলুন না ছাই। তারপর পা বাড়ালাম।

অবিনাশদা বললে, উঠতে পারছি না যে! পা কাঁপছে, ঠিক যে কাঁপছে তা নয়, কেমন অবশ হয়ে গেছে।

আমি একটু এগিয়ে গেলে ভাঙা গলায় খুব জোর দিয়ে ডাকলে, যদু!

ফিরে দাঁড়ালাম, বললাম, কি ?

আমায় ব'লে যেও, এইখানেই রইলাম।

সামনের চুলগুলো মুঠোর মধ্যে ধ'রে মাথাটা হাঁটুর মধ্যে গুঁজে দিলে—এখনও অবিনাশদাকে যেন দেখতে পাচ্ছি সেই অবস্থায়।

আগেই অবিনাশদার বাড়ি পড়ে, আমার বাড়িটা গলি শেষ ক'রে বাঁ দিকে ঘুরতেই। এসে দেখলাম, এই অবস্থা। ইট ভেঙে, দরজা, জানলা, কড়িকাঠ ডিঙিয়ে, নৰ্দ্দমায় প'ড়ে বাড়ির দিকে ছুটলাম। যা দেখলাম, তা বলেইছি আপনাকে।

ছোকরা আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রইল, সেই অদ্ভুত দৃষ্টি, যেন আমার মুখের ওপর সেই পুরনো দৃশ্যটার ছায়া পড়েছে, একদৃষ্টে দেখছে। পরে চোখ দুটো ঘুরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, বিড়ি রাখেন ?

আমি কেস থেকে একটা সিগারেট বের ক'রে দিতে ছোকরার মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যেন কি জিনিস পেয়েছে! লোকে একমুঠো খেতেই পাচ্ছে না, তা—

সিগারেটটা ধরানো পর্য্যন্ত কিন্তু আনন্দটা বজায় রাখতে পারলে না, চোখ দুটো জলে ছাপাছাপি হয়ে উঠল। কিছু না ব'লে মটকার চাদরটা দিয়ে মুছে নিয়ে, ফোঁস ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিগারেটটা টানতে লাগল। বুঝলাম, ও যে আজ ভিখিরী, অল্পেই বর্ত্তে গেল, এইটে ওকে মর্ম্মান্তিক আঘাত দিয়েছে; ওর আনন্দের আসল রূপটা চিনতে পেরে ওর এই চোখভরা জল। আমিও একটা সিগারেট ধরিয়ে নিঃশব্দে টানতে শুরু ক'রে দিলাম। সান্ত্বনা দিতে গেলে আরও জিনিসটা ফুটিয়ে তোলা হ'ত।

নখের কোণে যখন আর শেষটুকু ধ'রে রাখতে পারলে না, তখন ফেলে দিলে সিগারেটটা। গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বেশ সহজভাবে

বললে, বাড়ির হিসেব যখন সেরে ফেললাম, বেশ সন্ধ্যা হয়ে গেছে ; হঠাৎ কর্ত্তব্যজ্ঞান চাগিয়ে উঠল, অবিনাশদা ব'সে আছে যে আমার পথ চেয়ে! সে বেঁচে গেছে দুর্ভাগ্যক্রমে, তাকে তো সব স'য়ে বেঁচে থাকতে হবে। লোকটাকে নিয়ে তো আসি অন্তত। গোয়াল-ঘরটায় সবাই গোছগাছ ক'রে নিয়েছে,—নতুন গৃহপ্রবেশ! পিসীমাকে বললাম, আমি এক্ষুনি আসছি।

বাইরে পা দিতেই কিন্তু গাটা ছমছম ক'রে উঠল। নিস্তব্ধ। লোক নেই, রাস্তা নেই, শব্দ নেই ; সব—যেন শব্দ পর্য্যন্ত কবরের মাটিতে চাপা পড়েছে। কিন্তু কর্ত্তব্য আমায় ভূতের মত টানতে লাগল। পকেটে একটা টর্চ ছিল, সেই দিন সকালেই কিনি, হঠাৎ কি রকম ইচ্ছে হ'ল, ইন্‌টুইশন বলতে পারেন—অজ্ঞাতের নির্দ্দেশ। সেইটে হাতে ক'রে আলেয়ার মত জ্বালতে জ্বালতে এগুলাম। ওইখানটায় এসে দেখি, কে একজন একখানা একখানা ক'রে ইট তুলে গলির ওপর ফেলছে, টর্চ ফেলে দেখি অবিনাশদা।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ডাক দিলাম। মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল, বললে, বড্ড দেরি হয়ে গেছে যদু, তাই তাড়াতাড়ি ইটগুলো সরাচ্ছি। কি হ'ল বল তো, কি হবে? সত্যিই বড্ড দেরি হয়ে গেছে কি?

আমি ব'লে ফেললাম, সবাই ভাল আছে যে। বোধ হয় সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই বললাম, কিংবা এখন মনে হচ্ছে, যেন গোলমালের মধ্যে কার মুখে শুনেছিলাম কথাটা, অথচ মনে আবছা দাগ রেখে মুছে গিয়েছিল। যা হোক, কথাটা ব'লেই কিন্তু হঠাৎ থেমে গেলাম, কেন না কোথা থেকে বললাম, নিজেই ধরতে পারলাম না। অবিনাশদা একখানা ইট হাতে তুলে আস্তে ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কোথায় আছে?

আমি একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, চলুন তো; উঠোনের দিকে যাই একবার।

অবিনাশদা 'চল' ব'লে হনহন ক'রে এগিয়ে, হোঁচট খেয়ে, আবার উঠে চলল। দুজনে অনেকটা তফাত হয়ে গেছি, হঠাৎ 'কে?' ব'লে অবিনাশদা চেঁচিয়ে উঠল। থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে, আমার দিকে চেয়ে বললে, দেখ তো কে, যদু?

সত্যই একটা লম্বা ছায়া দাঁড়িয়ে উঠোনের মাঝখানে। হঠাৎ পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত যেন ভয়ে অবশ হয়ে গেল। সাহস সঞ্চয় ক'রে দু পা এগিয়ে টর্চটা সামনে ফেললাম, দেখি, ওই টিউবওয়েলটা লম্বা বক্রাকার হয়ে শুঁড় নামিয়ে রয়েছে। সন্দেহটা তক্ষুনি কেটে গেল বটে, কিন্তু এই উপলক্ষ্যতেই সমস্ত বাড়িটার ওপর যেন অবিশ্বাসে মনটা ভ'রে গেল। অবিনাশদা এগিয়ে এসে, হঠাৎ ঝুঁকে এই কাঠটায় একটু কান লাগিয়ে রইল; যেন কারুর বুকে যদি সেটা স্পর্শ ক'রে থাকে তো এই কড়িকাঠ বেয়ে তার ধুকধুকুনি শুনতে পাবে। মাথা খারাপ হয়ে গেছে আর কি!

একবার চেঁচিয়ে উঠল, বাড়িতে আছ কি? কোথায় আছ, সাড়া দাও।

সাড়া না পেয়ে আমার মুখের দিকে চাইলে। ক্রমে ক্রমে মুখে চোখে যেন একটু বুদ্ধির ভাব ফুটে উঠল, চোখ দুটো বড় বড় ক'রে বললে, ঘুমিয়েও তো পড়তে পারে যদু, ঠিক নয় কি? ঠিক বলছি না?

টর্চ ঘোরাতে ঘোরাতে আমার তখন ইটের গাদার আড়ালে ওই ঘরটায় নজর পড়েছে। বললাম, হতেও পারে, চলুন তো, ওই ঘরটা যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে ব'লে বোধ হচ্ছে।

অবিনাশদা আমার হাত থেকে টর্চটা ছিনিয়ে নিলে, হাতটা তার

থরথর ক'রে কাঁপছে। চঞ্চল আলোটা ঘরের কোণটাতে ফেললে, তখন ঘরের সামনে কতকগুলো ইট দরজা জানলা প'ড়ে ছিল ব'লে সমস্ত দেখা যাচ্ছিল না। এই উঠোনটা দুটো লাফে পেরিয়ে টিউবওয়েলের হাতলের একটা চোট খেয়ে ওই ঘরের সামনে গিয়ে উঠল। পেছনে পেছনে আমি। সেই নার্ভাস অবিনাশদা, তার গায়ে হঠাৎ এত শক্তি এল কোথা থেকে, অমন চোটটাকেও গ্রাহ্য করলে না!

গিয়ে দেখি, ঘরটা ঠিক আছে; কিন্তু দোরটা ভেতর থেকে বন্ধ। অবিনাশদা জোরে উপর্য্যুপরি তিন-চারটে ঘুষি মেরে বললে, ওগো, শিগগির দোর খোল, আমরা। রাজু! অনাথ!

খুলবে কি, দুটো দরজার মুখ যা আধ-ইঞ্চিটাক ফাঁক ছিল, ভেতর থেকে দোর চেপে কে যেন নিশ্চিহ্ন ক'রে সেটুকুও বুজিয়ে দিলে! কট কট কট ক'রে আওয়াজ হ'ল, আর আমার টর্চের যে আলোটুকু ভেতরে প্রবেশ করেছিল, কার তাড়া খেয়ে যেন বন্ধ দোরের ওপরে এসে জ'মে রইল। দুজনে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে দুজনের মুখের দিকে চাইলাম। আলো ঠিকরে অবিনাশদার কপালে পড়েছে, শিরগুলো যেন এই ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ে ব'লে।

গলার আওয়াজ ব'সে গেছে; বললে, কে আরও চেপে দিলে ভেতর থেকে?

আমারও প্রশ্ন তাই, কিন্তু ওকে জিজ্ঞেস ক'রে আর কি করব! ঘরটার সামনের দিকে জানলা নেই, ওপাশটা স্তূপাকার ইট এসে দেওয়ালে চেপে পড়েছে। ডান দিকটা ঘুরে গেলাম; একটা ছোট জানলা আছে, খোলাও; তাড়াতাড়ি টর্চ ফেলতে আলোটা হাতখানেকের মধ্যেই একটা তক্তার ওপর গিয়ে পড়ল। অবিনাশদা হতাশভাবে বললে, সেই আলমারিটা, ও নড়ানো যাবে না। তারপর জানলার কাছে মুখ

দিয়ে চাপা আওয়াজটাকে সাধ্যমত তুলে ডাকলে, শুনছ? আমি ডাকছি, এই কি ঘুমোবার সময়?

আমার দিকে চেয়ে বললে, হয়তো ঘুমুচ্ছে না; কিন্তু দোর এঁটে দিলে কেন? কে?

অবিনাশদার চোখ দুটো হঠাৎ অস্বাভাবিক রকম বড় হয়ে টর্চের আলোয় জ্বলজ্বল ক'রে জ্বলতে লাগল। ডান হাতে আমার হাতটা চেপে বললে, যদু, তুমি ওসব কথায় বিশ্বাস কর?

আমি শুধু অবাক হয়ে লোকটার ভয়ঙ্কর আকৃতির দিকে চেয়ে রইলাম। অবিনাশদা বললে, মেরে ফেলবে। আজ ভরা জীবনের মাঝখানে, দু মিনিটে একেবারে অতর্কিতে যারা শেষ হয়েছে, তারা আক্রোশে কাউকে বাঁচতে দেবে না। দেখলে না, দোরে ঘা পড়তেই চেপে এঁটে দিলে!

আমার মুখের দিকে চেয়ে কি ভাবলে—এক মুহূর্ত্তটাক, তারপর উঠে প'ড়ে ইটগুলোর ওপর হামাগুড়ি দিয়ে দোরের সামনে হাজির হ'ল। আমি একটু পেছিয়ে পড়েছিলাম, সেই চাপা, ঠেলে-বের-করা আওয়াজে ডাকলে, শিগগির এস যদু। ওগো, ঘুমিও পরে, এ আমরা। গিয়ে দেখি, একটি দোরের দুখানা তক্তার জোড়ের মুখে পেন্সিল গলার মত যে সামান্য একটু ফাঁক আছে, অবিনাশদা তাতে মাথার এক পাশটা চেপে সমস্ত মনটা যেন ঘরের ভেতর সাঁদ করিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দোরের সঙ্গে যেন একেবারে মিশে যেতে চায়।

বললাম, কি?

খানিকক্ষণ কিছু বললে না, শুধু রগ কান আর গলাটাকে দোরের ওপর আরও চেপে ধরলে, তারপর হঠাৎ স'রে এসে বললে, যদু, শোন তো। বেঁচে আছে, বেঁচে আছে। সত্যি বেঁচে আছে।

কাঠ চিরতে চিরতে করাতটা শক্ত গাঁঠে ঠেকলে হঠাৎ আওয়াজ যেমন কড়া হয়ে ওঠে, অবিনাশদার শেষের কথাগুলো সেই রকম বিকট হয়ে উঠল। আমি গিয়ে সেই জোড়ের মুখে কান দিলাম।

সত্যি নিশ্বাসের শব্দ। সি-সি-সি ক'রে স্পষ্ট নিশ্বাসের শব্দ—এক-আধটা নয়, অনেকগুলি নাক থেকে ; তার সঙ্গে বেশ একটা অদ্ভুত শব্দ—ঘির্-র্ ঘির্-র্ ঘির্-র্—এক-একবার ক্ষীণ হয়ে পড়ে, এক-একবার ভারী নাক-ডাকার শব্দের মত মনে হয়, আবার একবার মনে হয়, যেন গলার ঘড়ঘড়ানি।

অবিনাশদার পানে চাইলাম। চিনতে পারা যায় না, যেন কপালের শিরগুলো দপদপ করছে, সমস্ত শরীরের রক্ত গিয়ে মাথায় ঠেলে উঠেছে। বললে, দেখলে তো? দেবে না বাঁচতে, দোর চেপে ধরছে, উত্তরও দিতে দেবে না, গলা চেপে ধরেছে!

হঠাৎ বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সমস্ত শরীর কাঁপছে, একবার একটা ইটের চাই আঁকড়ে ধরলে, একবার একটা ভাঙা কড়িকাঠ, তারপর ঘুরে সমস্ত শরীরের জোর দিয়ে দোরটার ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ; আমায় হুকুম করলে, ঠেল যদু, দেখছ কি হাঁ ক'রে, ভেঙে ফেল, বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে।

একটু হাত লাগালাম, কিন্তু অসম্ভব। যত এদিক থেকে জোর দিই, ততই যেন ভেতর থেকে কারা ঠেলে ধরে ; তাদের ক্ষমতার সামনে আমাদের শক্তির তুচ্ছতা যেন প্রতি মুহূর্তেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

আমি ছেড়ে দিয়ে বললাম, দাঁড়াও অবিনাশদা, এ ক'রে হবে না। দেখি, অন্য কোনখান দিয়ে ভেতরে যাওয়া যায় কি না। যদি ছাতটাও একটু ভেঙে থাকে—

অবিনাশদা গেল না, ওই কাঠটার ওপর ঠেলে চাড়া দিতে লাগল,

আমি ডান দিকটা ঘুরে ওদিককার ইটের গাদার ওপর উঠলাম। ছাতে ওঠা যায় না। নেমে পেছন দিকটায় গেলাম। একটা ভাঙা কড়িকাঠ বেয়ে ওপরে উঠতে যাব, এমন সময় দোরের ওদিক থেকে, করাত দিয়ে পাথর কাটলে যেমন আওয়াজ হয়, সেই রকম একটা উৎকট আওয়াজ হ'ল হ-য়ে-ছে, হুঁ-ম—

ইট-কাঠ দোর-জানলা ডিঙিয়ে ফিরতে মিনিট খানেক কি দেড় মিনিট দেরি হয়েছিল। এসে দেখি, অবিনাশদা দোরের চৌকাঠের ওপর হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে রয়েছে, হাত দুটো আর মাথাটা দোরে লাগানো রয়েছে, তার অমানুষিক শেষ শক্তিতে দরজাটার নীচের পুরানো কব্জাটা আলাদা হয়ে, চৌকাঠের কাছে দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে গেছে।

গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাকলাম, অবিনাশদা! শরীরটা গড়িয়ে পড়ল।

ছোকরা আমার দিকে খানিকটা সেই রকম আবিষ্টভাবে চেয়ে রইল, তারপর বললে, সিগারেট দিন আর একটা। চলুন, আর দাঁড়িয়ে কি হবে এখানে?

আসতে আসতে বলতে লাগল, একলা আর সেখানে দাঁড়াতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি কোন গতিকে ফিরে গেলাম। জন আষ্টেক লোক যোগাড় হ'ল, আর দুটো শাবল। অবিনাশদার শরীরটাকে সরিয়ে রেখে, দোর দুটো ভাঙা হ'ল।

কোথায় কে? ভেতরে শুধু গাদা-প্রমাণ বালি। ঘরের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ঠেলে উঠে আসবাবপত্র ডুবিয়ে দোর চেপে ধরেছে। ভিজে বালি শুধু, তিন-চারটে মুখ দিয়ে তখনও ঘোলাটে জলের সঙ্গে আরও বালি বেরুচ্ছে। একটা টানা আওয়াজ—সি-সি-সি। জলের স্রোত ঘরের দু-তিনটে ফাটল বেয়ে চাপা কুল-কুল আওয়াজ করতে করতে ঘুরে পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই শব্দসমষ্টিকে ভুল ক'রেই

অবিনাশদা প্রাণ দিলে। পরের *দিন খোঁজ পাওয়া গেল, বাড়ির সব* ছেলে-মেয়েরা কোন রকমে—

এমন সময় টেন্‌টের পর্দ্দা নড়িয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোঁতন অর্দ্ধেক শরীর প্রবেশ করাইয়া প্রশ্ন করিল, তোরা জেগে এখনও? ফিরে এলাম, ষ্টীমারে উঠতে যাব, দেখি, কাকা নামছেন। আজ ভোরে মজঃফরপুর থেকে বেরিয়েছেন, এখন পৌঁছলেন। ছ-সাত ঘণ্টার রাস্তা আঠারো-কুড়ি ঘণ্টা লেগে গেল। হ্যাঁ, খবর ভাল, বাড়িটাও বেঁচে গেছে এক রকম। খোকা, একটু চা চড়াও ভাই। কাকা, আসুন ভেতরে।

খোকা, পরেশ, মৃগেন পরস্পরের প্রতি চাহিয়া, একসঙ্গে বঙ্কিমের মুখের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। সে বেশ সপ্রতিভভাবেই বলিল, আমারও এক কাপ হ'লে ভাল হয়।

মৃগেন ধীরে ধীরে বলিল, তোমায় যে বললে গল্পটা, সে লোকটা তা হ'লে বোধ হয় বাইরের লোক ছিল, কিংবা বদ্ধ পাগল।

খোকা স্টোভ জ্বালিতেছিল, রাগে গরগর করিতে করিতে বঙ্কিমের দিকে কটাক্ষ হানিয়া বলিল, সে লোকটা ছিলই না মোটে, লোকের প্রাণ যায়, আর উনি খবরের কাগজ প'ড়ে প'ড়ে উপন্যাস রচনা করছেন!
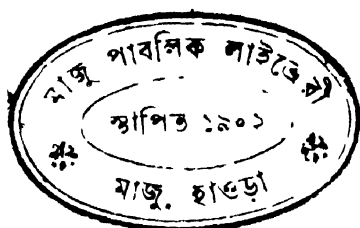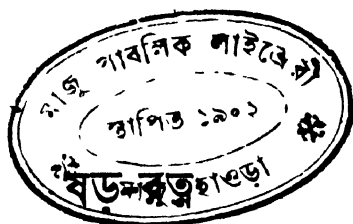
১

চড়াইডাঙার নয়-আনা তরফের মালিক গদাধর পাল চৌধুরীর সম্বন্ধে লোকে যখন একান্তে কথাবার্ত্তা কয়, তখন তাঁহার নামটা বিকৃত করিয়া তাঁহাকে পালের গোদা বলিয়া প্রায় অভিহিত করিয়া থাকে; কারণ একে তো পাল চৌধুরীর সব শরিকানরাই দারুণ উৎপীড়নের জন্য অপযশস্বী, তাহার উপর ইনি আবার সকলের উপর এককাঠি বেশি যান।

যথারীতি সভা বসিয়াছে, কিন্তু ওই কেবল বসিয়াছে পর্য্যন্তই—তেমন জমিতেছে না।

প্রথমত, অনেকদিন যাবৎ তেমন বড়-গোছের মকদ্দমা হাতে না থাকায় পাত্রমিত্রদের মধ্যে এক রকম আন্‌এম্‌প্লয়্‌মেণ্ট প্রব্লেম অর্থাৎ বেকার-সমস্যা পড়িয়া গিয়াছে; আর দ্বিতীয়ত, সাড়ে তিন আনা তরফের নিকট অমন সাজানো দেওয়ানিটা হারিয়া অবধি চৌধুরী মহাশয়ের মনেও আর সুখ নাই; সংসারটা যেন গজভুক্ত কপিত্থবৎ অসার বোধ হইতেছে। সভাসদেরা, জজ-সাহেবের ও-তরফের নিকট মোটা টাকা খাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ময়নাগাছিতে ছাগলীর পেটে উটের বাচ্চা এবং ইসলামপুরে কাঁঠালগাছে কলার কাঁদি পর্য্যন্ত অনেক 'প্রত্যক্ষ' ঘটনার অবতারণা করিয়াছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন ফল হয় নাই। 'মহারাজে'র সেই একই ভাব—বিষণ্ণ বদন, বেশি কথা নাই; কল্পকথার বিরহিণী রাজকন্যার মত কোন ঔষধই আর তাঁহার লাগিতেছে না। এদিকে বৈদ্যরাজেরাও বসিয়া প্রমাদ গনিতেছে।

যাদব হালদার আর ঘোষাল মহাশয় একটা খুব গুরুতর বিষয় লইয়া

হাত-মুখ নাড়িয়া সুস্পষ্ট চাপা গলায় জোর আলোচনা লাগাইয়াছে, আর চৌধুরী মহাশয়ের উপর এই থিয়েটারী 'একান্তে'র প্রভাব কিরূপ হইতেছে লক্ষ্য করিবার জন্য মাঝে মাঝে তাঁহার পানে তির্য্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। চক্রবর্ত্তী, চৌধুরী মহাশয়ের তৈলচিত্রটার দিকে ভাবগদ্গদ নয়নে অনেকক্ষণ হইতে চাহিয়া আছে। তর্কালঙ্কার আসিয়া অবধিই নানাবিধ ভোজ্য এবং অনেক নামজাদা ভোজন-বিলাস ও ভোজন-বিশালদের রোমাঞ্চকর গল্প জমাইবার প্রয়াস করিয়া এ পর্য্যন্ত বিফল-মনোরথ হইয়াছে। বুড়া আঙুলের ঠেলায় নাকে একরাশ নস্য চালান দিয়া শ্বাসের মত একটা টান দিল, তাহার পর হাতটা সশব্দে ঝাড়িয়া সজলনেত্রে আবার কি একটা শুরু করিতে যাইবে, এমন সময় 'ইস' করিয়া সভার মাঝে একটা দীর্ঘ শব্দ উঠিল। সকলে এককালীন অবধূতের পানে উৎসুক নেত্রে ফিরিয়া চাহিল। চৌধুরী মহাশয়ও মৌনভঙ্গ করিয়া বলিলেন, কি হ'ল আবার ?

অবধূত একটা চার-হাত পাঁচ-হাত সাপ্তাহিক খবরের কাগজের উপর আগ্রহের সহিত হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া ছিল। কাগজটার একটা জায়গায় আঙুল দিয়া তর্কালঙ্কারকে বলিল, আমি গোটা তিনেকের অর্ডার দিচ্ছি, তোমার জন্যেও একটা লিখে দোব নাকি ?

তর্কালঙ্কার প্রথমে হাঁ না কিছুই না বলিয়া গভীর অভিনিবেশের সহিত কয়েক সেকেণ্ড লাইনটার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিল, তাহার পর বলিল, যা বলছে, যদি তাই হয় তো একটা কেন, আবার জন্যেও গোটা তিনেক লিখে দিল না।

গোঁসাই বলিল, ব্যাপারটা কি ? মহারাজ যখন জানতে চাইছেন—

চৌধুরী মহাশয় অভিমানে মুখটা অন্ধকার করিয়া কহিলেন, না, থাক্ ; গদাধর সাড়ে তিন আনির কাছে হেরে অবধি তার কি আর পদার্থ আছে

যে, লোকে সেটার কথায় আবার কান দেবে? নেহাত বেহায়া আমি, তাই—

অবধূত বলিল, এই দেখ দিকিন! ছেলেমানুষ তোমরা, ছুট বলতে তোমাদের অভিমান হয়ে পড়ে; আর গোঁসাইয়েরও ফোড়ন দেওয়া একটু চাই-ই। না হয় বললাম; কিন্তু তোমাদের ব'লে হবে কি? কবচ-টবচ তোমরা নব্যেরা কি বিশ্বাস কর? হেসেই উড়িয়ে দিতে। কাজ কি বাপু? ও আমাদের সেকেলেদের মধ্যে থাক্‌গে, ওল্ড ফুলের দল আমরা।

সকলেরই চৌধুরী মহাশয়ের বয়স সম্বন্ধে এখানে ভ্রম দাঁড়াইয়া যাইতে পারে বলিয়া জানাইয়া রাখা দরকার যে, তিনি দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বেই পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। অবধূত বরং দুই-তিন বৎসরের ছোট হইতে পারে।

এতক্ষণ পরে চৌধুরী মহাশয়ের মুখটায় একটু হাসি ফুটিল, গোঁফ কয়টা প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল এবং চোখের পাশে, গালে, কপালে কতকগুলা পরিচিত রেখা জাগিয়া উঠিল, কহিলেন, শুনছ চক্কোত্তি, অবধূত মশায়ের কথা শুনছ একবার? চল্লিশ কবে পেরিয়ে গেল, আর আজ বলেন কিনা ছেলেমানুষ, হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। তোমরাও সব ওই এক দলের, আমিই মিথ্যেবাদী। কই, কি আবার এক মান্ধাতার আমলের কবচ আপনি টেনে বের করলেন? মনের বিশ্বাসের ওপর তো কারুর জোর নেই; কিন্তু না হয় শুনলামই বা একবার, কই রে, অবধূত মশায়ের জন্যে যে বড় তামাকটা আনালাম অত ক'রে—

অবধূত, চক্রবর্ত্তীর দিকে কাগজটা ঠেলিয়া দিল, বলিল, তবে শুনিয়ে দাও; আমার চোখ জোড়াটা আনতে ভুলে গেছি। চৌধুরী মহাশয়ের অলক্ষিতে ঘোষালের দিকে একটা বিজয়ের কটাক্ষ হানিল, ভাবার্থ টা, দরবার এই একে বলে।

চক্রবর্ত্তী একটা দড়ি-বাঁধা চশমা মাথায় গলাইয়া পড়িতে লাগিল—

"সত্বর হউন ! হেলায় হারাইবেন না !! মুহূর্ত্তের বিলম্বে
জীবন-ব্যাপী অনুশোচনা !!!

মহাবিঘ্নহর কবচ

বা

ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষের একত্র সমাবেশ !!!

মানুষ সংসারে চায় কি ? চায় সুখ শান্তি বৈভব, চায়
পুত্রকন্যা-গলগ্রহ—"

সকলে সাশ্চর্য্যে 'অ্যাঁ !' করিয়া উঠিল।

চক্রবর্ত্তী ঝুঁকিয়া পড়িয়া শুধরাইয়া লইল, পুত্রকন্যা, কল—ত্র, ছাপাটা ধেবড়ে গেছে, হ্যাঁ,—

"মানুষ সংসারে চায় কি ? চায় সুখ শান্তি বৈভব, চায় পুত্রকন্যাকলত্র। কিন্তু কি পায় ? নিরাশা। আকুল আবেগে মানুষ ঐহিক সুখের মৃগ-তৃষ্ণিকার পশ্চাতে ছুটিতেছে, ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর, রক্তাক্ত-চরণ ; কিন্তু হায় সুখ, তুমি কোথায় ? দরিদ্রের হাহাকারে, চিররুগ্নের আর্ত্তনাদে, লাঞ্ছিতের মর্ম্মব্যথায়, অপুত্রকের হতাশ্বাসে এবং মামলাকারীর উষ্ণশ্বাসে সংসার শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ধর্ম্ম আজ হতমাহাত্ম্য, পাপীর বিজয়োল্লাসে ধরণী মুখরিত ; অর্থ পরহস্তগত, মারোয়াড়ী আর ভাটিয়া মিলিয়া দেশকে লুণ্ঠিত করিতেছে ; কাম, অনঙ্গ বিকলাঙ্গ, অকালবার্দ্ধক্যে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা যৌবনসুখে বঞ্চিত।"

তর্কালঙ্কার। বাঃ, ভাষার চটক আছে !

চক্রবর্ত্তী। আর মোক্ষ ?

"সে দুঃখের কথা আর নাই বা তুলিলাম। আমরা প্রতিদিন কি দেখিতেছি ? দেশময় পর্ণকুটীর হইতে ক্রোড়পতি পর্য্যন্ত প্রত্যহ

যাঁহারাই মকদ্দমা করিতেছেন, তাঁহাদের ঠিক অর্দ্ধেক লোক মকদ্দমায় হারিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন। বড় বড় উকিল ব্যারিস্টারদিগের ওজস্বিনী বক্তৃতায় কিছুই ফল হইতেছে না। বাকি অর্দ্ধেকের জয়োল্লাসও নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, আপীল আছে, প্রিভি কাউন্সিল আছে। সোনার ভারত আজ গ্রহবৈগুণ্যে বিপর্য্যস্ত। শুধু ভারত বলি কেন, পৃথিবীর সমস্ত দেশেই এই এক কাহিনী, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, ইউরোপ, চীন, জাপান, নিউ ইয়র্ক, ম্যাডাগ্যাস্কার যেখানেই নয়ন ফিরাই, এই এক করুণ অন্তর্দাহের প্রতিধ্বনি। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজি জ্ঞান-বিজ্ঞানের লীলাভূমি, কিন্তু জীবনের এই মহাসমস্যার কোন সমাধান করিতে পারিয়াছে কি? ত্রিতাপদগ্ধ মোহান্ধ মানবের মনে কিছুমাত্রও শান্তি-সলিল সিঞ্চন করিতে সমর্থ হইয়াছে কি? হয় নাই। এ শক্তি ভগবান এই লাঞ্ছিতা পরপদদলিতা দারিদ্র্যপিষ্টা ভারতমাতাকেই দান করিয়াছেন। আর সেই ভারতের মধ্যেও শুধু আমরাই ভগবৎ-কৃপায় মানবমণ্ডলের যাবতীয় বিঘ্ননাশকরণান্তর তাহাকে চতুর্ব্বর্গ ফলের অধিকারী করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।

"আমাদের মহাবিঘ্নহর কবচ ধারণে ত্রিরাত্রি অন্তে মানুষ দৈব ও আধিভৌতিক সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি হইতে মুক্ত হইয়া নিরুদ্বেগে কালাতিপাত করিতে পারে। ইহাতে মকদ্দমায় জয়লাভ; সাহেবের সুদৃষ্টি; শত্রুনাশ; কলেরা, বসন্ত, কালাজ্বর, প্লেগ, বেরিবেরি, মৃতবৎসা প্রভৃতি মানুষের যাবতীয় রোগ অচিরে বিনষ্ট হইয়া মানবশরীর যৌবন-শ্রীতে মণ্ডিত করে। ভূত, প্রেত, পিশাচ, অগ্নি, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, সর্পাঘাত, মোটরের টায়ার ফাটা, বজ্রাঘাত প্রভৃতি আকস্মিক বিপদ হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকা যায়। ইহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, বশীকরণ, বাজীকরণ, নষ্টসম্পত্তির পুনরুদ্ধার, দৈব অর্থলাভ, গবাদি গৃহপালিত জন্তুর

নিরুদ্দেশ প্রভৃতি ব্যাপারে ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ। এক কথায় ইহা ত্রিকালজ্ঞ ঋষিকল্পিত তেজোগর্ভ মন্ত্রশক্তি এবং অধুনাতন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত রসায়নশক্তির অচিন্ত্যপূর্ব্ব একত্র সমাবেশ। যথাবিধি পুরশ্চরণ ও ভক্তি-পূর্ব্বক দেবীচরণে মানসিক করিয়া এই পরমাশ্চর্য্যময় কবচ অঙ্গে ধারণ করিতে হয়। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান কাহারও ইহা ধারণে কোনই প্রতিবন্ধক নাই।"

চৌধুরী মহাশয় গভীর মনোনিবেশের সহিত শুনিতেছিলেন। অবধূতের দিকে চাহিয়া বলিলেন, বিশ্বাস আমি একবিন্দুও করি না, তা যাই মনে করুন। তা হ'লেও না হয় আপনাদের পেড়াপীড়িতে একটা আনালাম। তারপর? এটা খেও না, কবচ প'চে যাবে, এটা ক'রো না, অনাচার হয়ে পড়বে—এই সাত-সতরো বখেড়া করতে থাকবেন তো? তার চেয়ে যেমন আছি, তেমনিই থাকি বাপু; সাড়ে তিন আনিই সব মকদ্দমা জিতুন, আমার অত—

অবধূত বড়-তামাক সেবনে আরক্ত চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া বলিল, সে কথা তো স্পষ্টই লিখেছে; তবে আর বলছি কি? চক্রবর্ত্তী বুঝি সে কটা লাইন ছেড়ে এসেছ? তা তুমি পার, 'কলত্র'কে 'গলগ্রহ' ব'লে যেমন আরম্ভ করেছিলে! কই, দাও দিকিন, দেখি আমি।

কাগজটার উপর দ্রুত আঙুল চালাইতে চালাইতে অবধূত পড়িতে লাগিল—মানুষের···পশ্চাতে···মারোয়াড়ী ভাটিয়া···হুঁ—উঁ—উঁ—উঁ ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ এ—ই—এই যে স্পষ্ট বলছে—

"ইহাতে আহার-বিহার প্রভৃতি মানবের ন্যায্য উপভোগ্য কোন বিষয়েই নিয়মের কোন অযথা বন্ধন নাই। সকলেই আনন্দের সহিত ভোগবিলাসে জীবন যাপন করিতে পারেন, কারণ ইহার দৈবশক্তিগুণে সমস্ত আচার-অনাচারই শুদ্ধ সত্ত্বগুণান্বিত হইয়া পড়ে।"

ওহে চক্কোত্তি, সকলের আগে তোমার একটা আনতে দেওয়া দরকার—চশমাতে আর বল নেই।

চক্রবর্ত্তীর কোলে কাগজটা ফেলিয়া দিয়া গোপনে একটা টিপুনি দিয়া দিল।

তর্কালঙ্কার হাতে খানিকটা নস্য ঢালিয়া বলিল, নব্যন্যায়দীপিকায় ওই রকঁব এক কবচ প্রলয়লের রীতি বর্ণিত আছে বটে, তাতে আঁবিষ আহার করলেও নিরাঁবিষের ফল হয়; এ দেখছি তা হ'লে—

গোঁসাই উৎসুকভাবে বলিল, বটে! অথচ আমিষের স্বাদ ঠিক থাকে?

অবধূত খিঁচাইয়া বলিল, হ্যাঁ, ঠিক থাকে, অমনই নোলায় জল এল! আগে শোনই না সবটা। কই হে চক্কোত্তি?

গোঁসাই রাগিয়া উঠিয়া কি বলিতে যাইতেছিল; চক্রবর্ত্তী পড়া শুরু করিয়া দেওয়ায় অবধূতের পানে কটমট করিয়া চাহিয়া থামিয়া গেল।

চক্রবর্ত্তী পড়িয়া চলিল—

"মহাবিঘ্নহর কবচের যশ বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি দক্ষিণ চীনের সহিত উত্তর চীনের মহাযুদ্ধে স্বীয় দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদিগের ব্যবহারার্থ মহাচীনাধিপতি অহিংসপরায়ণ বৌদ্ধসম্রাট হিং চাও বিশ হাজার মহাবিঘ্নহর কবচের অর্ডার দিয়াছেন। এই কারণে যাঁহারা সপ্তাহকাল মধ্যে অর্ডার না দিবেন, তাঁহাদিগকে কবচ সরবরাহ করা আমাদের সম্ভবপর হইবে না। এজন্য আমরা স্বদেশবাসীর নিকট লজ্জিত। কিন্তু যেখানে একটা জাতির জয়পরাজয়, উত্থানপতন আমাদের কবচের উপর নির্ভর করিতেছে, সে স্থলে আমরা সম্পূর্ণ নিরুপায় জানিয়া সহৃদয় দেশবাসী আমাদের এ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

চৌধুরী মহাশয় কহিলেন, ওহে ঘোষাল, নায়েব মশাইকে ব'লে দিও,

গোটা দুয়েকের অর্ডার যেন তাড়াতাড়ি দিয়ে দেন, এলে ফেলে দিতেই বা কতক্ষণ! আজকের ডাকেই চিঠি যাওয়া চাই।

অবধূত মহাশয় বলিল, দেখলে ঘোষাল, কেমন কাঁচা মন, এক কথায় বিশ্বাস, এক কথায় অবিশ্বাস!

চক্রবর্ত্তী পড়িতে লাগিল—

"এই মহাশক্তিশালী কবচ আজকালকার বাজারে যথারীতি যজ্ঞাদির পর এক-একটি প্রস্তুত করিতে ২৫৫৲ টাকা ব্যয় হয়; কিন্তু একত্র পাইকারী হিসাবে বহু কবচ প্রস্তুত করায় আমরা ৩।৵৫ তিন টাকা সওয়া পাঁচ আনাতেই দিতে সমর্থ। তিনটি একত্র লইলে ৫।৵৫ পাঁচ টাকা সওয়া পাঁচ আনা, এক ডজন ৮।৵৫ আট টাকা সওয়া পাঁচ আনা।"

চৌধুরী মহাশয় কহিলেন, তবে ঘোষাল, এক ডজনের অর্ডার দিতেই বল। শর্ম্মা কিন্তু একটার বেশি ধারণ করবে না, তা ব'লে রাখছি অবধূত মশায়, হ্যা। আমি অত ঢালোয়া বিশ্বাস করতে রাজি নই। নেহাত বলছেন আপনারা, প্রাচীন লোক—

অবধূত বলিল, হ্যাঃ—হ্যাঃ—হ্যাঃ, তোমরা যে দেবীমাহাত্ম্য মানছ, এই আমার বাপের ভাগ্যি; এখন রক্তের তেজ রয়েছে, হোক আমাদের মত বয়েস, তখন আবার দেখব! বলে, কত নেড়ানেড়ীই কণ্ঠি ছিঁড়ে—

গোঁসাই তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। তিরিক্ষিভাবে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, এসব কি কথা বলুন তো মহারাজ, কোথাকার একটা অর্ব্বাচীন—

চৌধুরী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, আরে ব'স, ব'স। কেন অবধূত মশায়, এ নিরীহ বেচারীদের নিয়ে টানাটানি করেন?

খানিকটা হাসি পড়িয়া গেল।

চক্রবর্ত্তী পড়িতে লাগিল—

"বহু রাজা, মহারাজা, জমিদার এবং উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের অযাচিত প্রশংসাপত্রে আমাদের একখানি ঘর বোঝাই হইয়া গিয়াছে। আসিয়া পড়িয়া যাউন। স্থানাভাবে নিম্নে মাত্র কয়েকটি অনাড়ম্বর পত্র উদ্ধৃত হইল—

"১। গোরক্ষপুর জিলার অন্তর্গত কিষণগড় গ্রামের স্বনামধন্য জমিদার রায় বিন্ধেশ্বরী সিংহ বাহাদুর লিখিতেছেন—

"আমি আমার এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞাতির সহিত দেওয়ানী বাধাইয়া এলাহাবাদ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে খ্যাতনামা উকিল, ব্যারিস্টার আনাইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসি। মকদ্দমা প্রিভি কাউন্সিলে উঠে; কিন্তু সেখানে সামান্য এক মোক্তারের হস্তে কেস দিয়া, এখানে স্বয়ং আপনার সর্ব্ববিঘ্নহর কবচ ধারণ করি। জয়ী হইয়াছি। ব্যাটার নামে এবার ফৌজদারি চালাইব, কৃপা করিয়া আর তিনটি কবচ ভিঃ পিঃ যোগে পাঠাইয়া দিবেন।

"২। শ্রীহট্ট জিলার গৌরীপুরনিবাসী, কাশ্মীর স্টেটের ভূতপূর্ব্ব কণ্ট্রোলার সার্ অচ্যুতানন্দ সিংহ রায় লিখিতেছেন—

"আপনার কবচের গুণ এক মুখে বর্ণনা করা যায় না। আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান কালীকিঙ্কর দুই বৎসর যাবৎ নানা প্রকার অসুখে ভোগায় পরীক্ষায় ফেল হইয়া আসিতেছিল। এবারে চার মাস কাল শিলং পাহাড়ে থাকিয়া স্বাস্থ্যলাভ করিয়া উপযুক্ত পরিশ্রমে সমর্থ হইয়া পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষার তিন দিবস পূর্ব্বে আপনার কবচের বিজ্ঞাপন দেখিয়া তাহাকে ধারণ করাই। বলা বাহুল্য, আশু ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। ডাকযোগে আর একটি পাঠাইয়া তাহার স্কলারশিপ পাইবার পথ সুগম করিয়া দিবেন।

"৩। মেদিনীপুর কোটালিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর ভড় পরম শ্রদ্ধাসহকারে লিখিতেছেন—

"মহাশয়, কোটি কোটি প্রণাম গ্রহণ করিবেন। কয়েক দিবস হইল একটি বকনা হারাইয়া গিয়াছিল। দুই দিবস কোন সন্ধান পাইলাম না। পরে জানা গেল, নিরুদ্দেশ হইবার পূর্ব্বে বকনাটি আমার কনিষ্ঠা কন্যার গলদেশবিলম্বিত সর্ব্ববিঘ্নহর কবচ খাইয়া ফেলে। মহাশয়, ত্রিরাত্রিও অতীত হয় নাই—সকালে উঠিয়া গোয়ালে গিয়া দেখি, বুধী আসিয়া মায়ের দুধ টানিতেছে। এদিকে মেয়েটি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। সত্বর আরও তিনটি কবচ পাঠাইয়া চিরবাধিত করিবেন।

"৪। মাইশোর গবর্মেণ্টের ভূতপূর্ব্ব অবসরপ্রাপ্ত চীফ মেডিক্যাল অফিসার—বর্ত্তমানে নিখিল-ভারত থিয়সফিক্যাল ফেডারেশনের সহকারী সম্পাদক মেজর বাণলিঙ্গম্ পিলে আডায়ার হইতে লিখিতেছেন—

"মহাশয়, ক্রমান্বয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্তে আপনাদের সর্ব্ববিঘ্নহর কবচের অলৌকিক আরোগ্য-শক্তি দেখিয়া আমি চিকিৎসাশাস্ত্রে বীতরাগ হইয়া থিয়সফি অবলম্বন করিয়াছি। সূক্ষ্ম শক্তি বৃদ্ধির জন্য এক ডজন কবচ পাঠাইয়া চিরানুগৃহীত করিবেন। ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

"বিশেষ দ্রষ্টব্য নং ১—

"বিক্রয়লব্ধ যাবতীয় অর্থ আমাদের শ্রীশ্রীচণ্ডিকা আশ্রমের পরিচালন এবং উন্নতি সাধনে ব্যয়িত হইয়া থাকে।

"বিশেষ দ্রষ্টব্য নং ২—

"ইহার সহিত যাঁহারা আমাদের জগদ্বিখ্যাত স্বপ্নলব্ধ দদ্রুহুতাশন ক্রয় করিবেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে কবচ অর্দ্ধমূল্যে দেওয়া হইবে। মূল্য প্রতি কৌটা ৷৶০ দশ আনা মাত্র।

"হেড আফিস—শ্রীশ্রীচণ্ডিকা আশ্রম—ভৈরবগঞ্জ, জলপাইগুড়ি।

ব্র্যাঞ্চ { ১৪ নং পাঁচু সদাগরের লেন, কলিকাতা।
১৭।১ দক্ষিণেশ্বরী গলি, ঢাকা।
১৪।৩।২ বৃত্রাস্থর স্ট্রীট, বেনারস।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, আর, হ্যাঁ, দেখ ঘোষাল, ব'লো, নায়েব মশাই যেন লিখে দেন, ওর মধ্যে একটা কবচ বিশেষ ক'রে মকদ্দমা জেতার মন্ত্র দিয়ে যেন শোধন ক'রে দেওয়া হয়। ওর সঙ্গে আর দক্রুহুতাশন এনে কাজ নেই, কি বলেন অবধূত মশায়? মাহাত্ম্য নষ্ট ক'রে দেবে শেষে!

২

সাড়ে তিন আনির দল সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। পিছনে দুই-একটি করিয়া জুটিতে জুটিতে নয় আনির দল পুষ্ট হইয়া উঠিল। প্রথমে উভয় দলেই খানিকক্ষণ গুজগুজ ফুসফুস চলিল, তাহার পর সাড়ে তিন আনির একজন নিজের দলের অনিশ্চিত একজনকে লক্ষ্য করিয়া গলা চড়াইয়া বলিল, ওহে, মেড়াটা লড়াইয়ে, একবার শিঙ ভেঙেছে ব'লে তুমি যে হাল ছেড়ে দিলে! ভাঙা শিঙে একটা কবচ বেঁধে রে—রে—রে—রে ক'রে ছেড়ে দাও দিকিন একবার।

সেদিন রাত্রের মজলিসে ঘোষাল কথায় কথায় অবধূতকে বলিল, নাতিটা ঝলসেছে কদিন থেকে; একবার একটু পায়ের ধূলো দিয়ে আসতে পারবেন না?

অবধূত অতিমাত্র সংক্ষুব্ধ চিত্তে হাতজোড় করিয়া বলিল, মাপ কর দাদা, সাড়ে তিন আনির বাড়ির সামনে দিয়ে আমায় আর কোথাও যেতে ব'লো না। ভাল হয়ে যাবে 'খন, আমি এইখান থেকেই আশীর্ব্বাদ করছি।

চৌধুরী মহাশয় সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, কেন অবধূত মশাই, কি হ'ল?

অবধূত অত্যন্ত জেদাজেদির পর বলিল, তা হ'লে বল হে ঘোষাল, তুমিও তো ছিলে। আমি বলতে গেলে আবার রাগ চাপতে পারব না, কাজ কি?

যতদিন সাড়ে তিন আনি বেঁচে আছে, ততদিন আর আপনার দেবদেবী, কবচ-টবচ মেনে কাজ নেই মহারাজ।—বলিয়া ভূমিকা করিয়া ঘোষাল সম্পূর্ণ নিজের ভাব এবং অলঙ্কার দিয়া সাড়ে তিন আনির দলঘটিত ক্ষুদ্র ব্যাপারটি এমন গুছাইয়া সামনে ধরিল যে, সেটা মোটেই আর ক্ষুদ্র রহিল না। এমন কি তাহার নিজের মনেও আপসোস হইতে লাগিল যে, কেন সে এতদিন যাত্রার পালা বাঁধিতে চেষ্টা করে নাই!

পরদিন গ্রামটা কি একটা ব্যাপারের প্রতীক্ষায় নীরব উৎকণ্ঠায় সমস্ত দিবসটা যাপন করিল। নয় আনির দল প্রথমে সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইল, সঙ্গে লাঠি-হাতে কয়েকজন ইতরশ্রেণীর লোক।

কাল ইহারা যেমন করিয়া জুটিয়াছিল, সেইরূপ ভাবে আজ সাড়ে তিন আনির দলটা অল্পে অল্পে পিছনে জমাট বাঁধিয়া উঠিল। লাঠিও দেখা গেল।

বড় দলই প্রথমে মুখ খুলিল। একজন, বিশেষ কাহাকেও সম্বোধন না করিয়া কহিল, হ্যাঁ হে, একটা এঁদো পাঁদাড়ের বুনো শূয়োরে ঐরাবতকে একটা খোঁচা মেরে নাকি বরাহ-অবতার হয়ে পড়েছে? লাঠির চোটে দাঁত দুটো ভেঙে দাও না।

সাড়ে তিন আনির পক্ষের একজন, নিজের দলের পানে চাহিয়া অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, হ্যাঁ হে, চারটে ঠ্যাং আর একটা শুঁড়

আছে ব'লে এঁদো ডোবার মশাও নাকি হাতীর পংক্তিতে উঠল? আবার যে-সে হাতী নয়, ঐরাবত!

একজন বলিল, ন আনি ঐরাবত কেমন হয় একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।

অপর একজন উত্তর করিল, গর্দ্দভবৎ হবে আর কি।

একটা হাসির হররা উঠিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই বিকশিত দন্তপংক্তিরাজির একটিতে সজোরে আসিয়া একটা ইটের ঢেলা পড়িয়া সমস্ত দলের হাসির স্রোতটা একেবারে বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর চারিদিকে চটাচট পটাপট শব্দ হইতে লাগিল এবং লাঠি, ইট, চড়, কিলের আর লেখাজোখা রহিল না। মিনিট পাঁচেক দাঙ্গা চলিল, দশ-বারো জন জমি লইল, বাকি সব অদৃশ্য হইয়া গেল।

চৌধুরী মহাশয়ের লোক ঘোড়ায় চড়িয়া তৈয়ার ছিল, স্বপক্ষীয়দের মধ্যে যাহারা জখম হইয়াছে, তাহাদের নাম লইয়া থানায় ডায়েরি করিতে ছুটিল। ডায়েরি করার ঘটনা পূর্ব্ব হইতে সাজানো ছিল, তাহার সহিত প্রকৃত ঘটনার বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল না। দুই দিন পূর্ব্বে 'কারণে'র মাত্রাধিক্যে অবধূত পড়িয়া গিয়া মাথার খানিকটা ফাটাইয়া ফেলিয়াছিল, সেইটা দেখাইয়া বলিল, আর আমার মাথায় এই লাঠির ঘাটাও লিখিয়ে দেবে, ইঞ্চি-টিঞ্চি সব আন্দাজ ক'রে নাও।

গোঁসাই বলিল, আপনি তো অকুস্থানে ছিলেন না মশায়!

অবধূত দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিল, আর তুমি থেকেই বা কটা চোট আনতে পেরেছ? বুদ্ধি থাকলে যোগাসনে ব'সেও দাঙ্গা করা চলে; কলকাঠি কে চালাচ্ছিল? দু দিন ওষুধ লাগানো বন্ধ করি, কি বল হে গদাধর? সব দৈব অনুগ্রহ হে—মকদ্দমা হু-হু ক'রে ছুটে চলবে। নিরীহ বিষয়নির্লিপ্ত সন্ন্যাসীর গায়ে হাত!

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, একটা ছটাক খানেক দেওয়ানি জিতে পাপে মেতে উঠেছে, না হ'লে জগদম্বার সেবকের গায়ে হাত দিতে যায়! মকদ্দমা একটু ভাল ক'রে তদ্বির করতে হবে কিন্তু অবধূত মশায়; চক্রবর্ত্তী, হালদার, ঘোষাল, তোমরাও সব দেখেছ। আর গোঁসাই, অবধূত মশায়ের সঙ্গে খেঁচামেচি না ক'রে এদিকটা একটু সামলাও।

অবধূত বলিল, তুমি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও গিয়ে বাপ, এ আমাদের নিজের কাজ, বলতে হবে না। কাল উঠে শুধু একবার কবচটা ধারণ ক'রে নিও, বাস্। হ্যাঁ, নায়েব মশায়কে ডেকে একবার আজ রাত্রে পূজোর বন্দোবস্তটা ভাল ক'রে ক'রে দিতে বল, সারা রাত্রিটা এখানে কাটাতে হবে। আজ ধেনোয় কুলুবে না, বিলিতীর হুকুম ক'রে দাও, সব বেটী ডাকিনীদের একটা পার্টি দোব। তোমরা কে কে সব আসছ? গোঁসাই? আরে, শ্যাম শ্যামা একই, যোগিনীগুলোকে গোপিনী ধ'রে নিলেই হবে।

সকলেই আসিবে বলিল, তর্কালঙ্কার নাকে খানিকটা নস্য ঠুসিয়া দিয়া বলিল, কাল অঁব্‌লি গুটি বারো ব্রাঁভ্যল ভোজন করিয়ে দিলে হয় না? বঁহারাজ কবচটা পরছেল, বঁকদ্দবাঁটাও দায়ের হবে—দু-দুটি শুভকাজ।

মহারাজ হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তা হবে; তর্কালঙ্কারের ক্রমাগত নাকে মুখে গুঁজতে পারলেই হ'ল! সাড়ে তিন আনির শ্রাদ্ধের ভোজটার দিকেও নজর রেখো। আর আদালতে মন্তরগুলো যেন গোলমাল না হয়ে যায়!

সকলে খুব হাসিতে লাগিল। অবধূত শুধু গম্ভীরভাবে রহিল; হাসি থামিয়া গেলে বলিল, আপসোস হয় গদাধর, যদি লেখার চর্চ্চাটা একটু একটু রেখে যেতে;—সেই ভারতচন্দ্র মরেছে অবধি দেশে একটা লিখিয়ে হ'ল না। তোমার কথার যেমন ছাঁদ, যেমন বাঁধুনি—

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, ও চর্চ্চাটা আগে কিছু কিছু ক'রে এসেছি অবধূত মশায় ; বাংলাকে আর একটা বিদ্যাসুন্দর দোব ভেবেছিলাম, তা এই সাড়ে তিন আনির উপদ্রবে আর হয়ে উঠল না। কবচটা কাল এসে পড়বে তো ? সেই এক চিন্তা ! জগদম্বার ভরসাতেই এই হাঙ্গামাটা তো বাধানো গেল।

ঘোষাল বলিল, সে ভাববেন না মহারাজ, তাঁর কাজ তিনি ক'রে যাবেন। এতবড় জগৎ-সংসারটা চালাচ্ছে কে ? চাই কি আজও এসে পড়তে পারেন। একটা লোক তো পোস্ট-আপিসে দৌড় করিয়ে দিয়েছি।

অবধূত কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া বলিল, তারা শিবসুন্দরী, দেখো মা, তুমিই একদিন বড় মুখ ক'রে বলেছ, যদা যদাহি ধর্ম্মস্য—কি যে ছাই ভুলে যাচ্ছি, ভারতে আজ অধম সন্তানেরা সেই ভরসাতেই এই ছোটখাটো কুরুক্ষেত্রটুকু করতে সাহসী হয়েছে। বলি, কুরুপক্ষে কজন ঘায়েল হ'ল হ্যা ঘোষাল ?

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, অনেকগুলো। একটা নাকি আবার হাসপাতালে ধুঁকছে। আমি বলি কি, অবধূত মশায়, জোড়া কবচ ধারণ করলে হয় না ?

অবধূত বলিল, পাকা কাজ হয় ; তবে দুটো অনুষ্ঠান করতে হবে, এই যা। ডবল খরচ পড়বে।

তর্কালঙ্কার বলিল, আর সেই সঙ্গে ব্রাঁভ্যল বারোর জায়গায় চব্বিশটি ক'রে দিতে হবে। আমি বলি, মহারাজ, লিষ্ঠাবাল চারজন বেছে নিয়ে তাদেরই ছ দিল—কি যে বলে—সেবা করিয়ে দিল না ; চার ছয় চব্বিশ —সোজা হিসেব প'ড়ে রয়েছে।

বেচারাম পোদ্দার 'কুরুক্ষেত্রে' একটা ঢিল খাইয়াছিল, খিঁচাইয়া

বলিল, ত্যাখান থেকে সেরেফ খাই খাই করছ ঠাকুর, কাজের সময় এছলে কোথাকে ?

হালদার উত্তর করিল, তবে তু ব্যাটারা আছিস কি করতে র‍্যা ? আ মর্ ! আয়, কাজে-কর্ম্মে ব্রাহ্মণভোজনের পাটটা তোরাই তুলে নে ; আমরা লাঠি খেয়ে প'ড়ে থাকি। আ মর্, আমাদের কাজটা যেন কাজই নয় ! কলিকাল আর বলেছে কেন !

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সকলে মিলিয়া মকদ্দমার ফন্দি আঁটা হইল। কে কে সাক্ষ্য দিবে, কোন্ কোন্ উকিলকে নিযুক্ত করিয়া ফেলিতে হইবে, এবং ওপক্ষে যাহাদের নিযুক্ত করা হইবে, তাহাদের হাতে রাখিবার উপায় কি ? নূতন জজ আসিয়াছে, টোপ ফেলিয়া দেখিলে হয় না ? ও তরফের সাক্ষী কে কে হইল ? তাহাদের বাড়িতে ভূতের উপদ্রব, চোরের উপদ্রব, লঙ্কাকাণ্ড, এসব হওয়া চাই, যটা নিরস্ত হয়। তারপর ঘুষঘাষ, পথ আগলানো, এসব আছে। মকদ্দমা জিতের দিন সদর হইতে শোভাযাত্রা করিয়া আসিতে হইবে। সাড়ে তিন আনির দেউড়ির নিকট দিয়া আসিলে চাই কি গরম গরম একটা লাগিয়া যাইতেও পারে।

উঠিবার সময় অবধূত বলিল, রাজসূয় যজ্ঞ ফেঁদেছ গদাধর, দেশে একটা কীর্ত্তি রইল। কিছু ভাবনা নেই, খালি বিশ্বাসটুকু রেখে যেও, ওইটুকু হারিও না। তারা শিবসুন্দরী !

৩

মকদ্দমা সেশনে উঠিয়াছে এবং মকদ্দমার তদারকের জন্য চৌধুরী মহাশয়, ঘোষালাদি পারিষদবর্গের সহিত শহরের বাগান-বাড়িতে আসিয়া উঠিয়াছেন।

উভয় পক্ষের উকিলই উভয় পক্ষকে খুবই আশা দিয়াছে। সরকারী পক্ষের উকিল রায় বাহাদুর জয়হরি মণ্ডল অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসী-ফকিরের গায়ে হাত! মহারাণীর ঘোষণার মূল কথা—'আমরা তোমাদের ধর্ম্মে হাত দোব না', আর তুই কোথাকার একটা কে, অতবড় একটা ধর্ম্মের পাণ্ডার কপাল ফাটিয়ে বসলি একেবারে! এ মকদ্দমা আর যায় কোথায়! তবে তাঁর নিজের হাতে গণ্ডা দেড়েক কেস রয়েছে, তাই জামাইকে সঙ্গে না নিলে সামলে উঠতে পারবেন না। ইত্যাদি।

ওপক্ষের উকিল ওপক্ষকে বলিয়াছে, ও ব্যাটা অদ্ভুত যখন এর মধ্যে রয়েছে, তখন আর ভাবনা নেই। নতুন সাহেব ধর্ম্ম-বিটলেগুলোর ওপর হাড়ে হাড়ে চটা; দেশে কুলপাদ্রীর সঙ্গে কি নিয়ে নাকি কবে একবার খিটিমিটি হয়েছিল, তাকে তো আর এখানে পায় না, রাগটি গিয়ে পড়েছে এই পুরুত, অবধূত, নাগাদের ওপর। জেল তো কলির নৈমিষারণ্য ক'রে তুলেছে। এদিকে মাসখানেক থেকে কোনও ব্যাটাকে না পেয়ে খিঁচিয়ে আছে; ব্যাটা অবধূতকে একবার দেখতে পেলে হয়। কাউণ্টার কেসও আনতে হবে না, এমনিই মিথ্যে সাক্ষীর চার্জ দিয়ে জেলে পূরে দেবে 'খন, মজাটা দেখুন না। আর অন্য জুনিয়ার নিতে হবে না, ছেলেটা নতুন জয়েন করেছে, বাপ-ব্যাটায় মকদ্দমা তুড়িতে উড়িয়ে দোব। তার আবার ধর্ম্মসংস্কার ভারত-উদ্ধার এই সব বাই আছে, এক রকম অমনিতেই এ মকদ্দমার কাজ ক'রে দেবে 'খন। ইত্যাদি।

তাহা সত্ত্বেও ওপক্ষের একজন ভাল ব্যারিস্টার যোগাড় করিবার জন্য কলিকাতায় লোক ছুটিয়াছে। চৌধুরী মহাশয়েরও ইচ্ছা ছিল, একজন সাহেব ব্যারিস্টার মোতায়ন করেন। অবধূত হইতে দেয় নাই, সাহেবও

নয়, বাঙালীও নয়। একবার বেশি রকম বুজরুকি করার জন্য নিজের তরফের ব্যারিস্টারের কাছেই বেয়াড়া রকম ধমক খাইয়া তাহার ও-জাতটার উপরই বিতৃষ্ণা ধরিয়া গিয়াছিল। বলিল, এইটে ছেলেমানুষি করছ গদাধর ; তোমাদের নব্যদের এই তো দোষ। এর মধ্যে কেরেস্তানি ব্যাপার এনে ফেললে কি হবে, তা ভেবে দেখেছ কি ? কবচের ওই ঐশিক শক্তি বিরূপ হয়ে অশেষ অনিষ্ট সাধন করতে পারে। কবচ দুটো ধারণ করলে, এখন একটু স্থির হয়ে না হয় জগদম্বার সেবকদের ব্যারিস্টারিটুকুই দেখে যাও না। তোমাদের কি মত হে ?

চক্রবর্ত্তী, তর্কালঙ্কার, ঘোষাল, হালদার প্রভৃতি সকলেই অবধূতকে সমর্থন করিল। ঘোষাল তো আবার 'কাল স্বপ্ন দেখলাম, মা যেন—' বলিয়া একটা লম্বা-চওড়া ব্যারিস্টার-বিরোধী স্বপ্নকাহিনী সদ্য সদ্য আবৃত্তি করিয়া দিল।

ব্যারিস্টারের বদলে আরও একটা কবচ ধারণই সব্যস্ত হইল। অবধূত কহিল, আর কিছু নয়, এই ত্রয়ী শক্তির যোগে ও-তরফে একটা সে রকম অঘটন না ঘ'টে যায়! শুধু মকদ্দমাটুকু হারিয়েই ছেড়ে দিলে বাঁচি। আমায় এই হিংসা-দ্বেষের মধ্যে মা যে কেন টান দেন! ব্যারিস্টারের একদিনকার ফী বেটীদের সব ভাগ-বাঁটরা ক'রে দিতে হবে ; সেটার একটা অর্ডার ক'রে দিও। মেলা ফাঁকি দিয়ে ওদের কাছ থেকে কাজ বাগিয়ে নেওয়াটা ঠিক নয়।

তার্কলঙ্কার বলিল, তিল বারং ছত্রিশটা ব্রাঁভ্যল হ'ল বঁহারাজ, বঁলেল তো আমি লা হয় রাজপুরীতে গিয়ে বঁ'সে বঁ'সে এই কাজটা সারি গিয়ে, ওটাও তোঁ অলুষ্ঠালের একটা অঙ্গ।

নিম্ন আদালতে নস্য-অপভ্রষ্ট উচ্চারণের জন্য তাহাকে ম্যাজিস্ট্রেট হইতে শপথ করাইবার মহা-পুরোহিত পিয়নটি পর্য্যন্ত, সকলেরই ধমকানি

খাইতে হইয়াছিল। সে এই সামনের ভাবী এজাহারের কথা ভাবিয়া দারুণ মনোকষ্টে কাটাইতেছিল এবং একটু ফুরসৎ পাইলে, নেমন্তন্ন পরমান্ন প্রভৃতি কয়েকটি কথা লইয়া 'ন'কে 'ন' এবং 'ম'কে 'ম' বলিবার চেষ্টায় প্রাণপণে কসরৎ করিতেছিল।

এদিকে যাগ, যজ্ঞ, হোম, অনুষ্ঠানের চোটে পাড়ার লোকে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। বাজারে মদের দর চড়িয়া গিয়াছে। সমস্ত রাত বাড়িটায় অমানুষিক 'মা' 'মা' শব্দ এবং অসংলগ্ন অট্টহাস ও কান্নার মিশ্র কলোরোল সকলের একটা আতঙ্ক দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে 'লাগাও' 'ফৌজদারি' 'সাড়ে তিন আনি' 'শির লে আও' শব্দে এই বিকৃত তান্ত্রিক আচারকে লোকের কাছে আরও ভীতিপ্রদ করিয়া তোলে।

সকালে কাহারও আর দীর্ঘপথ বাহিয়া উকিলের বাড়িতে তালিম লইতে যাইবার অবস্থা থাকে না। অবধূত বিধান দিয়াছে, এ একটা পীঠস্থান হয়ে গেল; উকিলই এখানে এসে রোজ হাজরি দিয়ে যাক।

সরকারী উকিলের স্বয়ং আসা অসম্ভব; প্রতিভূস্বরূপ জামাই আসিয়াছিল। সকলের খামারির ঝোঁকে তাহার যেরূপ রঙবেরঙের অভ্যর্থনা হইল, তাহাতে সে বেচারী একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া সেই যে পাড়ি মারিয়াছে, আর এমুখো হয় নাই। গাড়ি হইতে নামিতেই চক্রবর্ত্তী টলিতে টলিতে গিয়া, তাহার চিবুক ধরিয়া মাথা দুলাইয়া বলিল, আহা, রাই এসেছেন অভিসারে, প্রেম শেখাতে শ্যামকিশোরে। এস, বাপ এস। অবধূত গাঁজার ছিলিম নামাইয়া প্রথমে পরিচয় এবং উদ্দেশ্য জানিয়া লইল; তাহার পর জবাফুলের মত চক্ষু দুইটি পাকাইয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল, কি? আমায় তামিল দেবে মর্ত্তোর জীব! নেকালো।

ছোকরা নেহাত ক্ষীণজীবী এবং অল্পপ্রাণ; কম্পিত পদে বাহির

হইয়া যাইতেছিল। চৌধুরী মহাশয় অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় তাহাকে বুকে জড়াইয়া একেবারে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন, বাবাজী, অভিমান ক'রো না। আহা, অবধূত মশায়, এই ননীর পুতুলকে কটু কথা বললেন! জয়হরিবাবুর জামাই, এ যে আমার নিজেরই, আমার ছোট ভাইয়েরও বেশি।

এ অবস্থায় মকদ্দমার অবস্থা যেমন হওয়া উচিত, তেমনই হইতে লাগিল। প্রথম দিনের শুনানিতে চক্রবর্ত্তী, তর্কালঙ্কার আর কয়েকটা ইতর লোকের এজাহার হইল। ইহারা শিক্ষা-মোতাবেক অনেকটা গুছাইয়া বলিল, চক্রবর্ত্তী কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এবং সাজানো মকদ্দমার কিছু কিছু লইয়া একটা তালগোল পাকাইয়া ফেলিল। তর্কালঙ্কার একে স্বভাবতই বোকা-গোছের, তাহার উপর ক্রমাগত ধমক খাইতে খাইতে এমন সব কথা বলিয়া নামিয়া আসিল, যাহা সাজানো মকদ্দমায় পাওয়া যায় না এবং প্রকৃত ঘটনাতেও কস্মিন কালে ঘটে নাই।

অবধূত আসিয়া রিপোর্ট দিল, শুনছি, খাসা এজাহার হয়েছে। তর্কালঙ্কারের টিকি ছেঁড়ার কথায় আমাদের তরফের জুরি নাকি লাফিয়েই উঠেছিল। হুঁ-ব্বাবা, টিকি ছেঁড়ে নি তো, বিদ্যুতের তার ছিঁড়েছে, লঙ্কাকাণ্ড ক'রে তবে ছাড়বে।

হ্যাঁ, তাকে আর এক দফা কিছু পাঠিয়ে দিও, লোকটা বড় সাচ্চা লোক হে, আমাদের তরফের জুরির কথা বলছি। একটা কথা কিন্তু কেমন ঠেকছে; বাজারে গুজব, জজ সাহেব নাকি ও-তরফের ঘুষ নিয়েছে। তোমাদের কি রকম মনে হ'ল হে তর্কালঙ্কার?

তর্কালঙ্কার চটিয়াই ছিল, বিশেষ করিয়া জজ সাহেবের উপর; ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত খানিকটা নস্য ঠুসিয়া ঝাঁঝিয়া বলিল, ও আর বঁলে হওয়া-হওয়ি কি? আলবৎ লিয়েছে, ইতর ব্যাটা, ব্রাঁভ্যল-পণ্ডিতের সঙ্গে

এই আচরণ! ব্যাটা ম্লেচ্ছ! ও ব্যাটা ব্যালেস্টারটাও মোটা ঘুঁষ—না, ও তো ওদেরই লোক।—বলিয়া অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া গেল।

চৌধুরী মহাশয়ের রাত্রের নেশাটা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল; অবধূত আর তর্কালঙ্কারের কথায় হঠাৎ চমক লাগিয়া বাকিটুকুও ঝাঁ করিয়া মিলাইয়া গেল। মাঝ-কপালে ভ্রূ তুলিয়া বিহ্বলভাবে বলিলেন, সে কি? এ তো ভাল কথা নয় অবধূত মশায়; আমরা এতগুলা টাকা ঢাললাম, নিজের হাতে দিয়ে এলেন আপনারা—

অবধূত বলিল, হ্যাঁ, দিয়ে এসেছি বইকি। পাছে কারুর সন্দেহ হয়, তাই গোঁসাইকে সঙ্গে নিলাম, যার সঙ্গে আমার এক তিল বনে না। ভাবলাম, না, টাকাকড়ির ব্যাপার। তা এমন কিছু চিন্তিত হবার কারণ নেই। রায় এ তরফে দিতেই হবে। ও কি দেবে? দেবেন যিনি, তিনি তোমার কবচগুলোর মধ্যে বিরাজ করছেন। শুধু বিশ্বাসটুকু রেখে যেও; এটুকু গেলেই আর সামলাতে পারব না। আজ রাত্রে বশীকরণের মন্ত্রটাকে একটু জাগিয়ে তুলতে হবে।

চক্রবর্ত্তী বশীকরণের একটি মানেই জানিত, জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিল। তাহার মনের ভাব বুঝিয়া অবধূত হাসিয়া কহিল, ওহে, সে সব কিছু নয়, দেখ দিকিন গেরো! সাহেব, চীনেম্যান, কাবুলী, দারোগা এদেরও বশীকরণের বিধান শাস্ত্রে আছে, যাকে হিপ্‌নটিজ্‌ম্ বলে। তোমার চক্কোত্তী রসিক আছে গদাধর।

চক্রবর্ত্তী আত্মপ্রসাদে গদগদ হইয়া বলিল, মহারাজের সভায় ওই ক'রে চুল পাকালাম—

চৌধুরী মহাশয় দক্ষিণ বাহুর কবচটা মাথায় ঠেকাইয়া একটু ভীত-ভাবে বলিলেন, মার পাদপদ্মে বিশ্বাস বরাবরই আছে। সেদিন যা

বলেছিলাম, সে কথার কথা, সেইটুকুই কি মা ধ'রে ব'সে থাকবেন? বড়ই বেইজ্জৎ হব তা হ'লে।

অবধূত কহিল, অত ভেবো না; কাল আমার এজাহার, একবার পরিচয়টা দিয়ে আসব 'খন। ফিরিঙ্গীর পো বুঝতে পারবেন, হ্যাঁ।

পরের দিন হালদার, গোঁসাই আর অবধূতের পালা ছিল। হালদার অবধূতের নামে অকথ্য গালি দিতে দিতে এজলাস হইতে বাহির হইল। ঘোষাল গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতা দেখাইতে গিয়াছিল, ফলে যাহা দাঁড়াইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া তাহার বাক্‌স্ফূর্ত্তিই হইল না। গোঁসাই ভেজালের মধ্যে যায় নাই; 'হাঁ', 'না', 'মনে নাই'-এর উপর সমস্ত জেরাটা কাটাইয়া দিয়া লম্বা এক সেলাম ঠুকিয়া চলিয়া আসিয়াছে। অবধূত নিজের পরিচয় একটু বেশি রকম দিয়া ফেলিয়াছে, জজ, জুরি আর ব্যারিস্টার মিলিয়া সযত্নে পরিচয় বাহির করিয়াই লইয়াছে বলা চলে। সে মালা জপিতে জপিতে বাহিরে আসিয়া এক ছিলিম চড়াইয়া তবে ধাতস্থ হইল। তাহার পর আবার বাকি সকলকে ভুজংভাজং দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া বাসায় লইয়া গেল।

প্রথমে আস্তে আস্তে পূজার ঘরে গিয়া তাহাদের চাঙ্গা করিয়া হুজুরে হাজির হইল। ঘোষালের দিকে চাহিয়া বলিল, দেখলে ঘোষাল, এজাহার কাকে বলে? আমায় আবার সেই ঘরজামাই ব্যাটা তালিম দিতে এসেছিল, যার গলা টিপিলে দুধ বেরোয়! তোমরা দুজনেও তো ভেলকি দেখিয়ে দিলে হে, অ্যাঁ! আর গোঁসাইজীর পেটেও এত ছিল! আমি জানতাম, নেহাত গোবেচারী, চড়াইডাঙার জলের গুণ আর কি!

কিন্তু দেখলে ব্যাটা জুরিদের কাণ্ড? আমার তো মনে হয়, মবলগ খেয়েছে সব। তোদের আবার অত জেরা করার ধুম কেন রে বাপু?

কেউ মাস্টার, ছেলে ঠেঙাস; কেউ বেনে বকাল, দাঁড়িপাল্লা নিয়ে থাকিস; কি বুঝিস তোরা মকদ্দমার?

শেষের কথাগুলিতে চৌধুরী মহাশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, আজ আবার এ কি কথা অবধূত মশায়? একটাকে তো কবচ পর্য্যন্ত পরানো হ'ল, মা কি শেষ পর্য্যন্ত—

অবধূত বলিল, শেষ পর্য্যন্ত মা দেখবেনই,— আপীল আছে, প্রিভি কাউন্সিল আছে। আর কালকের আশাই ছাড়তে হবে নাকি? না হয় ব্যাটারা খেয়েছেই ঘুষ; মা তো আর—

চক্রবর্ত্তী শেষ করিল, মা তো আর ঘুষ খাবার মেয়ে নন।

ঘোষাল সায় দিল, এই।

চক্রবর্ত্তী বলিল, ইংরিজী ব্যাণ্ডের বায়না হয়ে গেছে; না, আমার মন বলছে, যেন সাড়ে তিন আনির মুখে চুনকালি পড়বেই। নিন, সবাই এক এক পেগ ঢালুন দিকি; ওসব অলুক্ষুণে কথা ভাবতে নেই। গোঁসাইয়ের এক চুমুক চলবে নাকি?

এই রকমে জোড়াতাড়া দিয়া পরদিন দুপুর পর্য্যন্ত অবসরটা সবাই মিলিয়া জমাইয়া রাখিল। যথাসময়ে হালদার, চক্রবর্ত্তী, অবধূত প্রভৃতি সকলে ফোঁটা-চন্দন কাটিয়া মকদ্দমার রায় শুনিতে গেল।

শুনিয়া ফিরিয়া আসিল শুধু তর্কালঙ্কার। কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া হুজুরে হাজির হইল। মকদ্দমার রায়ের খবর তাহার পূর্ব্বেই চৌধুরী মহাশয়ের কানে পৌঁছিয়া গিয়াছে।

চৌধুরী মহাশয় হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, রামবুঝাওন সিং, হাণ্টার আর অবধূতকো হাজির করো।

তর্কালঙ্কার বলিল, আজ্ঞে, তিনি হিমালয়ে গেছেন, আপীলের জন্যে যোগসাধন করতে।

চৌধুরী মহাশয় নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, আচ্ছা, লে আও হারামজাদা চক্কোত্তীকো।

তর্কালঙ্কার কহিল, তিনি বললেন, কাঁবাক্ষ্যাতে ধন্না দিতে চল্লুব; আর—আর—

চৌধুরী হাণ্টারে এক টঙ্কার দিয়া বলিলে, হ্যাঁ, 'আর' কি, বল না? তোমার গুষ্টির শ্রাদ্ধ করেছে?

তর্কালঙ্কারের হাঁটুতে হাঁটুতে ঠুকিয়া যাইতেছিল। কহিল, আর হাঁলদার বঁশাই আর ঘোঁষাল বঁললে, আঁপীলে লা জেঁতা পর্য্যন্ত এ বুঁখ আর সঁবাজে বের করব লা।

•

স্থান—চড়াইডাঙার জমিদার-ভবন; কাল—উক্ত ঘটনার মাস-খানেকের পর। পাত্রমিত্র পরিবৃত হইয়া গদাধর পাল চৌধুরী সভাস্থলে আসীন।

ঘোষাল আছে, চক্রবর্ত্তী আছে. হালদার আছে, তর্কালঙ্কার আছে। গোঁসাই নাই, আর নাই অবধূত, তাহাদের স্মৃতিটুকু পড়িয়া আছে; আর সেই স্মৃতিটুকুকে উদ্দেশ করিয়া চৌধুরী মহাশয় মাঝে মাঝে বাছা বাছা অকথ্য ঝাড়িতেছেন।

এমন সময় ডাকপিওন আসিয়া একটা বাংলা সাপ্তাহিক এবং দুইখানা হাকিমী ও কবিরাজী ঔষধের আর একখানা শরসন্ধাননিরত কামদেবের ছবিওয়ালা বটতলা-পাব্লিকেশনের ক্যাটালগ দিয়া গেল। চৌধুরী মহাশয় সাপ্তাহিকটার বহর সামলাইতে পারেন না বলিয়া নিজে কখনও খোলেন না। সভাসদবর্গের সামনে ফেলিয়া দিয়া নিজে বটতলা-পাব্লিকেশনের ক্যাটালগটা খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন।

কাগজের ভাঁজ খুলিতে খুলিতে চক্রবর্ত্তী হঠাৎ এক জায়গায় দৃষ্টি

নিবদ্ধ করিয়া খানিকক্ষণ ধরিয়া পড়িল; তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিল, ওঃ, ব্যাটা কি ধড়িবাজ! তোমায় আমি সেই দিনই বলেছিলাম ঘোষাল—

চৌধুরী মহাশয় আস্তে আস্তে মাথা ঘুরাইয়া নিরুদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিলেন, কি হ'ল আবার?

গবর্মেণ্ট, অবধূত আর গোঁসাইয়ের নামে হুলিয়া করেছে, পলাতক জেল-আসামী তারা, ওসব জলপাইগুড়ির চণ্ডিকা আশ্রম, কবচ, রুদ্রহুতাশন—সব তাদেরই কাণ্ড। তার আগে নাকি দুজনে কোথা এক করাচিতে সাইকেল আর ঘড়ি মেরামতের দোকান—

চৌধুরী মহাশয় শিহরিয়া উঠিলেন, দুজনেই!

ঘোষালও বিস্মিত হইয়া বলিল, দুজনেই! এখানে তারা যে পাঁচ মাসের মধ্যে একটা দিনও আপসের মধ্যে গালাগালি না ক'রে জল খায় নি! উঃ, ব্যাটারা—! তা আমার যেন বরাবরই কেমন কেমন ঠেকছিল।

হালদার বলিল, আমি তো কদিন থেকে যেন কেমন কেমন ভাব লক্ষ্য করছিলাম।

তর্কালঙ্কার আরম্ভ করিল, আবারও গোঁড়াগুড়িই একটা সন্দেহ—

চৌধুরী যে রাগে ফুলিতেছিলেন, ইহারা কেহ লক্ষ্য করে নাই। তর্কালঙ্কার শেষ না করিতেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আর আমি শালা দুনিয়ার বেকুব হলাম, না? রামবুঝাওন সিং, ই সব সবজান্তা হারামজাদ লোগকো নিকালো. নিকালো অভি।

কলতলার কাব্য

১
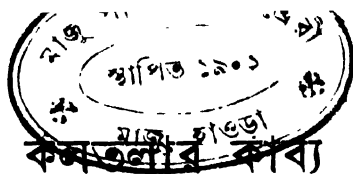
বেশ জুতসই আহারের পর ওদের বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম যে, আমাদের রাজনৈতিক অবস্থাটা নিতান্তই শোচনীয়। নথ-সঞ্চালনে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া ওরা বলিল, হ্যাঁ, তোমাদের আবদার দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে; গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে সরকার বাহাদুর রাস্তায় রাস্তায় জলের কল পর্য্যন্ত ক'রে দিলে, তবু তোমাদের মন পায় না। অনেক বুঝাইলাম যে, এক মাইল আধ মাইলের মধ্যে এক-একটা কল বসাইয়া সরকার বাহাদুর জলপ্রার্থীদের মধ্যে কলহ-দ্বন্দ্বেরই সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র, আর এই কলহ-সৃষ্টিই সকল বিষয়ে সরকারের মূল নীতি; কিন্তু যেখানে যুক্তির নমুনা উক্তরূপ, সেখানে আর বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া কি হইবে? বিশেষত যেখানে হারিয়াই খানিকটা তৃপ্তি পাওয়া যায়, সেখানে জিতিবার জেদটাই বা করে কোন্ মূঢ়?

একটু নিশ্চিন্ত থাকিলে বাঙালী হয় রাজনীতি, না হয় কাব্যের আলোচনা করিয়া থাকে। প্রথমটিতে নিরুৎসাহ হইয়া আজ এই জলের কল সম্পর্কে যে একটা ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

টিটাগড়ের স্টেশনে এবং কোম্পানির চটকলের মাঝের সুদীর্ঘ রাস্তাটার মধ্যখানে সিংহমুখো একটা জলের কল বোধ হয় অদ্যাবধি দাঁড় করানো আছে। রাস্তাটার দুই পাশে এখন ছোট বড় অনেকগুলা বাড়ি উঠিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে, দীর্ঘান্তরালে দুই-একটা দোকান ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তখন যে কোন সময়েই লক্ষ্য করিলে দেখা যাইত, কলটি দশ-বারোটি ঘড়া, বালতি ও অন্যান্য জলপাত্রে পরিবৃত, একটিতে ক্ষীণ ধারায় জল গড়াইয়া পড়িতেছে এবং কয়েকজন পশ্চিমা স্ত্রী ও পুরুষ

বাংলার দুঃখ-কষ্ট ও নিজ নিজ মুল্লুকের সুখৈশ্বর্য্যের গল্প করিতেছে। একটা পাত্র ভরিয়া গেলে ভাজা অর্থাৎ পালা লইয়া একচোট বচসা হইত। যে জিতিত, সেই ন্যায়কে স্বপক্ষে করিয়া নিজ পাত্রটা জলের মুখে বসাইয়া দিত এবং প্রায়শ দেখা যাইত, যাহার রূপা-গালার বিচিত্র চুড়ি-পরা হাতখানা বেশি খেলে, বিজয়-লক্ষ্মী সেই অঙ্গনারই সঙ্গিনী হইতেন।

দুপুরবেলায় এ দৃশ্যপট বদলাইয়া যাইত। তখন আর লোকের ভিড় থাকিত না। নিকটের নারিকেলবৃক্ষটা হইতে দুই-একটা রৌদ্রতপ্ত কাক নামিয়া আসিয়া, কলের শান ভাঙিয়া যেখানে যেখানে জল জমা হইয়াছে, সেখানে দুই-এক চুমুক জল পান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিত। এই সময় প্রায়ই দেখা যাইত, কলসীটি মাথায় লইয়া একটি চৌদ্দ-পনরো বৎসরের পশ্চিমা মেয়ে দক্ষিণ দিকের একটা রাস্তা দিয়া মন্থর গতিতে আসিয়া কলতলায় উপস্থিত হইত। মুখের উপর তাহার এমন একটি কৌতুক-চঞ্চলতার ভাব ফুটিয়া থাকিত, যাহা দেখিলে স্বতই মনে হইত, কি গ্রীষ্ম, কি শীত, কি বর্ষা সকল ঋতুরই দিনগুলা, বিশেষ দ্বিপ্রহরের এই সময়টা, তাহার নিকট বসন্তের আকারেই বর্ত্তমান। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত অসময়ে নিরিবিলিতে আসিলেও বেচারা নিরুপদ্রবে কখনও তাহার গাগরীখানি ভরিয়া লইতে পারিত না। কারণ, লোক না থাকিলেও তাহার আগমনের পূর্ব্ব হইতেই কলের পাশে দুইটি ঘড়া বসানো থাকিত এবং সে আসিয়া কল টিপিলেই 'আরে হামারা ভাজা, হামারা ভাজা' বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে একটা ছেলে ছুটিয়া উপস্থিত হইত। প্রথম প্রথম মেয়েটা কিছুই বলিত না। কলসীটি সরাইয়া লইবার ভঙ্গিমায় বিরক্তির লক্ষণ পরিস্ফুট করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। ছেলেটা কলসীতে খানিকটা জল জমা হইলে সেই জল দিয়া কলসীটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ধুইয়া লইয়া আবার ভর্ত্তি করার জন্য

বসাইয়া দিত। ইহাতে অসহিষ্ণুভাবে মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বালিকা বলিত, ই সব হারামজাদগি। ছেলেটা কোন দিন মৃদু হাসিয়া সে বিরক্তিতে ইন্ধন যোগাইত। আর কোন দিন বা সাফাই দিত, আরে ভাই, গাগরী ধিপল বা, ধোই না?

বচসাটা কোন কোন দিন বাড়িয়াও যাইত। মেয়েটা প্রশ্ন করিত, এতক্ষণ পর্য্যন্ত কলসীটা রোদে বসাইয়া রাখিতেই বা কে মাথার দিব্য দিয়াছিল? এ সবই হারামজাদগি। ছেলেটা উত্তর দিত, গুরমিন্টীকে রাজ্যে নিজের ইচ্ছা ও সুবিধা মত কাজ করিবার সকলেরই অধিকার আছে; যাহার না বনে, সে ঘরের ভিতর ঘোমটা টানিয়া বসিয়া থাকিলেই পারে। ইত্যাদি।

কিন্তু ছেলেটার অবাধ প্রতিপত্তি অধিক দিন চলিল না। একদিন ভাজা লইয়া গোলমাল করিতে গেলে বালিকা কলসীটা কলের মুখে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, হাম না হটায়ব, দেখি কৌনাকে অখতিয়ার বা। ছেলেটা হতভম্ভ হইয়া গেল, মুখে বলিল, আরে ই ঔরৎ, না জমাদার বা! কিন্তু কার্য্যত কিছুই করিতে সাহস করিল না। মেয়েটা সেইরূপ জিদের সহিতই কলসীটা ভরিয়া লইয়া সেটা মাথায় বিঁড়া দিয়া বসাইয়া লইয়া গটগট করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় কথা রাখিয়া গেল, হাম হারামজাদগি তোড়ব, হাঁ।

পরদিবস আসিয়া দেখিল, কলটাতে কলসীর বালাই নাই। ঠোঁটে একটু বিজয়ের হাসি ফুটাইয়া বলিল, হুঁ, বউয়া ডেরায়ল বাড়ন; অর্থাৎ বাছাধন ভয় পেয়েছেন; তাহার পর ধীরে সুস্থে বেশ করিয়া মুখটা ধুইয়া রাঙা করিয়া মুছিল, আলগা টিকুলিটা আন্দাজে ভ্রূ দুইটির মাঝখানে চাপিয়া বসাইয়া দিল এবং কলসীটা কলের মুখে বসাইয়া নারিকেলগাছের পাতলা ছায়ায় গিয়া বসিয়া রহিল। ছেলেটা তখনও

আসিল না। তাহার আগমনের রাস্তায় এক-এক বার নজর ফেলিয়া মেয়েটা বলিল, আরে অইহন কাঁহাসে? হাম কি সে জানানী হতি? অর্থাৎ আসিবেন কোথা হইতে, আমি কি সেই মেয়েমানুষ?

কলসী ভরিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল; সে উঠিবার কোন প্রয়াস করিল না। একটা খোলামকুচি লইয়া মাটিতে তাহার দেশী খেলার আঁকর কাটিতে লাগিল ও মাঝে মাঝে চোখ তুলিয়া এক-এক বার এদিক ওদিক দেখিয়া লইতে লাগিল। যখন প্রায় আধ কলসী জল পড়িয়া গিয়াছে, সে উঠিয়া গেল এবং 'পানি সব খিপ গইল বা' বলিয়া সমস্ত জলটা ফেলিয়া দিয়া আবার টাটকা ও ঠাণ্ডা জলের জন্য কলসীটা লাগাইয়া পূর্ব্ববৎ গিয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময় দেখা গেল, দুই হাতে দুইটা কলসী ঝুলাইয়া সেই হারামজাদা ছেলেটা আসিতেছে। দেখিতেই যা দেরি, মেয়েটা লড়াইয়ে মোরগের মত উগ্রভাবে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং ত্রস্তপদে কলে পৌছিয়া বিনা-বাক্যব্যয়ে নিজের কলসীটা চাপিয়া ধরিয়া গ্রীবা বাঁকাইয়া ছেলেটার পানে স্পর্দ্ধিত নেত্রে চাহিয়া রহিল; ভাবটা—আজ একচোট দেখিয়া লইবে সে।

ছেলেটা আস্তে আস্তে কলসী দুইটা শানের এক পাশে রাখিল এবং শান্তভাবে একটু হাসিয়া বলিল, আজ তো আর ভাজার কথাই ওঠে না, তবে এত ভয় কেন? নাও, তুমিই ভ'রে নাও, আমি দাঁড়িয়ে দেখি।

বালিকা তাহার মুখের দিকে একটু চাহিয়া রহিল, তাহার পর একটু অপ্রতিভের মত কলসী ছাড়িয়া বলিল, না না, সে কথা নয়, তবে অনেকটা যেতে হয়, আর এই রোদ—

হাসিয়া ছেলেটা বলিল, হ্যাঁ, তোমার বাসা আর দূর নয়! যে জানে না, তাকে বোঝাওগে; আমি এই শহরেরই লোক, মুন্নাকাক্কার বাড়ি আর চিনি না? না, তোমায় এই নতুন দেখা আমার?

বিস্মিতভাবে মুখটা একটু তুলিয়া মেয়েটা আবার ধীরে ধীরে নোয়াইয়া লইল। রৌদ্রে যতটা ঘামা উচিত ছিল, তাহারও বেশি বেচারা ঘামিয়া উঠিতেছিল। কাল তাহার ছিল পূর্ণ জয়, আর আজ আসিয়া অবধি অন্তরে বাহিরে সে যেন পরাজিত হইয়া চলিয়াছে। সকলের অপেক্ষা তাহাকে সঙ্কুচিত করিতেছিল এই পরিচয়টা, কারণ সেটা তাহার তেমন গৌরবের নয়; তাহার চাঞ্চল্য, কৌতুকপ্রিয়তা ও নিঃসঙ্কোচ ভাব পাড়ায় তাহাকে বাতাহিয়া অর্থাৎ পাগলী নামে খ্যাত করিয়া রাখিয়াছিল। সে কথাটা এই লক্ষ্মীছাড়া সবজান্তা ছেলেটাও যে জানে, এটা তাহার কেমন রুচিকর বলিয়া বোধ হইল না।

নেহাত অপরাধীটির মত বেচারা পূর্ণায়মান কলসীটির পানে চাহিয়া রহিল। ক্ষণেক পরে বোধ হয় একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া এই বোঝার মত জড়তাটা দূর করিবার জন্য বলিল, যদি এতই জান মুন্নাকাক্কাকে তো ওদিকে বড় একটা যাও না যে?

ছেলেটা মেয়েটার পানে চাহিয়া ছিল; ঠোঁট টিপিয়া একটু হাসিয়া বলিল, কি করতে যাব আর? মুন্নাকাক্কাকে দেখলে তো আর পেট ভরবে না। যাকে দেখলে কিছু ক্ষিদে মেটে, তাকে তো সামনে দেখতেই পাচ্ছি।

মেয়েটা একেবারে সপ্তমে চড়িয়া উঠিল। ক্ষিপ্ত ক্রোধের একটা দীর্ঘ 'কি' টানিয়া কলসী ছাড়িয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইল এবং তাহার কৈশোর-অবসানের কটাক্ষে যতটা দাহ ছিল, সমস্ত দিয়া ছেলেটার পানে অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল।

ছেলেটা অবিচলিতই রহিল। সকৌতুক দৃষ্টিতে সঙ্গিনীর অনলবর্ষী নয়নের দিকে চাহিয়া বলিল, তোমার যে সবই উছলে পড়ছে—তোমার রাগ—কলসীতে জল—আর—আর—থাক্, সর, আমায় ভ'রে নিতে দাও এখন।

মেয়েটার ঠোঁট দুইটি কাঁপিয়া উঠিল। প্রথম খানিকটা একটা কথাও উচ্চারণ করিতে পারিল না, তাহার পর হঠাৎ বাঁধ ভাঙিল এবং 'ঝাড়ু মারা' হইতে আরম্ভ করিয়া যতগুলি গালাগাল এক দমে মনে পড়িল, সবগুলি অনর্গল আওড়াইয়া সে কলসীটাকে বাঁকা কাঁকে সজোরে বসাইয়া দিল এবং ঝাঁকানির চোটে জল ছিটাইতে ছিটাইতে গৃহের অভিমুখিনী হইল।

ফণা ধরিলেই সাপকে মানায়। এই প্রচণ্ড বালিকার সহজ সৌন্দর্য্য ছেলেটা বোধ হয় উপভোগ করিতেছিল; সে খানিকটা চলিয়া গেলে গলা উঁচাইয়া কহিল, তোমার নামটা কি ব'লে যাও, এসব গালাগালির জন্যে মুন্নাকাকার কাছে নালিশ করতে হবে। 'বাতাহিয়া' বললে তো আবার একচোট ক্ষেপে উঠবে।

মেয়েটা দৃপ্তভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। রক্তিম মুখটা দুলাইয়া দুলাইয়া বলিল, করিস নালিশ মুন্নাকাকার কাছে, আমি ভয় করি না। বলিস, লছিয়া আমায় ঝাড়ু মেরেছে, লাথি মেরেছে, আর খড়ের নুড়ো দিয়ে আমার বাঁদুরে মুখটা পুড়িয়ে দিয়েছে; বলিস—একশো বার বলিস।

সে আবার সবেগে ঘুরিয়া পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল।

২

মুন্নাকাকার কাছে কোন পক্ষেরই নালিশ রুজু হইল না, এবং এই অপ্রিয় ঘটনার পর হইতে দুইজনে যে মুখ-দেখাদেখি কি কথাবার্ত্তা বন্ধ হইল, এমনও নয়। বর্ষা আসিয়া পড়ায় দেখাশুনাটা অবশ্য প্রতিদিনই ঘটিয়া উঠিত না। যেদিন জল নামিত সজোরে, লছিয়ার সেদিন প্রায়ই আসা হইত না। মুন্নাই ভিজিয়া ভিজিয়া কলসী ভরিয়া লইয়া যাইত। ছেলেটা নিজের নিরিবিলি দো-চালা হইতে ব্যাপারটা দেখিত; আস্তে

আস্তে ভিতরে যাইয়া কলসী দুইটা নাড়িয়া দেখিত—যদি সামান্যও জলের শব্দ হইত, বলিত, আজ বাসিয়ে পানিসে চলি; আরে কৌন ভিঙে একচুক পানি লাগি। যদি কলসীটা একেবারেই ঢনঢন করিত, বাধ্য হইয়া ভিজিতে ভিজিতে সিকি কি আধা ভাগ ভরিয়া চলিয়া আসিত; এবং মুখখানি বর্ষার মেঘের মতই মলিন করিয়া হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিত।

বাহির হইতে যতদূর বোঝা যায়, এরূপ অবস্থা লছিয়ার মনে কোন ভাবের ঢেউ তুলিত না। তাহার কারণ, তাহার মনটা ছিল স্বভাবত আত্মস্থ—বাহিরের সহিত তাহার আদান-প্রদান ছিল অল্পই। নিজের কয়েকটা খেয়ালের নিগূঢ় সাহচর্য্যের মধ্যে সে বেশ নিশ্চিন্তভাবে তাহার দিনগুলা কাটাইতেছিল। তাহার বয়সের সহিত সেগুলির কোন সামঞ্জস্য আছে কি না, এসব কথা ভাবিয়া দেখিবার তাহার অবসর বা চৈতন্য ছিল না; এবং লোকে যদি কোন গরমিল আবিষ্কার করিয়া তাহাকে 'বাতাহিয়া' আখ্যা দেওয়া উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া থাকে তো করুক—সে গ্রাহ্য করিত না।

একটু—খুব সামান্য ব্যতিক্রম ঘটাইত কলতলাটা। সেইখানে ব্যয়িত তাহার জীবনাংশে আশা-বিষাদের একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব মিশ্র অনুভূতি জাগিয়া উঠিতেছিল। সেটাকে সে যে পূর্ণভাবে নিজের হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতেছিল, এমন নয়; সেটা শুধু ধরা-ছোঁওয়ার বহির্ভূত একটা অস্পষ্ট আকারে তাহার উদ্দাম মনটাতে ছায়াপাত করিয়া মিলাইয়া যাইত। তাহার এমন ভাষা ছিল না যে, সে এই আভাসটুকুকে একটা আকার দিয়া বুঝিতে-সুঝিতে পারে—কারণ, যৌবন স্বীয় আগমনের সঙ্গে আর সকলকে যে শব্দসম্ভার দিয়া চৈতন্য ও স্পন্দন দান করে, লছিয়াকে তাহা দিবার অবসর পায় নাই। কলতলার একটা

টান ছিল, কিন্তু সেটা বেদনার টান, কি সুখের, এবং তার উদ্ভবই বা কোন্‌খানে, সেটা সে বুঝিতে পারিত না; তাই কলতলা ছাড়িয়া সে বাঁচিত, কি মরিত, বলা কঠিন; তবে বাড়ি আসিলে তাহার সহজ প্রাত্যহিক জীবনের পাশে কলের স্মৃতি আসিয়া তাহাকে বিব্রত করিতে পারিত না, এটা ঠিক; কারণ মনটা ছিল তাহার বীণার মত—একটু ঘা পড়িলে একটু রনরনিয়া উঠিত বটে, কিন্তু তাহার স্মৃতি সে বহন করিয়া রাখিতে পারিত না।

এক-একদিন লছিয়া বুড়ার সহিত ঝগড়া করিয়া নিজেই জল ভরিতে আসিত। বুড়াকে বলিত, জলে ভিজে ভিজে তুই যদি মরিস, তা হ'লে আমি দাঁড়াব কোথা? সবাইকে তো পেটে পুরে ব'সে আছিস; কাউকেও রেখেছিস কি?

বুড়া বিষণ্ণভাবে মাথাটা নাড়িয়া বলিত, ঠিক বাত, ঠিক বাত, তবে কথা এই লচ্ছি, তুই বা যদি জ্বরে পড়িস, তা হ'লে তোর যে একটা বন্দোবস্তের কথা কদিন থেকে আমি ভাবছি, সেটাতেও যে বাগড়া প'ড়ে যাবে!

এ কথাটা লছিয়া মোটেই বরদাস্ত করিতে পারিত না। একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিত, মুখ ভেঙাইয়া বলিত, বন্দোবস্ত! বন্দোবস্ত! আমার বন্দোবস্ত করলে ওই হাড় কখানা আগলাবে কে? শেয়াল-কুকুরে? বুড়ো বয়সে তোর মতিচ্ছন্ন ধরেছে, তা আমার বুঝতে বাকি নেই। তা দেখি, আমি আগে যমের সঙ্গে তোর বন্দোবস্ত করি, কি তুই আমার বন্দোবস্ত করিস!

বর্ষা গেল, শীত গেল, বসন্ত ফিরিয়া আসিল। জলের ভিড় আবার জমিয়া উঠিতে লাগিল এবং এই জমায়েতের সুখ-দুঃখ বাংলার নিন্দা এবং মুল্লুকের তারিফ প্রভৃতি সেই পুরাতন গল্পের মধ্যে একটা নূতন

বিষয় মাঝে মাঝে আলোচিত হইতে লাগিল—সেটা স্নুনরা ও লছিয়ার পরিবর্দ্ধমান ঘনিষ্ঠতা। সকলেই নাসিকা কুঞ্চিত করিতে লাগিল, ভ্রূ কপালে উঠাইতে লাগিল, একাল-সেকালের তুলনা করিতে লাগিল এবং সবশেষে নিলিপ্তভাবে এই অভিমতই প্রকাশ করিতে লাগিল যে, যাহার নাতনী, তাহারই যখন চাড় নাই তো অপরের মাথা ঘামাইয়া ফল কি ?

প্রকৃতই, স্নুনরা ও লছিয়া একটু বাঁড়াইয়া তুলিয়াছে। তাহাদের কলতলার কলহ দুই-একটা লোক জড় না হওয়া পর্য্যন্ত আজকাল আর থামে না, আর তাহাদের গল্পহাসি শুরু হইলেও একটু বিবেচক লোকের চক্ষে তাহা কেমন-কেমন ঠেকে। এমন কি স্নুনরা জ্বরে পড়িলে লছিয়া দুই-একবার তাহার জল যোগাইয়া, তাহার পটলের ঝোলের পথ্য পর্য্যন্ত রাঁধিয়া দিয়া আসিয়াছে। মুন্নাও যে কথাটা নেহাত না জানিত এমন নয়, কারণ জল তুলিতে যাইয়া স্নুনরার গৃহে এসব উপলক্ষ্যে যেটুক বিলম্ব হইত, লছিয়া তাহার একটা মনগড়া জবাবদিহি দিবার চেষ্টা করিত।

স্নুনরা কিন্তু কখনও পাল্টা ভিজিট দেয় নাই—লছিয়া জ্বরে মরণাপন্ন হইলেও নয়। মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা বোধ হয় বলিবেন, তাহার মনে গলদ ছিল বলিয়া সে এতটা খোলা-প্রাণ হইতে পারিত না। কথাটা অসম্ভব নয়, হইতেও পারে। তবে লছিয়া ভাল হইয়া যদি মুখভার করিয়া অনুযোগ করিত, স্নুনরা বলিত, সাহেবের বাড়ি পর্য্যন্ত তাহাকে খাটিতে হয়, তাহার কি নড়িবার জো আছে! যদি মনটা লছিয়ার ভাল দেখিত, কখনও কখনও একটু যোগও করিয়া দিত, আর তোমার অসুখ হ'লে আমিই কি এমন ভাল থাকি লছ্ছি, যে, দু পা হেঁটে দেখে আসব ?

লছিয়া বলিত, আচ্ছা, জ্বর-বোখার শুধু আমার জন্যে কালীমাই তোয়ের করেন নি ; তখন দেখা যাবে।

অনেকদিন এই ভাবেই গেল, তার পর একদিন এই ঘটনাটি ঘটিয়া বসিল।—

সেদিন ছিল দোল-পূর্ণিমা। কলের ছুটি, ঘরও খালি—লোকগুলা রাস্তায় পিচকারির উৎসবে মাতিয়া বেড়াইতেছে। শ্লীল-অশ্লীল নানা-বিধ গীতে, হাসির উন্মাদ হররায় আর বেয়াড়া খঞ্জনি-বাঁধা ঢোল ও করতালির সৃষ্টিছাড়া আওয়াজে এই অল্প-পরিসর জায়গাটা গমগম করিয়া উঠিয়াছে। এত লোক যে এখানে ছিল, তাহা ভাবিয়া উঠা যায় না।

সুনরাও ময়লা কাপড়ের উপর একটা নূতন পিরান চড়াইয়া, মাথায় একটা ধোপদস্ত ফুলদার হালকা টুপি পরিয়া, রঙ আবীর ও কাদা মাখিয়া, মুখে কালি লেপিয়া, সঙ্গীদের পালাক্রমে গাধায় চড়াইয়া ও বারকতক নিজেও চড়িয়া সমস্ত সকালটা কাটাইল। একটা রসিক ছেলে সুনরা ও লছিয়াকে উদ্দেশ করিয়া বিচিত্র ছন্দে গান বাঁধিয়া আনিয়াছিল। সুনরা প্রথমটা বেজায় চটিল, দল ছাড়িবে বলিয়া ভয় দেখাইল, তাহার পর সরস গানটার মাদকতা যখন তাহার মনটা ভিজাইয়া দিল, সকলে পরামর্শ করিয়া লছিয়ার নামটা বাদ দিয়া ঘণ্টা দুইয়েক ছয় পংক্তির গানটা লইয়া গলার শিরা ফুলাইয়া শহরময় খুব একচোট চীৎকার করিয়া ফিরিল।

আন্দাজ একটার সময় তাহারা বাড়ি ফিরিল।

এক আনা দামের ছোট গোল আরসিটা ঝুড়ির 'পেটরা' হইতে বাহির করিয়া নিজের মুখটা দেখিতেই সুনরা হাসিয়া ফেলিল এবং তাহাতে দাঁতন দিয়া মাজা সাদা দাঁতগুলা বাহির হইয়া পড়ায় আরও যে একটা নূতনতর রূপ খুলিল, তাহাতে তাহার হাসির মাত্রাটা আরও বাড়িয়া গেল। মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া নিজের প্রতিচ্ছায়াটাকে বলিল, লছিয়া দেখলে আজ আর তোমায় আস্ত রাখবে না।

তাহার পর জামা-টুপি খুলিয়া বগলদাবা করিল এবং এক হাতে কলসীটা ঝুলাইয়া কলের দিকে চলিল।

দূর হইতে দেখিতে পাইল, রঙ-কাদা-মাখা গোটা চার-পাঁচ ছোট চ্যাংড়া ছেলের সহিত লছিয়া তুমুল বিবাদ জুড়িয়া দিয়াছে। তাহারাও গা না ধুইয়া ছাড়িবে না, লছিয়ারও জিদ—কোনমতেই তাহাদের কলতলা নোংরা করিতে দিবে না। পাটের কোম্পানি যখন এই সব 'নিশাবাজ' গুণ্ডাদের পুষিতেছে, তখন তাহারা কলের ভিতরকার ভাল পুকুরটাতে গিয়া স্নান করুক না, কে মানা করে? 'ভলে আদমির' মেয়েছেলেরা যেখানে খাবার জল লইতে আসে, সেখানে হারামজাদগি করিতে আসার কি অধিকার তাহাদের?

সুনরা পা চালাইয়া আসিয়া পৌঁছিল; আওয়াজ ভারী করিয়া প্রশ্ন করিল, কা ভইল রে?

ছেলেগুলা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, দেখ না সুন্দর ভাইয়া, বাতাহিয়ার বদমাশি।

বাতাহিয়ার বদমাশি! আর তোরা সব যত ভালমানুষ, না? কলতলাটা সব উচ্ছন্ন দিতে এসেছিস; পালা, না হ'লে বসালুম কিল।—বলিয়া সুনরা কৃত্রিম রোষ দেখাইয়া দুই-একটা ছেলেকে ধরিতে গেল; দল ভাঙিয়া ছেলেগুলা দিগ্বিদিকে ছুট দিল। একটা ছেলে নিরাপদ ব্যবধানে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আর তুমি গা ধুলে বুঝি দোষ নেই? নিজের চেহারার দিকে একবার দেখ দেখি।

আরে, আবার তর্ক করে!—বলিয়া সুনরা আর একটা তাড়া দিল। আর কেহ দাঁড়াইতে সাহস করিল না, অনেক দূরে গিয়া হাততালি দিয়া ছন্দোবন্ধে গাহিতে লাগিল—

বাতহাইয়াকে পিছে সুন্দর বাতাহা ভেলন বা—

হাঙ্গামাটা থামিয়া গেলে কৃতজ্ঞতার বদলে লছিয়া সুনরার মুখের পানে চাহিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, অনমন বন্দরকে মাফিক দেখাবতাড়। অর্থাৎ ঠিক বাঁদরের মত মানাইয়াছে।

সুনরা বিকট হাসি হাসিয়া ফেলিল। তাহার পর হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, দেখ্ লছিয়া, আজ আমার মনটা অন্য ধরনের, বেশি ঘাঁটাস নি। হোলির দিন, তোর গালগুলোও এত মিষ্টি লাগছে যে, না জানি কি হতে কি হয়ে যায় শেষে!

লছিয়ার মেজাজ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া গেল। চোখ পাকাইয়া সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, খবরদার, কার সঙ্গে কথা কইছিস, মনে থাকে যেন। তোদের সব কাণ্ডকারখানা দেখে আর ছেলেগুলোর ব্যবহারে আমার নিজের মনেরই ঠিক নেই, এর ওপর যদি মাতলামি করিস আমার সামনে—

সুনরা দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল, মাতলামি? শিউলি যদি তালের রস খাইয়ে বলে—মাতলামি করিস না, তবেই তো গেছি। আজ সকাল থেকে আমি তোর নেশায় ভরপুর হয়ে আছি লছিয়া—ধর্ম্ম জানেন, আর কোন নেশা করি নি—তোর ভাবনার রস খেয়েছি, তোর গানের রস খেয়েছি, তাই বলছি, তোর কথার রস খাইয়ে আমায় আর বেসামাল করিস না—

লছিয়া রাগে চীৎকার করিয়া উঠিল, বলিল, বড় বাড় বেড়েছিস সুনরা, চুপ কর্ বলছি; যদি এখনও মুখ না সামলাস তো তোর উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়াব, আমি এক্ষুনি লোক জড় ক'রে তোর যে দশা আজ পর্য্যন্ত হয় নি, তাই করাব।

সুনরা শান্তভাবে বলিল, দেখ্ লছিয়া, আমাদের দুজনের মধ্যে যে ঝগড়া, তাতে কি লোক ডাকা উচিত? আপস ক'রে নেওয়াই—

লছিয়া রাগে অন্ধপ্রায় হইয়া গিয়াছিল; কিছু না পাইয়া উন্মাদের মত গালাগালি করিতে করিতে কলের মাথার উপর হইতে স্থনরার পিরানটা টানিয়া ফ্যাসফ্যাস করিয়া ছিঁড়িয়া দিল এবং তাহাতেও তৃপ্তি না হওয়ায় নিজের কলসীটা কলের শানের উপর আছাড় দিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়িমুখো হইল।

স্থনরা ছেলেটাকে আজ ভূতে পাইয়াছিল। নিজের ছেঁড়া জামাটা একবার চোখের সামনে মেলিয়া দেখিল, ভাঙা কলসীটার দিকে চাহিল, তাহার পর ছুটিয়া গিয়া রোরুদ্যমানা লছিয়ার হাতটা ধরিয়া নিতান্ত বেদন-মিনতি স্বরে বলিল, লছিয়া, ঢের তো হয়েছে, মাফ কর্; ফিরে চল্, তোর কলসীটা কিনে দিই।

কথাটা অবশ্য সমস্ত শোনানো গেল না, কারণ হাত ধরিতেই লছিয়া গলা চিরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং ঝাঁকি দিয়া ছাড়াইয়া লইয়া সজোরে স্থনরার গালে বিরাশি-সিক্কার একটা চড় বসাইয়া দিল, লাথি ছুঁড়িল এবং রাগের আধিক্যে আর 'পাদমপি' চলিবার সামর্থ্য না থাকায় রাস্তার মাঝে বসিয়া চুল ছিঁড়িয়া, জামা ফাড়িয়া এক কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড বাধাইয়া দিল।

স্থনরা হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এমন সময় কানের কাছে গুরু-গম্ভীর আওয়াজ হইল, ই সব কো—ন বাত বা? এবং স্থনরা নিজে ফিরিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই বক্তা দৃঢ় মুষ্টিতে তাহাকে ফিরাইয়া পুনরপি প্রশ্ন করিল, সুন্দর, ই সব কৌন বাত বা? ভালা আদমি কহলাবতাড় না? অর্থাৎ ভদ্দরলোক ব'লে তোমাকে সবাই জানে তো? তবে কি-এ কাণ্ডকারখানা?

স্থনরা দেখিল, কলতলায় খানিকটা ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে এবং সেটা তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে; তাহার প্রশ্নকারী স্বয়ং হনুমান মাহতো—তাহাদের 'মানজন', অর্থাৎ মোড়ল।

লছিয়া তেমনই জোর গলায় চীৎকার করিতেছিল, সাজা দাও ওকে, ও ভদ্দরলোকের মেয়ের গায়ে হাত দিয়েছে, কলসী ভেঙে দিয়েছে ; দেশ থেকে তাড়াও ও হারামজাদাকে। আমি আর এ দেশে থাকতে চাই না। এখানকার 'মানজনে'র মুখে ছাই দিয়ে, সমাজের মুখে ছাই দিয়ে, আর ও হারামজাদার মুখে নুড়ো জেলে, আজই এ দেশে ঝাড়ু মেরে চ'লে যাব আমি। আর সেই হতভাগা বুড়ো মড়াটারও একটা ব্যবস্থা করব, যে নিজের নাতনীর ইজ্জৎ রাখতে পারে না।

কথাগুলায় বৃদ্ধ হনুমান মাহতো স্থির গাম্ভীর্য্য হইতে হঠাৎ সপ্তমে চড়িয়া উঠিল ; সুনরাকে একটা জবরদস্তি ঝাঁকানি দিয়া বলিল, ঠিক কথাই তো ; দাঁড়া এখানে তুই, উপযুক্ত সাজা তোকে দেওয়া হবে। ছেলেমেয়েগুলা বেজায় ঠাট্টা গালাগালি লাগাইয়া দিয়াছিল, তাহাদের বলিল, একে ঘিরে দাঁড়া, যেন পালায় না।

সুনরা পলাইবার কোন লক্ষণ না দেখাইয়া গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। হনুমান রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে যাইয়া লছিয়াকে লইয়া স্নেহভরে তাহাকে একবার বুকে চাপিল, গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া দিল এবং তাহার কাপড়-জামাগুলা গুছাইয়া দিয়া মুন্নার বাসার দিকে চলিল ; পিছন ফিরিয়া সুনরাকে বলিল, চল্, এগো, আজ একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে, আর অসহ্য হয়ে পড়েছে।

৩

দোল-পূর্ণিমার রাত্রি।

মানজন হনুমান মাহতোর বাসার সামনে প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছটার তলায় পঞ্চায়েৎ বসিয়াছে। মাঝখানে একটা তাড়ির কলসী, গোটাকতক কাচের গেলাস ; চারিদিকে সমাজের বিজ্ঞেরা বসিয়া। সুনরার বিচার হইবে, সে বিধিমত এক পাশে করজোড়ে দাঁড়াইয়া।

বেজায় গোলমাল হইতেছিল। নেশা চড়াইয়া হাত দুইটা তুলিয়া হনুমান মাহতো সকলকে চুপ করাইল, তাহার পর একটু একটু জড়িত কণ্ঠে বলিল, সুন্দর, অব ভাই সবকে সামনে বোল, কাহে তু লচ্ছি-মাইকে দেহমে হাত চড়হয়লে রহ।—অর্থাৎ সমাজ-ভাইদের সামনে বল তুমি, লচ্ছি-মায়ের গায়ে কেন হাত দিয়েছিলে!

সুনরা তেমনই চুপ করিয়া রহিল, না রাম, না গঙ্গা—কিছুই বলিল না।

হনুমান তাগাদা দিল, কহ, কহ, হোঅ।

তখন স্থির পরিষ্কার কণ্ঠে সুনরা বলিল, উ হমনিকে মেহরারু বা।—অর্থাৎ আমার স্ত্রী ও।

কথাটাতে সভাতে হৈ-হৈ পড়িয়া গেল এবং 'মার হারামজদাকো, পিটো বদমাইশকো' গোছের কয়েকটা অশুভসূচক ভাঙা ভাঙা কথা বেশি বেশি শোনা যাইতে লাগিল। কয়েকটা ছেলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া শক্ত জমিটার উপর নিজের নিজের লাঠি ঠুকিয়া তাহাদের উৎকট অভিমত জ্ঞাপন করিল। বিজ্ঞেরা বোধ হয় কথাটা তেমন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না, তাই এক এক চুমুকে বুদ্ধিটা একটু চাঙ্গা করিয়া লইল। মুন্নার নেশাটা একটু বেতরহ হইয়া পড়িয়াছিল। টলিতে টলিতে দাঁড়াইয়া বলিল, হারামজাদা, তোর জিবটা উপড়ে নোব এখনই।

একজন তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া বসাইয়া দিল। হনুমান সুনরাকে বলিল, নেশা ক'রে তোর আজ মতিগতি ঠিক নেই, আমি টের পাচ্ছি। বুঝে-সুঝে কথা বলবার চেষ্টা করিস ভাইদের সামনে।

সুনরা মাথাটা সিধা করিয়া বলিল, সুনরা তাড়ি খেয়েছে—এ কথা কেউ বলতে পারে না। গলায় আমার বৈষ্ণবের কণ্ঠি—সেটা দেখেও ও কথাটা বলায় ধর্ম্মকে গাল দেওয়া হয়েছে। আমি ঠিকই আছি, আর লছিয়া যে আমার স্ত্রী—এ কথাও খাঁটি।

মুন্না আবার ঠেলিয়া উঠিতেছিল, পাশের একজন লোক হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বসাইয়া দিল এবং এক গেলাস ভর্ত্তি করিয়া বলিল, ধর, মাথা ঠাণ্ডা কর, এটা ঘাবড়াবার সময় নয়।

সুনরা বলিল, আমি সমস্ত কথা ব'লে যাচ্ছি, মুন্নাকাকা মিলিয়ে দেখুন ঠিক কি না, আর লছিয়াও তো সামনে আছে, কিছু কিছু তারও মনে থাকতে পারে।

লছিয়ার নামে মুন্নার সিক্ত মনে স্নেহটা বোধ করি উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিল, লচ্ছি, আমার কাছে এসে ব'স তুই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে ননীর পা দুটো তোর ভেঙে যাচ্ছে, সে আর আমি প্রাণ ধ'রে দেখতে পারছি না।

নাক সিঁটকাইয়া লছিয়া বলিল, বেশ আছি আমি, আর আদর দেখাতে হবে না; তাড়ির গন্ধের মধ্যে গিয়ে বসতে পারি না। যত সব মাতাল বসেছে; বিচার হবে উনুনের পাশ।

মুন্না প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া ফেলিল এবং অন্য মাতব্বরেরা যোগ দিল। একজন হাসির মধ্যে হঠাৎ থামিয়া বলিল, লচ্ছি-মাই আজ বড় চ'টে আছে, ছেলেটাকে জবরদস্ত সাজা দিতে হবে।

সুনরার প্রতি হুকুম হইল, বল্, তোর কি বলবার আছে?

সুনরা বলিতে লাগিল, আমার প্রকৃত নাম মোতীলাল, সুন্দর নয়; বাড়ি আমার বালিয়া জেলায় গজরাজপুর গ্রামে। বাপের নাম ছিল

মুহূর্ত্তের মধ্যে মুন্নার ভাবটা বদলাইয়া গেল, নামটা শুনিয়াই সে উঠিয়াছিল, আস্তে আস্তে সুনরার সামনে গিয়া একেবারে মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া দুই মিনিট ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, লচ্ছি, আয় দেখি, দেখ্ দেখি, তুই কি কিছু চিনতে পারিস? আমার যেন মনে হচ্ছে—

লছিয়াও মাথার কাপড়টা তুলিয়া দিয়াছিল, গালের উপর ঘোমটাটা টানিয়া দিয়া মাথাটা পিছনে ঘুরাইয়া, গলাটা নামাইয়া বলিল, হাম কি জানি ?

মুন্না ফিরিয়া আসিয়া আর আধ গেলাস শেষ করিল, তাহার পর স্নুনরাকে বলিল, আচ্ছা, ব'লে যা, দেখি, আর সব মেলে কি না !

স্নুনরা কৌতূহলস্তব্ধ সভার ঔৎসুক্য বাড়াইয়া বলিতে লাগিল, আমাদের গ্রাম থেকে দশ ক্রোশ দূরে মঝৌলিতে আমার বিবাহ হয়। সে প্রায় দশ বৎসরের কথা। নেহাত ছেলেমানুষ ছিলাম ব'লে সব কথা মনে পড়ে না। মনে পড়ে শুধু, শ্বশুরবাড়ির সামনে প্রকাণ্ড বটতলাটার নীচে আমার পাল্কিটা নেমেছিল। রাস্তায় ভয়ানক বৃষ্টি হয়েছিল ব'লে কি একটা ছুতো ক'রে বাবা শ্বশুরের সঙ্গে খুব একচোট ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছিলেন এবং শ্বশুরের পক্ষ থেকে মারামারির ভয় দেখিয়ে আমার জবরদস্তি বিবাহ দেওয়া হয়েছিল। সেই তুমুল বর্ষা আর ভীষণ ঝগড়া ও গোলমালে রাতের সব কথা মনে থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু মুন্নাকাক্কা বোধ হয় এই সব পরিচয় থেকেই টের পাবেন যে, আমি মিথ্যা কথা বলছি না। সে সময়ের মুন্নাকাক্কার চেহারাটা বেশ মনে পড়ে, কেন না উনিই আমায় পাল্কি থেকে চ্যাংদোলা ক'রে গাজুরি বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন, ওঁর চেহারা তখন ছিল পালোয়ানের মত—গালে গালপাট্টা দাড়ি ছিল, হাতে লোহার একটা বালা ছিল ; আমার বেশ মনে পড়ে, প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে আমি চীৎকার করতে করতে ওঁরই বুকে মুখ গুঁজেছিলাম। আজ আমায় ভগবান ভুলেছেন, সুতরাং সবাই ভুলবে ; তবে আমি যে বুকে একদিন আশ্রয় পেয়েছিলাম, তার আশা কখনও ছাড়ব না।

স্নুনরা থামিল। একটু চুপ করিয়া আবার আরম্ভ করিতে যাইতেছিল। বুড়া মুন্না আর থাকিতে পারিল না, হাত দুইটা বাড়াইয়া

সুনরার পানে ছুটিল, বলিল, আবার তোকে বুকে নিই, আয় মোতিয়া, আর সেসব পুরানো কথা তুলে আমায় পাগল করিস না।

হনুমান মাহতো তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, কহিল, মাথা ঠাণ্ডা কর দোস্ত। আরে, কে ও, তা কে জানে? সেসব কথা অন্য লোকে জেনে নিতে পারে না? সভার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হো ভাই সব, ঠিক বোলতানি কি না?

সকলেই সমস্বরে বলিল, ঠিক বাত, বহুত ঠিক, বহুত ঠিক।

একজন প্রাচীন এ পর্য্যন্ত রায় দিল, আজকালকার জমানা, কত লোক কত মতলবে ঘুরছে, কে জানে? লছ্‌মি-মাইয়ের লছমীর মত চেহারা দেখলে অনেক ছেলেই এসব কথা প্রাণ দিয়ে খুঁজে বার করতে পারে। আমি জিজ্ঞাসা করি, যদি বিয়েই করেছিলি তো এতদিন কোন্ জাহান্নমে, নিজের সমর্থ পরিবার ছেড়ে, ছিলি রে হতভাগা?

সুনরা বলিল, সে কথাও বলছি। বিয়ের প্রায় চার বছর পরে, আমার বয়স তখন তেরো কি চোদ্দ হবে, চা-বাগানের এক সেপাই আমাদের গ্রামে এসে উপস্থিত হয়। এসে গ্রামের যে জোয়ান জোয়ান ছেলেগুলো ছিল, সেগুলোকে খুব ভজাতে আরম্ভ করলে। গ্রামের এক প্রান্তে সে বাসা নিয়েছিল। দলে দলে আমরা সেখানে জুটতাম, তার পয়সায় খাওয়া-দাওয়া নেশাভাঙ করতাম, আর চা-বাগের গল্প শুনতাম। শিকারের দল যখন বেশ জ'মে এসেছে, সেপাইটা একদিন সকলের সামনে একটা প্রকাণ্ড খাতা খুলে ধরলে আর বললে, নাও, একে একে সই কর; দু বছরের শর্ত্ত, তবে আমি যখন মাঝখানে আছি, যার যখন খুশি ছেড়ে চ'লে আসতে পার, সাহেবকে আমি মুঠোর মধ্যে রেখেছি, উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে। আর বেশি দেরি করা চলে না, কাল ভোরের গাড়িতেই রওনা হতে হবে। কাল সাহেবের তার এসেছে,

আমার জন্যে কাজকর্ম্ম সব বন্ধ। আরও অনেক কথাই বললে, অনেক লোভই দেখালে, সব এখন মনে পড়ে না। সেদিন আমাদের নেশার মাত্রাটা বেশি হয়েছিল, প্রায় সবাই সই করলে; যারা করলে না, তারা যাতে গ্রামটাকে সতর্ক ক'রে না দিতে পারে, সেজন্যে বেশি আগ্রহ ক'রে তাদের নেশাটা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। সকালের গাড়িতে আমরা কজন রওনা হলাম।

চা-বাগানে এসে দেখলাম, চার বৎসরের জন্যে সকলের পায়ে শিকল আঁটা।

আমি খালি সাবুত দিতে বসেছি; সেখানে চারটে বছর কি দুঃখে, কি যন্ত্রণায় কেটেছিল, তা আর ব'লে কি হবে? মোট কথা, মহাবীরজীর কৃপায় ছটা বছর জেল-খাটার মত কাটিয়ে দিলাম। অনেক ফন্দি ক'রে আবার শর্ত্ত লেখা থেকে বাঁচলাম এবং ভাঙা শরীর, ভাঙা মন নিয়ে গ্রামে ফিরে এলাম।

খবর নিলাম, বাবা মারা গিয়েছে, মা মারা গিয়েছে, ভাই সংসার চালাচ্ছে। ঘরে যেতে আর মন সরল না। সন্ধ্যার সময় বাড়ির সামনে দিয়ে শ্বশুরবাড়ির রাস্তা ধরলাম; কেউ চিনতে পারলে না। পিপর-তলায় বড়মঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বললাম, যতদিন না রোজগার ক'রে ফিরে আসছি, অভাগা সংসারটাকে তুমিই দেখো ঠাকুর।

সুনরার গলা ধরিয়া আসিয়াছিল, একটু থামিল। মুন্না ফোঁসফোঁস করিয়া কাঁদিতেছিল, ভাঙা গলায় বলিল, মোতি, আউর সাবুত দেবেকে না পড়ি রে, আ তু হামরা ছাতিমে। লছ্মি!

লছিয়া অশ্বত্থগাছের আড়ালে কখন আশ্রয় লইয়াছে, কোন উত্তর দিল না। সুনরা বলিতে লাগিল—

শ্বশুরবাড়ি গিয়ে দেখলুম, সেখানেও সব ওলটপালট হয়ে গিয়েছে।

অনেক খোঁজ ক'রে পাওয়া গেল, লছিয়াকে নিয়ে মুন্নাকাক্কা বাংলা মুল্লুকে এসেছে, কোন কলে কাজ করে। বাড়িতে আর টান নেই, আসে না কখনও।

তারপর এই দু বছর কত কলে ঘুরেছি, কত সন্ধান করেছি, কাকে বলি? শেষকালে, আজ বছর খানেকের বেশি হতে চলল, এখানে এসেছি। খোঁজ করি, কোন ফলই হয় না। শেষে একদিন কলতলায় লছিয়াকে দেখলাম। কোন্ সেই ছেলেবেলায় একবার দেখেছি, ঠিক যে চিনতে পারলাম তা বলতে পারি না, তবে মনে একটা খটকা লেগে রইল। সন্ধান লাগাতে থাকলাম। অনেক খবর ইয়ার-দোস্তদের কাছে পাওয়া গেল। অনেক খবর জল নিতে গিয়ে কলতলায় লছিয়ার কাছেই পাওয়া গেল; ওটা ভারি বেহায়া হয়ে পড়েছে, হাউহাউ ক'রে সব কথাই বলত। মোটের ওপর, আমার আর কোনও সন্দেহ রইল না যে, মহাবীরজী মুখ তুলে চেয়েছেন।

হনুমান মাহতো বলিল, সেসব নয় মানলাম, কিন্তু এতদিন জেনে শুনে তোর জরুকে নিস নি কেন? সেজন্যে তোর পঞ্চ্ভাইয়েরা তো কোনমতেই মাপ করতে পারে না।

সুনরা বলিল, সে পঞ্চ্ভাইদের মর্জি; তবে তারও যে একটা কারণ না আছে, এমন নয়। দেখলাম, আমি তো একেবারে বিলল্লা, ঘরবাড়ি নেই, হাতে একটা কানা কড়ি নেই, সব দিন বোধ হয় ঠিক ভাতও জোটে না, এর মধ্যে ও বেচারীকে এনে আর কষ্ট দিই কেন? রোজ দেখা-শোনা তো হচ্ছেই, খবর তো পাচ্ছিই। ও দাদার কাছে সুখে আছে, থাক; বরং ওর জন্যে যে খরচটা হ'ত, সেটা জমিয়ে জমিয়ে একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাক্। এক-একদিন অবশ্য মনে হ'ত, সব কথা খুলে বলি, কিন্তু ভয় হ'ত, যদি কেউ বিশ্বাস না করে; তা হ'লে যেটুকু আশা

মনের মধ্যে আছে, তাও ভেঙে যাবে; নিজের মেহরারুকে বোধ হয় জন্মের মত হারাতে হবে। আর একটা কথা যা মনে হ'ত, তা পঞ্চ্ ভাইদের সামনে না বললে মনে পাপ থেকে যাবে, সেটা এই—ভাবতাম, লছিয়াকে সরিয়ে নিলে মুন্নাকাক্কা অন্য কোন আত্মীয়কে জোটাবে, কি পোষপুত নেবে। তা হ'লে—তা হ'লে মুন্নাকাক্কার সব টাকা, যার ওপর লছিয়ার সুখ এতটা নির্ভর করছে—

মুন্না আর কথাটা শেষ করিতে দিল না। তাড়াতাড়ি টলিতে টলিতে সুনরার হাতটা ধরিয়া টানিয়া আনিয়া নিজের কাছে বসাইল, হাসিতে হাসিতে বলিল, আরে, তুই চিরকেলে দুষ্টু, আমি খুব জানি। তাহার পর হনুমানকে বলিল, দোস্ত, খানিকটা সিঁদুর আনতে বল, মোতিয়া নতুন ক'রে লছিয়ার কপালে লাগিয়ে দিক। ছেলেটা সব কথাই বলেছে ঠিক; আর মিছে বললেও, আমার লচ্ছির একটা বিলি করতে হবে তো? আমি আর কদিন? কি হো ভাই সব?

সকলে বলিল, হুঁ হুঁ, ঠিক বাত, ঠিক বাত।

হনুমান মাহতো কিন্তু একটু বাঁকিয়া দাঁড়াইল, কহিল, কিন্তু তা হ'লেও যে নিজের স্ত্রীকে জেনে শুনেও এতদিন নেয় নি, আর দ্বিতীয়ত, স্ত্রী হ'লেও রাস্তায় যে তার গায়ে হাত দিয়েছে, তার জন্যে ভাইয়েরা ওকে ক্ষমা করতে পারে না। ওর সাজা—ওকে একদিন শহরের সব ভাইয়েদের ভাত-তাড়ি দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

শোক-সংবাদ

১

দেশবিশ্রুত ব্যবহারজীবী সার্ এস. এন. গুপ্টা মৃত্যুশয্যায়; সারা দেশে একটা উৎকণ্ঠা পড়িয়া গিয়াছে। এই বয়সে ডবল নিউমোনিয়া, আশা তো একেবারেই নাই। ডাক্তারদের এখন আর বিশেষ কাজ নাই; 'আর কতক্ষণ', শুধু এই লইয়াই তাঁহাদের মধ্যে বচসা চলিতেছে। সার্ শচীনের ক্রোরপতি মক্কেল দৌলতরাম গিরিধারী, মারোয়াড়ী মহলের শ্রেষ্ঠ ডাক্তার রায় সাহেব গৌরহরি বসাককে অষ্ট প্রহরের জন্য মোতায়েন করিয়া দিয়াছেন। রায় সাহেব সব লক্ষণ মিলাইয়া বলিয়াছেন, ভোর পাঁচটার পরে যদি রোগী বাঁচিয়া থাকে তো বুঝিবেন, তাঁহার চল্লিশ বৎসরের চিকিৎসাই বৃথা গিয়াছে।

'সত্যপ্রকাশে'র সম্পাদক হরলালবাবু নিজের আপিসের চেম্বারটিতে বসিয়া এক-একবার উদ্বিগ্নভাবে ঘড়ির পানে চাহিতেছেন এবং এক-একবার টেলিফোনের মাউথপিসে মুখ লাগাইয়া প্রশ্ন করিতেছেন, কি খবর সিতুবাবু? আর কতক্ষণ মশাই?

ব্যাপারটা এই।—মৃত্যুর খবরটা সর্ব্বপ্রথমে বাজারে বাহির করিয়া 'সত্যপ্রকাশ' কিছু করিয়া লইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। অতিরিক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া সমস্ত রাত ধরিয়া সার্ শচীন্দ্রের সুদীর্ঘ জীবনী এবং ততোধিক দীর্ঘ মৃত্যুবিবরণী কম্পোজ করা হইয়াছে—মায় ব্লক সমেত। কাগজের অন্যান্য পত্র ছাপা হইয়া গিয়াছে, এখন মৃত্যু-সংবাদটি পাইলেই এ সেটটাও প্রেসে চড়াইয়া দেওয়া হয়। হকাররা

উঠিবামাত্রই ইংরেজী বাংলা আর সব কাগজের পূর্ব্বেই যেন 'সত্য-প্রকাশে'র মারফৎ কলিকাতা এই জমকালো মৃত্যু-সংবাদটি পায়।

হলধরবাবু সবাইকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন, রায় বাহাদুর গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মরার সুবিধেটা আমরা শুধু গড়িমসি ক'রে হেলায় নষ্ট করেছি, এবারে সে লোকসানটুকু পর্য্যন্ত তুলে নিতে হবে। অমন জাঁদরেল লোক তো আর দেশে এবেলা ওবেলা মরছে না—একটা সুযোগ গেল তো আবার হাঁ ক'রে ব'সে থাক।

তাই নিজেও সমস্ত রাত জাগিয়া উদ্যোগী রহিয়াছেন।

গুপ্টা সাহেবের বাড়ির পাশেই একটি ডিস্‌পেন্সারির টেলিফোন-যন্ত্রটি 'সত্যপ্রকাশ' আজ সমস্ত রাতের জন্য ভাড়া করিয়া লইয়াছে। যন্ত্রটির সামনে স্টাফের একজন না একজন কোন লোক বসিয়াই আছে। ঘটনাটি ঘটা কি খবরটি আপিসে পৌছাইয়া দেওয়া—সঙ্গে সঙ্গে ছাপা শুরু এবং হলধরবাবুর ভাষায় বলিতে গেলে—কাক-কোকিল টের পাওয়ার আগেই 'সত্যপ্রকাশে'র হৈ-হৈ-রৈ-রৈ ক'রে বাজার ছেয়ে ফেলা, দেখি, কে এগোয় আমাদের সামনে এবারে!

মোটা কালো বর্ডার দেওয়া এক ইঞ্চি পরিমাণ টাইপের বিজ্ঞাপনপত্রী ছাপা হইয়া গিয়াছে।

বিনামেঘে বজ্রাঘাত—দেশব্যাপী হাহাকার—দেশবিখ্যাত মহাকর্ম্মী সার্ এস. এন. গুপ্টা বার-অ্যাট-ল-র বৈকুণ্ঠযাত্রা—তাঁহার দুর্ভেদ্য রহস্যজনক উইল—সত্যপ্রকাশের তিনপৃষ্ঠাব্যাপী শোকাঞ্জলি—লউন—পড়ুন—জাতীয় শোকের অশ্রুর তর্পণ করুন !!

রাত্রি একটা হইতে সহকারী সম্পাদক সিদ্ধেশ্বরবাবুই ওদিককার টেলিফোনে বসিয়া আছেন; এখন সাড়ে তিনটা কি চারটা হইবে। সমস্ত লোককে খুব সকাল সকাল আসিতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘুম

হইতে জাগিয়া সমস্ত দিন, আর রাত প্রায় এগারোটা পর্য্যন্ত গুপ্টা সাহেবের জীবনী ও "মরণী" লেখা, প্রুফ দেখা এই সবে কাটিয়াছে ; দুই ঘণ্টার মধ্যে আহারাদি ও নিদ্রা সারিয়া বসিয়াছেন। চায়ের চাড়া দিয়া ঘুম আটকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সে কি মানে? আমেজে ঢুলিতে ঢুলিতে প্রায় যন্ত্রটির উপর মাথাটি লাগ-লাগ হইয়াছে, এমন সময় 'কির্‌-কির্‌-ক্রিং-ক্রিং' করিয়া আওয়াজ হইল।

সিদুবাবু চকিত হইয়া উঠিয়া আড়ামোড়া ভাঙিতে ভাঙিতে বলিলেন, আঃ, লোকটা এ রকম ধুকপুকুনির মধ্যে ফেলে আর কত জ্বালাবে?

টেলিফোন ধরিলেন, হ্যাল্লো!

আর কত দেরি মশাই? পনরোটি হাজার কপি ছাপতে হবে, সে খোঁজ রাখেন? এদিকে রাত যে ফুরিয়ে এল!

সিদ্ধেশ্বরবাবু উত্তর করিলেন, কি করি বলুন? এখনও রয়েছে যে টিকে। ঠেঙিয়ে তো মারতে পারি না। মাঝে একটু বাইরে গিয়েছিলাম, হঠাৎ কান্না উঠল। এসে তাড়াতাড়ি টেলিফোনটি ধরতে যাব—হঠাৎ সব একেবারে চুপচাপ। এরা যেন দিব্যি এক খেলা পেয়ে গেছে।

তাই বটে, আর আমাদের এদিকে প্রাণ যায়। তা হ'লে একটা টাল গেছে বলুন? আমি তো বলি—দিই না চড়িয়ে, আর টিকবে না ; আমাদের ছাপা হতে হতে সাবড়ে যাবে।

আর একটু দেখুন, একেবারে দৈব ব্যাপার কিনা, না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

দুর্দ্দৈব! এ রকম তীর্থের কাকের মত আশায় আশায় ব'সে থাকা চাড্ডিখানি কথা মশাই?

নয়ই তো। কিন্তু কে শুনছে বলুন?

এ যেন সেই মাখন ভটচাজ্জের গঙ্গাযাত্রার মতন হ'ল। বুড়ো সাতটি দিন মাঘের শীতে গঙ্গার ধারে বসিয়ে রেখেছিল মশাই, না পারি ফিরতে, না পারি—

থামুন থামুন, ওইঃ, আবার কান্না উঠল।

সত্যি নাকি? জয় সিদ্ধিদাতা—তা হ'লে দিই চড়িয়ে?

সিদুবাবু ত্বরিতভাবে বলিলেন, একটু সবুর করুন, দেখে আসি, আসল কি মেকী!—বলিয়া রিসিভারটা রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া দীর্ঘ স্বরে নিরুৎসাহভাবে ডাকিলেন, হ্যা—ল্লো!

কি সংবাদ?

নাঃ, ভুয়ো। মুসৌরি থেকে এক মেয়ে এইমাত্র এসে পৌছল। 'বাবা গো! কোথায় গেলে গো!' করতে করতে হুড়মুড়িয়ে ওপরে উঠে গেল। সব সয়, ন্যাকামি সইতে পারি না মশাই, ওই তো বাবা জলজ্যান্ত রয়েছে রে বাপু!

আর এ রকম ছিঁচকাঁদুনে কটি মেয়ে বাইরে রয়েছে খোঁজ নিলেন? যত্তো সব—

খুটখুট করিয়া দুই-তিনটা বিরতির আওয়াজ হইল। সিদুবাবুও রিসিভারটা টাঙাইয়া রাখিলেন। ডাকিলেন, দাদা! ও দাদা!

'দাদা' বলিতে ডিসপেন্সারির কম্পাউণ্ডারবাবু। এই ঘরটিতেই এক কোণে ক্যাম্প-খাটে নিদ্রিত আছেন। ভালমানুষ গোবেচারী গোছের লোক, একটু বয়স হইয়াছে। কাজে অত্যন্ত নারাজ, গল্পে খুব দড়। কখনও হুঁকা আর চায়ে এলেন না। এই সব মজলিসী গুণের সমাবেশে 'সরকারী দাদা' হইয়া বসিয়াছেন।

আরও ছয়-সাত বার ডাকাডাকির পর জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, এই যে জেগেই রয়েছি। যমের দোরে ধন্না দেওয়া এখনও শেষ হ'ল না? কি খবর ওদিকে?

খবর সেই একঘেয়ে—মাঝে মাঝে শুধু হ্যায়লা হচ্ছে। আমি তো আর ঠায় ব'সে থাকতে পারি না দাদা, চোখ জুড়ে আসছে।

এক এক কাপ হয়ে যাক না, ক্ষতি কি?

সেইজন্যেই তো আপনাকে কষ্ট দেওয়া—আর স্পিরিট আছে?

না। কেন, বোতলে তো অনেকখানি ছিল, কি হ'ল?

এর মধ্যে যে চারবার স্টোভ জ্বালা হয়ে গেছে। আর বোতলগুলোর একটা দোষ লক্ষ্য করেছেন? যতক্ষণ বেশ সাবধানে 'বাপু বাছা' ব'লে আস্তে আস্তে ঢালবার চেষ্টা করবেন, কিছুতেই পড়বে না। তখন ভয়ানক রাগ ধরে—ধরে কি না বলুন না? স্পিরিট তো ছিল অনেক-খানিই, এখন বোতলটা একেবারে খালি।

তা হ'লে? দোকানের স্টক খালি। ব'লেই দিয়াছিলাম, কাল না আনলে—

তবেই তো! এক কাজ করব না হয়?

কি শুনি?

মনে করছি, একটু না হয় বাসায় চ'লে যাই। চা খাওয়াকে চা খাওয়া হবে, একটু বেড়ানোও হবে; রাত্তিরটুকুর জন্যে তা হ'লে এক রকম নিশ্চিন্দি।

ইহার মানে এই যে, তাঁহাকে গিয়া টেলিফোন ধরিতে হইবে। দাদা কোন উত্তর দিলেন না।

সিদ্ধেশ্বরবাবু বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, আর এই ফ্ল্যাস্কটাও নিয়ে যাচ্ছি, আপনার জন্যেও কাপ দুয়েক নিয়ে আসা যাবে 'খন।

হ্যাঁঃ, ঘাড়ে ক'রে আবার চা ব'য়ে আনা! আর দু কাপ কি হবে? সে বলতে গেলে তো ওতে চার কাপ এঁটে যায়, তাই ব'লে চার কাপ ভ'রে নিয়ে আসতে হবে? মোদ্দা, শিগগির আসা চাই—ঘুমকাতুরে লোক, জানই তো।

এই আধ ঘণ্টা লাগবে, তার বেশি নয়। অতবড় একটা ভাবনা লেগে রয়েছে, বুঝছেন না?

ভাবনা একটুখানি? বলে, 'যার বিয়ে তার চাড় নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই।' আর কেন? স'রে পড়, না বাপু। তিন দিন থেকে একটানা শ্বাস টেনে যাচ্ছিস। কি আর পাচ্ছিস এতে? একটা শখ নাকি?

সে কথা কে বলে বলুন?

তা আধ ঘণ্টা কোন রকমে চোখ-কান বুজে রয়েছি—মোদ্দা, ওই কথা, দেরি যেন না হয়।—বলিয়া দাদা বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেন।

চোখ-কান একটু সজাগ হয়েই বুজবেন তা হ'লে দাদা, আমি বলছিলাম, একটা বই-টই, কি কাগজ-টাগজ নিয়ে বসুন না না হয়।

আরে না না, অত হালকা নয়। একটি ছিলিমের ওয়াস্তা, সেই যোগাড়ই হচ্ছে, দেখ না। নাও, বেরিয়ে পড়।

২

দাদা তামাক সাজিলেন। কলিকার আগুনে টোকা দিতে দিতে নিজের মনে বিড়বিড় করিতে লাগিলেন, দিলে না বাঁচতে—নিশ্বেসে নিশ্বেসে মেরে ফেললে—আ-হা-হা-হা! তোর শোক-সংবাদের নিকুচি করেছে। হুঁকার মুখটি মুছিয়া সাদরে মুখ লাগাইবেন, এমন সময় শব্দ হইল—কিবৃ-কিবৃ-ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং—

তা জানি; বামুনের কপাল কিনা!—বলিয়া হুঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া রিসিভারটি তুলিয়া লইলেন, ডাকিলেন, হ্যাল্লো!

কি খবর? আছেন, না গেছেন?

না, গেছেন। বোধ হয় আধ ঘণ্টাটাক—

অত্যন্ত বিস্ময়ের কণ্ঠে উত্তর হইল, আধ ঘণ্টা! অথচ আমায় বলেন নি? আধ ঘণ্টায় কতটা কাজ—

না, আধ ঘণ্টা হয় নি এখনও; গেছেন তো এইমাত্র বলছিলাম, আধ—

শেষ হইবার পূর্ব্বেই উত্তর হইল, তাই বলুন। সময়ের আন্দাজটা আপনার যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি? গলাটা ভারী ভারী ঠেকেছে।

দাদা যে কখনও ঘুমান, এটা বাহিরে স্বীকার করিতে চান না! বলিলেন, নাঃ, এই তো আমরা দুজনে দিব্যি গল্প করছিলাম—একটা সঙ্গী পেলে কি ঘুম আসে?

সহাস্যে উত্তর হইল, তা বটে। আপনার সাথীটি খুব গল্পপ্রিয়, না?

দাদা এদিকে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আমারও ওপরে যান।

উত্তরস্বরূপ তারযোগে আবার একটু হাসি ভাসিয়া আসিল। প্রশ্ন হইল, যাক, তা হ'লে কখন ও সুমতিটা হ'ল?

দাদা আবার হাসিয়া বলিলেন, সুমতি হওয়াই বটে, যা অবস্থা হয়ে এসেছিল মশাই! মানুষের শরীর তো, কতটা সয় বলুন?—সেই এক ঠায়, এক ভাবে—

তা বইকি। যাক, আর বাজে কথায় সময় নষ্ট করবার ফুরসৎ নেই; কখন আসছেন তা হ'লে?

ওই যে গোড়াতেই বললাম, আর জোর আধ ঘণ্টাটাক লাগবে।

হ্যাঁ, সেই ভাল, আর যা যা সব জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, একটু জেনে নিয়ে আসাই ভাল, আবার যেন যেতে না হয়। বড্ড ভিড় কাজের এদিকে।

দাদা ভাবিলেন, আবার জ্ঞাতব্য বিষয় কি রে বাবা! আছে বোধ হয় কিছু, মরুকগে। বলিলেন, নাঃ, মেলা যাওয়া-আসা করবার দরকার কি?

তা হ'লে নির্ভাবনায় দিলাম চড়িয়ে—কতক্ষণ সাজা প'ড়ে রয়েছে।

কথাটা দাদার একটু যেন কি রকম বোধ হইল একবার; তখনই গনগনে কলিকাটির পানে দৃষ্টি পড়ায় রিসিভারটি টাঙাইয়া দিতে দিতে নিজের মনেই বলিলেন, ওদিকে তা হ'লে দেখছি, তাওয়া-দার কলকে-গড়গড়ার ব্যবস্থা। যাক, আমার গরিবের এইই মেওয়া।—বলিয়া হুঁকাটি তুলিয়া লইলেন।

ওদিকে প্রেসের কাজ সতেজে আরম্ভ হইয়া গেল। আর সব তৈয়ারই ছিল, শুধু মৃত্যুর সময়ের জন্য যেটুকু স্পেস খালি রাখা হইয়াছিল, সেটুকুতেই টাইপ বসাইয়া দেওয়া হইল। কালো বর্ডার এবং ললাটে বড় বড় টাইপের আর্ত্তনাদ লইয়া কাগজগুলা প্রেস হইতে একে একে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল। সারাংশেরও সারাংশ এইরূপ—

বাংলায় হাহাকার!—পরলোকে সার্ এস. এন. গুপ্টা!! বাংলার ভাগ্যাকাশ হইতে আর একটি নক্ষত্র খসিল। বঙ্গজননীর অঙ্ক শূন্য হইল; মার নয়নাশ্রুর বন্যায় আবার প্রলয়ের প্লাবন নামিল। সন্তানহারা অভাগিনী মা আমার, আজ কি বলিয়া তোকে সান্ত্বনা দিব? কোথায় পাব সান্ত্বনার স্নিগ্ধবাণী? সান্ত্বনা তো দিতে চাই; কিন্তু আজ শোকজীর্ণ লেখনী দিয়া যে প্রবল ধারে অশ্রুর

ধারাই নামিয়া আসিতেছে। এ নিদারুণ শোকে জড়ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, আবার প্রাণ জড়বৎ নিশ্চল।

বাংলার সুসন্তান, লক্ষ্মীর দুলাল, বাণীর বরপুত্র, কুবেরের কীর্ত্তিস্তম্ভ, কর্ম্মে অক্লান্ত, বাগ্মিতায় বার্ক, করুণায় দাতাকর্ণ, সত্যে যুধিষ্ঠির, দেশবিশ্রুত ব্যবহারজীবী সার্ শচীন্দ্রনাথ গুপ্টা আর ইহজগতে নাই। গতকল্য বুধবার রাত্রি চারি ঘটিকার সময় সমস্ত দেশকে হাহাকারে নিমগ্ন করিয়া এবং আত্মীয়-স্বজনের বক্ষে নিদারুণ শেল হানিয়া সার্ শচীন্দ্র ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন। হায়, কি কঠিন কর্ত্তব্য আমাদের! দুই মাসও অতীত হয় নাই, বাংলার ঘরে ঘরে আমাদের স্বনামধন্য মহাপুরুষ রায় বাহাদুর গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিদারুণ মৃত্যুসংবাদ পৌঁছাইয়া দিতে হইয়াছিল। দেশবাসীর কপোলে সে অশ্রুধারা শুকাইবার পূর্ব্বেই আবার এই মর্ম্মভেদী দুঃসংবাদ! সার্ শচীন কয়েক দিন হইতে জ্বরাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন; হঠাৎ বিগত সোমবার রাত্রি প্রথম প্রহর হইতেই নিউমোনিয়ার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। শহরের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ সমবেত হন। মহাসমারোহে চিকিৎসা-যজ্ঞ আরব্ধ হয়। হায়, কে জানিত, সে মহাযজ্ঞে যে হোমানল প্রজ্বলিত হইল, তাহা এই মহাপ্রাণের আহুতি না লইয়া নির্ব্বাপিত হইবে না? চিকিৎসাসাগর মথিত হইল; কিন্তু হে বৈরাগী, তোমার অঞ্জলি সুধার পরিবর্ত্তে গরলেই পূর্ণ হইবে, তাহা কে জানিত?…

নিউমোনিয়ার সংবাদ পাওয়া মাত্রই আমরা অতিমাত্র উদ্বিগ্ন হইয়া সার্ শচীন্দ্রের ভবনে উপস্থিত হই। বাংলা সংবাদপত্রের মধ্যে এক 'সত্যপ্রকাশে'রই সত্যনিষ্ঠায় অগাধ বিশ্বাস থাকায় আমরা বরাবরই এই পুরুষসিংহের কৃপাকটাক্ষ লাভ করিয়া আসিতেছি। এ কয় দিবস পাঠকবর্গকে প্রতিদিনের অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়াছিলাম। বড় আশা ছিল, অচিরেই আরোগ্যের শুভসংবাদ দিয়া দেশবাসীর অশান্ত চিত্তে শান্তির সুধাসিঞ্চনে সমর্থ হইব; কিন্তু হায়, 'কালস্য কুটিলা গতি'—আমাদের সে আশা সমূলেই নির্ম্মূল হইল।

ইহার পরে সংক্ষিপ্ত জীবনী। জীবন সম্বন্ধে প্রকৃত খবর জানিবার কোন রকম সুবিধা হয় নাই বলিয়া এই অংশে, সব কৃতী পুরুষের বেলাই মোটামুটি খাটে, এমন কতকগুলি ভাসা-ভাসা কথার অবতারণা করা হইয়াছে। গুপ্টা সাহেবের অতি শৈশবের কয়েকটি রোমাঞ্চকর উদাহরণ দিয়া বাল্যে গুরুভক্তি, কৈশোরে জ্ঞানতৃষ্ণা, যৌবনে দেশাত্মবোধের উন্মেষ, প্রৌঢ়ত্বে ত্যাগমহিমা এবং অবশেষে বার্দ্ধক্যে এই সমস্ত গুণরাজি একটা সহজ পরিণতি লাভ করিয়া কেমন ঈশ্বরানুমুখী ভক্তিতে পরিণত হইয়াছিল, তাহা অতি নিপুণতার সহিত বিশদভাবে দেখানো হইয়াছে। তথ্যের দৈন্য ভাষার সমৃদ্ধিতে সম্পূর্ণরূপে চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

সর্ব্বশেষে আছে—

আজ ভারত একজন অক্লান্ত কর্ম্মী এবং অকপট সেবক হারাইল—বঙ্গভূমি তাহার শ্রেষ্ঠ নিধি হারাইল—আর 'সত্যপ্রকাশ'? 'সত্যপ্রকাশ' যাহা হারাইল, তাহা আর ফিরিয়া পাইবে না। আজ সমস্ত দেশ শোকে মুহ্যমান, কে তাহাকে সান্ত্বনা দিবে? আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ঈশ্বর তাঁহাদের এই গুরু শোকভার বহন করিবার শক্তি দান করুন।

সার্ শচীন্দ্রের বিশাল সম্পত্তি সম্বন্ধে উইল এখনও রহস্যাবৃতই রহিয়াছে।

বেলা ছয়টা বাজিবার পূর্ব্বেই ছাপার কাজ শেষ হইয়া গেল। আপিসের বাহিরে দলে দলে হকাররা আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে; অন্য লোকদেরও ভিড় ভয়ানক। হাতে হাতে অনেক কাগজ বিক্রয় হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে কলিকাতার এ পল্লীটাতে মৃত্যুর সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া গেল। দুই-একজন, যাহাদের প্রকৃত সংবাদ জানা আছে বলিয়া বিশ্বাস ছিল, সন্দেহ প্রকাশ করিতে গিয়া এমন টিটকারির ঝাপটা খাইল যে, তাহাদের আর মুখব্যাদান করিতে হইল না।

হকাররা অন্য দিনের ডবল, তিনগুণ কাগজ লইয়া নিজ নিজ এলাকার পানে ছুটিল। দেখিতে দেখিতে বেলা সাতটার মধ্যে কলিকাতা শহরে খবরটা বেশ ভাল করিয়া ছড়াইয়া পড়িল।

ততক্ষণে অন্য দুই-একখানা ইংরেজী বাংলা মর্নিং পেপারও আসরে নামিয়াছে।

৩

বেলা ছয়টা হইলে সিদ্ধেশ্বরবাবু হাতে থার্মোফ্ল্যাস্কটা ঝুলাইয়া ডিস্‌পেন্সারিতে প্রবেশ করিলেন। টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন, আপনার চা। তারপর খবর কি?

হ'ল তোমার আধ ঘণ্টা? খবর ভাল নয়, বুঝি এ যাত্রাটা টিকেই গেল।

সিদ্ধেশ্বরবাবু একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, না না, বেঁচে যান সেই ভাল, অতবড় লোকটা। বেড়ানোটুকুতে উল্টো উৎপত্তি হ'ল দাদা; সারারাত ঘুম হয় নি, তার ওপর শেষ রাত্তিরের মিঠে হাওয়া, বাড়ি পৌঁছুতে পৌঁছুতে চোখের পাতা পাহাড়ের মত ভারী হয়ে এল। বিছানায় এলিয়ে প'ড়ে বললাম, নাও, শিগগির পাঁচ কাপ চা, এক্ষুনি বেরুতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। আপনার ভাদ্দরবউও আর প্রাণ ধ'রে তুলে দিতে পারে নি—হাজার হোক, মেয়েমানুষের জাত তো; দেড়টি ঘণ্টা কোথা দিয়ে যে কেটে গেল! তারপরে হঠাৎ সেই সর্ব্বনেশে—ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং।

সেখানেও টেলিফোন আছে নাকি?

টেলিফোন নয়। আপনার ভাদ্দরবউ চা তোয়ের করছে, বাসনের

ঠোকাঠুকি, চুড়ির আওয়াজ। তাতে তো ঘুমই আসে মশাই। কিন্তু ন্যাবা হ'লে সবই হলদে দেখে কিনা; আমার কানে বাজল, ক্রিং-ক্রিং ক্রিং। মনে যে একটা ভয়ঙ্কর ধুকপুকুনি রয়েছে এদিকে, বুঝলেন না কথাটা? তখন একটু রাগও হ'ল; কাজের সামনে পতিভক্তি-টক্তি বুঝি না বাবা, একটা বুড়ো লোককে জাগিয়ে সেখানে বসিয়ে এসেছি। একটু বকাবকি হয়ে গেল; মেয়েমানুষ, সহজে হটতে চায় না, জানেনই তো। তারপরে, এদিকে আপিসের খবর কি? ডাক-টাক পড়েছিল?

গোড়ায় প্রায় তুমি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পড়েছিল। লোকটি বেশ রসিক হে। অনেকক্ষণ কথা চলল, তারপর সাজা তামাক পুড়ে যাচ্ছে ব'লে বন্ধ করলেন। ভাল কথা, বাড়িতে কোন জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে গিয়েছিলে নাকি? জিজ্ঞেস করতে আমি বললাম কিনা, তুমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরবে; তাতেই বললেন, জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে শুনে আসাই ভাল। যাক, সে ভেতরকার কথা আমার শোনবার দরকার নেই; তবে কথাটা ভাল বুঝলাম না।

সিদ্ধেশ্বরবাবু একবার ওপর দিকে চাহিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন, কই, জ্ঞাতব্য আর কি? এক তো এই 'জ্ঞাতব্যের' ফেরে পড়েছি, দাঁড়ান, দেখি কি ব্যাপারটা!

হুঁ, বুঝুন একবার, আমি ততক্ষণ হয়ে আসি।

দাদা বাহির হইয়া গেলেন।

সিদ্ধেশ্বরবাবু মাউথপিসটা তুলিয়া লইয়া ডাকিলেন—০০০৯ বড়-বাজার।

এক্সচেঞ্জ হইতে জবাব আসিল—এন্‌গেজ্‌ড্।

সিদ্ধেশ্বরবাবু টেবিলের উপর একটু তবলা বাজাইলেন, ফ্ল্যাস্কের দিকে চাহিয়া দাদা চার কাপই একা সাবাড় করিয়া দিবে, কি একটু

আক্কেল করিবে, চিন্তা করিলেন; তাহার পর আবার যন্ত্রটা উঠাইয়া লইলেন।

কনেক্‌শন পাওয়া গেল; মন্থরভাবে ডাকিলেন, হ্যাল্লো! আমি সিদ্ধেশ্বর। কি খবর? কি করবেন স্থির করলেন? এদিকে এখনও—

খবর তো খুব ভাল; পনরো হাজার কাপির মধ্যে আর হদ্দ হাজার দুয়েক প'ড়ে আছে—রেকর্ড ডিম্যাণ্ড। আপনার ফুরসৎ হ'ল? এ ঝোঁকে কত ছাপতে হবে একটা পরামর্শ করতে হবে যে। আর নতুন মালমসলা কি পেলেন? আধ ঘণ্টার জায়গায় তো দু ঘণ্টা হয়ে গেল; খাঁটি খবরের যোগাড়ে আছেন ব'লে আর রিং-আপও করি নি।

কথাগুলো সিদ্ধেশ্বরবাবুর কানে যেন খাপছাড়া বোধ হইল; চিন্তিত-ভাবে ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, কি বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না, আর একটু স্পষ্ট ক'রে—

আর টেলিফোনে স্পষ্ট ক'রে বুঝতে হবে না, আপনি চ'লে আসুন। টেলিফোনে ব'কে ব'কে সারা হয়ে গেছি। এই এক্ষুনি তিনটি লোকের সঙ্গে তো প্রায় ঝগড়া হয়ে গেল। বলে, আপনারা ঠিক জানেন? বেশ ভাল ক'রে খবর নিয়েছেন? খবরটা কন্‌ফার্‌ম করিয়ে নিয়েছেন যে, তিনি মারা গেছেন? বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ মশাই, আমাদের নিজের লোক—স্বয়ং সাব-এডিটার প্রায় শিয়রে ব'সে, না ম'লে তিনি উঠতেই পারেন না।

শেষ করবার পূর্ব্বেই হলধরবাবুর কানে চীৎকারের স্বরে বিস্মিত আওয়াজ হইল, সে কি?

হলধরবাবু একটু থমকিয়া গেলেন; তাহার পর ভীত কণ্ঠে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি মানে?

সে কি মানে—তিনি মারা গেছেন আপনাকে কে বললে?

কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ, পরে উত্তর আসিল, আপনার কি রাত জেগে মাথা খারাপ হয়ে গেছে সিদুবাবু? তখন সময় নিয়েও একটা গোলমেলে কথা বললেন—একবার বললেন, আধ ঘণ্টাটাক হবে; শুধরে বললেন, এক্ষুনি। এখন আবার বলছেন, আপনি খবর দেন নি!

সময় নিয়ে তো কোন কথাই হয় নি আপনার সঙ্গে।

দাদা আসিয়া প্রবেশ করিলেন, বলিলেন, আমার সঙ্গে একটু হয়েছিল বইকি; তোমায় বললাম না? জিজ্ঞাসা করলেন, কখন সুমতিটা হ'ল, তোমার বাড়ি যাওয়ার সুমতিটা আর কি। আমি বললাম—

সিদ্ধেশ্বরবাবু মাউথপিসটা মুখ হইতে একটু সরাইয়া বলিলেন, আচ্ছা, কি কি কথা হয়েছিল, এক এক ক'রে বলুন তো, বোধ হয় সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

দাদা তাঁহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা যেমন যেমন হইয়াছিল, বিবৃত করিয়া যাইতে লাগিলেন।

ওদিকে টেবিলে রাখা মাউথপিসের ভিতর হইতে ঝলকে ঝলকে আগুনের মত বাহির হইতে লাগিল, কথা কন না কেন? জেরবার, শিগগির চ'লে আসুন, সর্ব্বনাশ—ড্যামেজ—সব জেলে—

সিদ্ধেশ্বরবাবু প্রায় পাগলের মতই হইয়া গিয়াছিলেন; সব কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিলেন, এর একটা কথাও যে আমার সম্বন্ধে নয় দাদা। উনি যে বরাবর রোগীর সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা হচ্ছে এই রকম বুঝে গেছেন। আগেই কেন ব'লে দিলেন না যে, আমি কথা কইছি না। গেল, সব গেল।

হন্তদন্ত হইয়া বাহিরের পানে চাহিলেন। দাদা পিছনে পিছনে যাইতে যাইতে প্রশ্ন করিলেন, তবে যে বললেন, সাজা রয়েছে, নিশ্চিন্দি হয়ে চড়িয়ে দেওয়া যাক?

সাজা যা রয়েছে, তা কল্কে নয়, ম্যাটার অর্থাৎ সেট করা টাইপ প্রেসে চড়িয়ে দেওয়ার কথা বলছিলেন। রসিকতা করতে গিয়েই যে সর্ব্বনাশটি ক'রে বসেছেন সব।

ফুটপাথে গিয়া ডাকিলেন, এই ট্যাক্সি, জলদি।

হঠাৎ একটা কথা মনে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে একটু আশা।

গুপ্টা সাহবের বাড়ির দিকে প্রায় ছুটিলেন এক রকম। সামনেই একজন ডাক্তারকে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, কত দেরি বুঝছেন?

কথাটা নিজের কানেই বেয়াড়া শুনাইল। ডাক্তার একবার মুখের দিকে চাহিয়া আশান্বিতভাবেই বলিলেন, না, একটা বেশ ফেবারেব্‌ল টার্ন নিয়েছে, এ যাত্রা বোধ হয় বেঁচে গেলেন।

সিদ্ধেশ্বরবাবু মুখের ভাবটা আর দেখিতে না দিয়া সরাসরি মোটরে গিয়া উঠিলেন। ঠিক এই সময় বগলে এক তাড়া কাগজ লইয়া একটা বাচ্চা হিন্দুস্থানী ফেরিওয়ালা চলতি ট্রাম হইতে টুপ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া ট্যাক্সির দরজার কাছে আসিয়া হাঁকিল, 'সত্যপ্রকাশ'—লিন বাবু, সব্বনেশে খবোর, স্যার শচীন্দর—

সিদ্ধেশ্বরবাবু ড্রাইভারকে ঠিকানা দিয়া বলিলেন, হাঁকাও, ফুল স্পীডে।

৪

সন্ধ্যা উতরাইয়া গিয়াছে। হলধরবাবু, সিদ্ধেশ্বরবাবু, দুই-একজন কেরানী আপিসে বিষণ্ণভাবে বসিয়া আছেন। ক্বচিৎ দুই-একটা কথাবার্ত্তা হইতেছে; সিদ্ধেশ্বরবাবুর হাতে একটি কলম আছে, মাঝে মাঝে ঝুঁকিয়া একখানি কাগজে কি লিখিতেছেন।

দিনটা যেন একটা দুরন্ত ঝড়ের মধ্য দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। সারা শহরে 'সত্যপ্রকাশে'র একার খবর আর ওদিকে ইংরেজী বাংলা সমস্ত কাগজের খবর, দুইটি বিরুদ্ধ খবরের মধ্যে দারুণ সংঘর্ষ বাধিয়া গিয়াছিল। আপিসের বাহিরে কান পাতা যায় না, ইতর-ভদ্র মিশ্রিত জনতার অবিমিশ্র গালাগালি। কান লইয়া ভিতরে বসিয়া থাকাও নিরাপদ নয়, টেলিফোনটা অবিচ্ছিন্নভাবে ক্রিং-ক্রিং করিয়া সমস্ত দিন যেন 'যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি' হাঁকিয়া গিয়াছে, যদি বা অনেকক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়া রিসিভারটা তুলিয়া লওয়া হইল তো কেবল উৎকট বিদ্রূপ, কদর্য্য হিন্দী ভাষা, কিংবা তীব্র হুমকির উদ্গার।

তাহা ছাড়া চিঠি যে কত আসিয়াছে, তাহার আর লেখাজোখা নাই। তাহার মধ্যে দুইখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য; একখানি স্বয়ং গুপ্টা সাহেবের বাড়ি হইতে, উকিলের সংযত ভাষায় প্রশ্ন, দেখানো হউক, কেন অন্তত পনরো হাজার টাকার ড্যামেজ স্যুট 'সত্যপ্রকাশে'র বিরুদ্ধে আনা হইবে না।

আর একখানির নীচে, গুপ্টা সাহেবকে দেখিতেছে, এমন কয়েকজন বিশিষ্ট ডাক্তারের নাম-সহি। তাহাতে অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ভাষায় জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, 'সত্যপ্রকাশে'র সোমবার ১৩ই অক্টোবর ১৯২৭-এর টাউন এডিশনে রোগশয্যাগত ইহলোকবাসী সার্ শচীন্দ্রনাথ গুপ্টার মৃত্যুবিবরণে পত্রসংখ্যা দুইয়ের ষষ্ঠ প্যারায়, "কে জানিত মহাযজ্ঞে যে হোমানল প্রজ্বলিত করা হইল, তাহা এই মহাপ্রাণের আহুতি না গ্রহণ করিয়া নির্ব্বাপিত হইবে না", আবার পত্রসংখ্যা তিনের দ্বিতীয় প্যারায়, "চিকিৎসা-সাগর মথিত হইল, কিন্তু হে বৈরাগী, তোমার অঞ্জলি সুধার পরিবর্ত্তে গরলেই পূর্ণ হইবে, তাহা কে জানিত?"—এইরূপ যে লেখা হইয়াছে তাহার প্রকৃত অর্থ কি? এই দুই বাক্য দ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী

চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদিগের পেশা এবং আত্মসম্মানে যে গুরুতর আঘাত করা হয় নাই, প্রয়োজন হইলে উক্ত 'সত্যপ্রকাশে'র এডিটার এবং প্রিণ্টার বিচারালয়ে এরূপ সপ্রমাণ করিতে রাজি আছেন কি না, ইত্যাদি।

এই দুইখানা চিঠি লইয়া গুপ্টা সাহেবের বাড়িতে গিয়া ধন্না দেওয়া, ডাক্তারদের বাড়ি বাড়ি গিয়া হাজিরা দেওয়া, এই করিয়া সমস্ত দিনটা পালা করিয়া এডিটার, সাব-এডিটার আর প্রিণ্টারের কাটিয়াছে। কাগজ বিক্রয়ের লাভ ট্যাক্সি-ভাড়ায় এক রকম নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দিন টানা-পোড়েনের ফল এক জায়গায় একটু পাওয়া গিয়াছে, গুপ্টা সাহেবের অবস্থার একটু পরিবর্ত্তনে তাঁহাদের মনটা অনেকটা প্রসন্ন থাকার দরুনই এইটুকু সম্ভব হইয়াছে। তাঁহারা রোগীর কল্যাণ-কামনায় ক্ষমা করিতে রাজি আছেন, যদি অদ্যকার কাগজে সুদীর্ঘ অ্যাপলজি চাওয়া হয় এবং অঙ্গীকার করা হয় যে, 'সত্যপ্রকাশ' কখনও কোনও ব্যক্তির মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশ করিবে না, অন্তত ঘটনার পরে এক মাস না যাওয়া পর্য্যন্ত, ইচ্ছা হয় ইহার পরে করিতে পারে।

ডাক্তাররা এখনও রাগিয়া আছে।

হলধরবাবু মনের ভারটা আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না; অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, তাও যদি আজকের সকাল কিংবা দুপুর নাগাদ ম'রে যেত তো অনেকটা সামলে নেওয়া যেত।

সিদ্ধেশ্বরবাবু কাগজ হইতে কলমটা তুলিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, মরবে, ওর ব'য়ে গেছে। ডাক্তার গৌরহরি বসাক বলেছে, যদি এ যাত্রা না বাঁচে তো ডিগ্রী ছেড়ে দোব।

হলধরবাবু ঝাঁঝিয়া উঠিলেন। বলিলেন, আরে, ছেড়ে দাও ওটার কথা; ওই না বলেছিল, পাঁচটার পরে না মরলে, ওর চল্লিশ বছরের

চিকিৎসাই বৃথা? ওরাই তো এই কাণ্ডটা বাধালে, যত সব বোগাস, এক্তিয়ার থাকলে আমিই তো ডিগ্রী কেড়ে নিতাম আজই।

সিদ্ধেশ্বরবাবু আরও দুই-তিন লাইন লিখিয়া লেখাটি সমাপ্ত করিলেন। কাগজটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, এই হ'ল, শুনুন—

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গতকল্য 'সত্যপ্রকাশে' সার্ শচীন্দ্রনাথ গুপ্টার যে মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ ভুল।

হলধরবাবু একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, কোথায় যেন একটু খটকা লাগিতেছে, তাহার পর বলিলেন, বেশ তো হয়েছে। হ্যাঁ, তারপর?

এ সংসারে দুর্নিরীক্ষ্য একটি জীবাণুর দ্বারাও মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি হয়; সুতরাং কেমন করিয়া একটি অতি তুচ্ছ কারণে এই ভ্রমাত্মক সংবাদটি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, সে বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা না করিলেও, আশা করি, পাঠকবর্গ মার্জ্জনা করিবেন। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মার্জ্জনার প্রয়োজন সার্ এস. এন. গুপ্টার সেই আত্মীয়-স্বজনের নিকট, যাঁহাদের এই সংবাদটি সকলের চেয়ে রূঢ়ভাবে আঘাত করিয়াছে। সান্ত্বনার কথা এই যে, তাঁহারা বরাবরই খবরটি ভুল জানিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিয়াছিলেন।

কল্য প্রত্যূষ হইতে রোগ আরোগ্যের দিকে চলিয়াছে এবং আমাদের বিশেষ সংবাদদাতার মারফৎ জানা গেল যে, সমস্ত দিন অপ্রতিহতভাবে উপশান্ত হইয়া আসিয়াছে।

কেরানী বামাচরণবাবু সিদ্ধেশ্বরবাবুর পানে মুখ তুলিয়া একটু চাহিলেন।

সিদ্ধেশ্বরবাবু একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, বিশেষ সংবাদদাতা ওদিকে পা বাড়ালে হয় একবার! তার ঠ্যাঙের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা ক'রে ছাড়বে।

সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

সিদ্ধেশ্বরবাবু আবার পড়িতে লাগিলেন—

চিকিৎসার জন্য যেরূপ ধন্বন্তরীদের সমাবেশ হইয়াছে, তাহাতে—

হলধরবাবু শঙ্কিতভাবে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, না না, ও ধন্বন্তরী-ফন্বন্তরী কাটুন, ভাববে, ঠাট্টা করছে ; ওই নিয়ে আবার এক লম্বা চিঠি এসে হাজির হবে।

সিদ্ধেশ্বরবাবু কথাটা কাটিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি লেখা যায়? বিচক্ষণ চিকিৎসক ?

হলধরবাবু মুখটা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, দি—ন লিখে। বিচক্ষণ না হাতী।

তাহাই লেখা হইল। পড়া চলিল—

চিকিৎসার জন্য যেরূপ বিচক্ষণ চিকিৎসকদিগের সমাবেশ হইয়াছে, তাহাতে আমরা বরাবরই এইরূপ আশু উপশমের আশা করিয়া আসিতেছি এবং পাঠক-বর্গকেও সেইরূপ ভরসা দিয়া আসিতেছি। ভগবান আমাদের আশা এবং সেই আশার দ্বারা প্রণোদিত ভবিষ্যদ্বাণী যে সফল করিলেন, ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য। চিকিৎসকেরা সমবেতকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন যে, অদ্য দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত রোগী সম্পূর্ণরূপে সর্ব্ববিধ বিপদের গণ্ডির বাহিরে যাইয়া পড়িবেন।

বামাচরণবাবু বলিলেন, মানে ?

মানে ওই যাকে বলে ডেঞ্জার জোন পেরিয়ে যাওয়া আর কি।

ও। আবার উল্টো মানেও হতে পারে কিনা, তাই বলছিলাম।

হলধরবাবু বলিলেন, না, যখন বেঁচেই গেল, কেউ অত টেনে মানে করতে যাবে না। পড়ুন।

সুতরাং এ বিষয়ে আর চিন্তার কিছুই নাই। কারণ তাঁহাদের এই বাণীকে আমরা বেদবাণীর মতই অভ্রান্ত এবং অমোঘ বলিয়া মনে করি।

আজ এই মহাপুরুষকে অকালমৃত্যুর হাত হইতে ফিরিয়া পাওয়ায় আমরা যে স্বর্গীয় আনন্দ উপলব্ধি করিতেছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি, আমাদের সে ক্ষমতা নাই। যিনি আমাদের এই হতভাগ্য দেশের প্রতি এই চরম কৃপা প্রকাশ করিলেন, সেই পরম কারুণিক ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা যে, তিনি সার্ শচীন্দ্রনাথ গুপ্টাকে এই নবজীবনের সহিত দীর্ঘ পরমায়ু দান করিয়া তাঁহার কল্যাণ-ব্রতকে আরও সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলুন।

বামাচরণবাবু বলিলেন, বেশ হয়েছে। ডাক্তারগুলোকেও তো খুব আকাশে তুলে দেওয়া হ'ল।

হলধরবাবু, হ'ল না? এখন সেখান থেকে ওদের এক-একটিকে ধ'রে কেউ আছাড় দিতে পারে তো গায়ের ঝাল মেটে।

৫

কাগজ বাহির হইল।

আজও অসম্ভব কাটতি। লোকে সঠিক খবরের চেয়ে কৌতুকেরই বেশি প্রিয়; 'সত্যপ্রকাশ' আজ আবার কি লেখে দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া ছিল। আজও খুব সকাল সকাল কাগজ বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতি অল্প সময়েই, অন্য কোন কাগজ বাহির হইবার পূর্ব্বেই 'সত্যপ্রকাশ' সার্ শচীনের "নবজীবনের" সংবাদ ও "পরমায়ুর" প্রার্থনা লইয়া শহরে বেশ ছড়াইয়া পড়িল।

তাহার পর যথাসময়ে দুই-একখানি করিয়া ইংরেজী দৈনিক বাহির হইল,। "স্টপ প্রেস" স্তম্ভে সংক্ষিপ্তভাবে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের খবরে লেখা আছে—

মঙ্গলবার ১৪ই অক্টোবর

অদ্য সকাল ছয় ঘটিকার সময় প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ও দেশসেবক সার্ এস. এন. গুপ্টা, বার-অ্যাট-ল-র নিউমোনিয়া রোগে মৃত্যু হইয়াছে। সার্ শচীন্দ্র আট দিন হইল সামান্যভাবে জ্বরাক্রান্ত হন; ক্রমে জ্বর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তিন দিন হইল নিউমোনিয়ায় পরিণত হয়। আক্রমণ এইরূপ সাংঘাতিক হয় যে, চিকিৎসকগণ বরাবরই আশাশূন্য ছিলেন। অতি অল্প-কালের মধ্যে ডবল নিউমোনিয়ায় দাঁড়ায় এবং মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছিল।

সমস্ত দিন মহানগরীর মুখখানি বিষাদে মলিন হইয়া রহিল। 'সত্যপ্রকাশ' কিন্তু তাহারই কোথায় বরাবর একটু কৌতুকের হাসি ফুটাইয়া রাখিল, বাদল মেঘের কোলে অস্পষ্ট রামধনুর মত।

* * *

দুপুর হইয়া গিয়াছে। অস্নাত এবং অভুক্ত হলধরবাবু, সিদ্ধেশ্বরবাবু, বামাচরণবাবু এবং কয়েকজন কম্পোজিটার বিষণ্ণভাবে আপিসে বসিয়া আছেন। কদাচিৎ দুই-একটা কথাবার্ত্তা হইতেছে।

সিদ্ধেশ্বরবাবু বলিলেন, না হয় একটা অতিরিক্ত সংখ্যা তাড়াতাড়ি বের ক'রে দেওয়া যাক না। পাঁচটা পর্য্যন্ত তো বেশই ছিল; হঠাৎ এ রকম ডিগবাজি খেয়ে বসবে কে জানত?

হলধরবাবু বিরক্তভাবে বলিলেন, হ্যাঁ, ব'সে ব'সে ওই করি আর কি! লোকটা সেই গেল, তবে আমাদের সঙ্গে এ রকম দুর্ব্ব্যবহার ক'রে গেল কেন বল দিকিন?

জালিয়াত

১

হায়, পল্লীর দুলালী, সে আজ কলিকাতার বধূ। বোধ হয় ভাবে—

হায় রে রাজধানী পাষাণ-কায়া।

বিরাট মুঠিতলে চাপিতে দৃঢ়বলে,

ব্যাকুল বালিকারে নাহিকো মায়া।

প্রাণ তাহার কাঁদে—

কোথা সে খোলা মাঠ উদার পথঘাট,

পাখীর গান কই, বনের ছায়া।

কিন্তু ওই পর্য্যন্ত, ইহার বেশি আর কবিবরের মানসী-প্রতিমার সঙ্গে এই মেয়েটির কিছু মিলে না। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, প্রত্যেক ব্যাপারেই ইহার নিজস্ব মতামত খুব দৃঢ় এবং স্পষ্ট। যাহা ভাল লাগে, তাহা চাইই; যাহা লাগে না, তাহা চাই না। সিঁদুরে আমের লোভে যেদিন গাছের মগডালে উঠিয়া জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াছিল, সেদিনও ছিল এই কথা, আর আজ, ভাল না লাগার দরুন, কলিকাতা ছাড়া চাই বলিয়া যেসব ফন্দি-ফিকির মনে মনে আঁটিতেছে, তাহারও মূলে সেই একই কথা।

মেয়েটির নাম চপলা। নাম যখন রাখা হইয়াছিল, সে সময় সকলের দৃষ্টি ছিল ওর মায়ের কাঁচা সোনার মত রঙটির দিকে, এবং কাহারও আর সন্দেহ ছিল না যে, এমন মায়ের মেয়ের দেহলতাটির মধ্যে একদিন বিদ্যুতের চপলদীপ্তি শান্তশ্রীতে ফুটিয়া উঠিবে। মেয়েটি যেন তাহার স্বভাবসিদ্ধ অবাধ্যতার বশেই সবাইকে এই দিক দিয়া নিরাশ করিয়া দিল। কিন্তু তবু নামটা রহিল সার্থক। আকাশের বিদ্যুৎ কেমন

করিয়া সত্যই যেন ওর শ্যাম দেহটুকুর মধ্যে আটক পড়িয়া গিয়াছে; তাই ওর মিহি ভ্রূ দুইটি কথায় কথায় বিদ্যুৎস্ফুরণের মত অত কুঞ্চিত হইয়া উঠে, কালো চোখের তারা অত চঞ্চল, এবং ঠোঁটের কোণে আচমকা হাসি ফুটিয়া একটু রেশ না রাখিয়াই অমন হঠাৎ মিলাইয়া যায়।

কনে দেখানোর সময় বাপ পরিচয় দিয়াছিলেন, বড় শান্ত লক্ষ্মী মেয়ে আমার—এ কিছু বড়াই ক'রে বলছি না। বাড়ির বাইরে পা দিতে জানে না, কলকাতায় বিয়ে হবার জন্যে যেন তোয়ের হয়ে জন্মেছে।

আগাগোড়া বানানো কথা। ওর বাড়ি ছিল সদর-রাস্তা, বন-বাদাড়, দীঘির ধার। এখন সেখান হইতে তাহারা সর্ব্বদাই ওকে যেন কান্নার সুরে ডাকিতে থাকে।

আদুরে দুষ্টু মেয়ের যত অত্যাচারের দাগ স্নেহের পরতে পরতে আঁকা, আসন্ন বিচ্ছেদের সময় সেগুলা রাঙাইয়া উঠে। তবুও মেয়ের বাপ, তাঁহাকে বলিতেই হয়, বুঝেছেন কিনা, আমার মার মতন শান্ত মেয়ে দুটি পাবেন না; এ কিছু নিজের মেয়ে ব'লেই যে বলছি, তা নয়।

প্রবঞ্চনা ধরা পড়িতে অবশ্য দেরি লাগে নাই। শ্বশুর আপিস হইতে ফিরিয়া বাড়ির চৌকাঠ ডিঙাইয়া সঙ্গে সঙ্গেই ডাকেন, কই গো, আমার শান্তশিষ্ট মা-টি কোথায় গেলে?

চপলা যেমন ভাবে যেখানেই থাকুক, লঘুগতিতে আসিয়া হাজির হয়। লঘুগতি কথাটা মোলায়েমভাবেই বলা গেল, আসলে শ্বশুরের এই ডাকটিতে কলিকাতার এই অষ্টাবক্র বাড়িখানি হঠাৎ চপলার পক্ষে ঋজু সরল হইয়া যায়, কঠিন বিলাতী মাটির মেঝে বেলপুকুরের দেশী মাটির মত পায়ের নীচে পরম স্নিগ্ধ মিঠা হইয়া উঠে। সে এক রকম গোটাকতক লাফেই শ্বশুরের নিকট আসিয়া পৌছায়, আবদারের ভৎর্সনায় চক্ষের তারকা নাচিতে থাকে, চাবির গোছাসুদ্ধ আঁচলটা মাটি

হইতে তুলিতে তুলিতে বলে, না বাবা, আজ আপনি বড্ড দেরি করেছেন, তা ব'লে দিচ্ছি, হ্যাঁ।

দেরি যে রোজ হয়ই এমন নয়; তবে এই মিলনটুকুর মূল্য অনেক; তাই উৎকণ্ঠার বশে পুত্রবধূর রোজই মনে হয়, বড় দেরি হইয়া গিয়াছে। তাহারই রোজ অনুযোগ।

শ্বশুর রোয়াকে নির্দ্দিষ্ট ঈজি-চেয়ারটিতে দেহখানা এলাইয়া দেন। বধূ পাখা আনিয়া হাওয়া করে, পায়ের কাছে বসিয়া জুতার ফিতা খুলিয়া পা দুইখানি খড়মের উপর বসাইয়া দেয়, চাদর খুলিয়া, জামা নামাইয়া ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া রাখে।

ধীরে ধীরে এই সব চলে আর গল্প হয়, ঠিক হ'ল বাবা? বড্ড যেন দেরি হয়ে যাচ্ছে; আমার আর মোটেই ভাল লাগছে না আপনার এই কলকাতা, হ্যাঁ।

আর দেরি নেই মা, একটা বাড়ি ঠিক হয়েছে, খালি হ'লেই আমরা উঠে যাব।

শ্বশুর-বউয়ের পরামর্শ পাকা হইয়া গিয়াছে, কলিকাতায় আর থাকা হইবে না। কলিকাতার বাহিরে বেশ পাড়াগাঁ দেখিয়া বাড়ি দেখা হইতেছে, ঠিক হইলেই সব উঠিয়া যাইবে।

বধূকে শ্বশুর কোলের কাছে টানিয়া লন, মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলান, করতল হইতে স্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদ ক্ষরিতে থাকে। বাৎসল্যের প্রবঞ্চনায় মুখে শান্ত হাসি ফুটে, ভাবেন, এই দীর্ঘাকৃত আশার মধ্য দিয়া পাড়াগাঁয়ের স্বপ্ন কাটিবে, ক্রমে এই বাড়িরই ইটকাঠের সঙ্গে মনটা মায়ায় মায়ায় গাঁথিয়া যাইবে।

স্বপ্ন কিন্তু কাটে না, বরং মনটা এদিকে বিরূপ হইয়া সেই স্বপ্নকেই মায়ার পাকে পাকে জড়াইয়া ধরে।

অনামধেয় একটা জায়গা; কিন্তু কেমন করিয়া যেন মনের পটে তাহার একটা স্পষ্ট ছবি আঁকিয়া গিয়াছে। বেলপুকুরের সঙ্গে অনেকটা মিলে, ভিজে ভিজে কালচে মাটি, এখানে ওখানে গাছপালার ঘন সবুজ দিয়া ঢাকা, উপরের আকাশের নীল আস্তরণখানি উবুড় হইয়া পড়িয়াছে, পাশাপাশি দুইটি কোঠাঘর, সামনে পাকা রোয়াক, বিকালের পড়ন্ত রোদটি সেখানে জলজল করিতে থাকে। ওদিক পানে রান্নাঘর, সকাল-সন্ধ্যায় তাহার গোলপাতার ছাউনি ফুঁড়িয়া ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠে। পাকা ঘরের পাশ দিয়া রাস্তা। সেটা সদর-দুয়ারের চৌকাঠ ডিঙাইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, ডাহিনে জামরুলগাছের নীচে দিয়া। বাঁয়ে কাহাদের পুকুর, তাহার পুরানো ঘাটের শেষ রানায় কাহাদের ঘোমটা-টানা বউ বাসন মাজে, তাহার শাড়ির রাঙা পাড় আর ছোট রাঙা ঠোঁটের মাঝখানে নোলকটি দুলদুল করে। কে সমবয়সী আসিল, বউ হাতের উল্টা দিক দিয়া ঘোমটা উঁচু করিয়া হাসিয়া কথা কয়।

আর কিছু দূরে লতা-জড়ানো পুরানো আমগাছের দুই পাশ দিয়া রাস্তাটা ফিরিয়া দুই দিক দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, আমগাছের শিকড়ের কাছে ইট, নুড়ি, খোলামকুচি, রাংচিত্রের পাতার ছড়াছড়ি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট পায়ের দাগ। মনটি এইখানে আটকাইয়া যায়, যেন নিজেকেই দেখা যায়, গাছের তলায় লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

অন্যমনস্কতা হইতে হঠাৎ সজাগ হইয়া বধূ হাসিয়া বলে, তা ব'লে আপনি যেন ভাববেন না বাবা, আমি কচি মেয়েদের মত পাড়ায় পাড়ায় খেলাঘর র'চে কাটাব—সে ভয় আপনার একটুও নেই ব'লে দিচ্ছি। কিন্তু দেরি করলে হবে না, হ্যাঁ।

মন ভুলাইবার দিকে স্বামীর চেষ্টারও ত্রুটি নাই। ছোট বোন ক্ষান্তমণির উপর হঠাৎ অত্যধিক স্নেহপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছে। বলে, ক্ষেন্তী, চিড়িয়াখানায় একটা নতুন জন্তু এসেছে, যাবি নাকি দেখতে ?

ক্ষান্তমণি উৎসাহের সহিত বলে, হ্যাঁ, যাব। তারপর হঠাৎ একটু সঙ্কুচিত হইয়া মিনতি করে, একটা কথা রাখবে দাদা ?

কি কথা আবার ?

বউদিকেও—। আর শেষ করিতে সাহস করে না।

হ্যাঁঃ, অত লোকের ঝক্কি বওয়া—সে আমার কুষ্ঠিতে লেখে নি।

এই করিয়া চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হইয়া গিয়াছে। রাত্রে স্বামী উৎসাহভরে বলে, এইবার কি দেখবে বল, ডালহৌসি স্কোয়ার, হাওড়া স্টেশন ?

বধূ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলে, কিচ্ছু না।—বলিয়া ফিরিয়া শোয়।

অনেক সাধাসাধি চলে। কলকাতায় এত দেখবার জিনিস রয়েছে, দেশবিদেশ থেকে লোক আসছে দেখতে—গড়ের মাঠ, গঙ্গার জাহাজ, কত বড় বড় বাড়ি, ওপরে চাইতে গেলে ঘাড় উল্টে পড়ে—

পড়ুক গিয়ে ঘাড় উল্টে যার সাধ আছে, আমার কলকাতার কিচ্ছু ভাল লাগে না; আমায় বাড়ি দিয়ে এস।

কলকাতার কিছুই ভাল লাগে না ? আমরাও তো কলকাতার—আমিও তো—

ঝাঁঝিয়া উত্তর হয়, তোমাদের কাউকেও ভাল লাগে না; যারা কলকাতা ভালবাসে, তাদের দুচক্ষে দেখতে পারি না।

দারুণ নিরাশার কথা।

পরের দিন ভগ্নীস্নেহে আবার জোয়ার আসে। প্রশ্ন হয়, কই রে ক্ষেন্তী, শিবপুরে রামরাজাতলার মেলা ফুরিয়ে এল, একদিনও তো গেলি নি ? দিব্যি পাড়াগেঁয়ে পাড়াগেঁয়ে জায়গাটি, আমার তো বড্ড ভাল লাগে।

আজ তিন বৎসর দাদার খোশামোদ করিয়া ফল হয় নাই; বলিলেই

"অজ পাড়াগাঁ, এঁদো ডোবা' বলিয়া নাক সিঁটকাইয়াছে। আজ বিধি অত অনুকূল!

ক্ষান্তমণি হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া হাজির হয়। হ্যাঁ দাদা, যাব। আর একটি কথা দাদা শুনবে? বউদিদিকেও নিয়ে চল দাদা, আমার দিব্যি। আহা, বেচারী গো, পাড়াগাঁয়ের কথা বলতে বলতে আত্মহারা হয়ে ওঠে।

দাদা রাগিয়া বলে, ওঃ—ই, আপনি পায় না, আবার শঙ্করাকে ডাকে! ওইজন্যে কোথাও তোকে নিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় না।

২

রামরাজা কি বাতাই-চণ্ডীতলা হইতে ফিরিয়া ফল হয় উল্টা। পিঁজরার পাখি একবার ছাড়া পাইয়া আবার পিঁজরায় বন্ধ হইলে যেমন অতিষ্ঠ হইয়া উঠে, মেয়েটির অবস্থা হয় সেই রকম। প্রাণটা আইঢাই করে। প্রতি মুহূর্ত্তে বেলপুকুরের কোন না কোন একটা ছিন্ন দৃশ্য চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে; কথায় কথায় ভুল হয়, ঝিকে ডাকিতে বাপের বাড়ির দাসী পদীপিসীর নাম মুখে আসিয়া পড়ে; ননদকে ডাকিতে বাহির হইয়া পড়ে, সই!

ননদ দুই-একবার ভুলটা ভুলের হিসাবেই ধরে, শেষে 'এই যে আমি সই' বলিয়া হাসিতে হাসিতে সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। বলে, মরণ! বলি, তোমার হয়েছে কি আজ? দাদা এলেই বলব, তোমার বুনো হরিণকে বনে ছেড়ে দিয়ে এস।

বন্য মৃগ নিজেই সে ব্যবস্থায় তৎপর হইয়া উঠে। কলিকাতায় থাকা চলিবে না, কোনমতেই নয়।

শ্বশুরকে বলে, আমি বলছিলাম বাবা—

হ্যাঁ মা, বল।

এই বলছিলাম, মাস তিনেক পরেই তো আপনি কাজ নিয়ে ক মাসের জন্যে ঢাকা চ'লে যাবেন? এর মধ্যে আমাদের আর নতুন বাসা ক'রে কাজ নেই। আপনারও অসুবিধে বাবা, আর বাসা-বদলির একটা হিড়িকও তো কম নয়, খরচও এতগুলি, এই মাগ্‌গি-গণ্ডার দিন—

শ্বশুর নিজের চিকিৎসার এ রকম আশু সাফল্যে উল্লসিত হইয়া উঠেন, শুধু পাড়াগাঁয়ের নেশা কাটিয়া যাওয়া নয়, সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণী-পনার গাম্ভীর্য্য আসিয়া পড়া একেবারে! বধূর মাথাটি নিজের বুকে চাপিয়া বলেন, ঠিকই তো মা। দেখ তো, কথাটা আমার মাথায়ই ঢোকে নি। আর বুড়ো হতে চললাম, এইবার মা-ই আমাদের বুদ্ধি দেবে কিনা! আমি তা হ'লে ওদের খোঁজাখুঁজি করতে বারণ ক'রে দোব। ঢাকা থেকে ফিরে আসি, তখন বরং একটা পাকা রকম ব্যবস্থা করা যাবে, কি বল?

হ্যাঁ।—বলিয়া শ্বশুরের বুকে মাথাটি আরও গুঁজিয়া দেয়। ক্ষণেকের জন্য বোধ হয় একটু দ্বিধা আসে, সেটুকু কাটাইয়া ধীরে ধীরে আরম্ভ করে, তাই বলছিলাম বাবা—

হ্যাঁ মা, বল বল।

এই বলছিলাম, ততদিন না হয় আমাকে একবার বেলপুকুরেই রেখে আসুন না।

রোগটা মজ্জাগত; এমন ভাবে নিরাশ হইয়া চিকিৎসক হাসিবেন, কি কাঁদিবেন, স্থির করিতে পারেন না। চিকিৎসার নূতন নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিতে হয়। এই করিয়া দিন চলে। শ্বশুরের পাঠানোর যে সে রকম গা নাই—এ কথাটা ক্রমেই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠে।

শাশুড়ীর কাছে চালাকি করিতে সাহস করে না; কারণ শাশুড়ী

বেটাছেলে নয়, এবং সেইজন্য, তাহার মতে, বোকা নয়। সোজাই কথাটা পাড়ে—বাপ, মা, ভাই, ছোট বোনটি এদের অনেকদিন দেখে নাই, তাই—

শাশুড়ী চোখ কপালে তুলিয়া বলেন, ওমা, অমন কথা ব'লো না বউমা। এই তো মোটে কটা মাস এসেছ, আমি সেই মোটে ন বছরের মেয়েটি শ্বশুরঘর করতে এলাম, আর ঝাড়া তিনটি বছর কাটিয়ে—

চপলারও আশ্চর্য্যের সীমা থাকে না। বলে, এই কলকাতায় মা?

পোড়া কপাল! কলকাতা কোথায়? তা হ'লে তো বাঁচতাম। শ্বশুর থাকতেন ডাহা পাড়াগাঁয়—মাঝেরপাড়া। নাইবে? সেই আধ কোশ ভেঙে ইচ্ছেমতী। খাবার জল চাই? সেই আধ কোশ ভেঙে ইচ্ছেমতী। গা ধোবে? সেই আধ কোশ—

বধূ আর প্রাণ ধরিয়া শুনিতে পারে না। ওইঃ, বেরালটা বুঝি কি ফেললে গো!—বলিয়া হয়তো হঠাৎ সে স্থান ত্যাগ করে।

স্বামীর উপর উপদ্রব হয়। সে বেচারী জর্জ্জরিত হইয়া অভিমান করিয়া বলে, বেশ তো, বাবাকে মাকে রাজি করাও; আমার রেখে আসতে কি? আমায় যখন ভালই বাস না, মিছি মিছি এখানে থেকে কষ্ট পাও কেন?

অবাধে মিথ্যা বলে, একেবারে নির্জ্জলা মিথ্যা, বাবা মা তো খুবই রাজি। বাবা বলেন, আমার তো ছুটি নেই; অজিতকে বললেই বলবে, পড়ার ক্ষতি হবে; না হয়, আসুক না রেখে। মা বলেন, আমার আর কি অমত মা, আহা, এতদিন এসেছ, তবে আজকাল হয়েছে ছেলের মত আগে। তা তুমি ঠিক এই রকম ক'রে মাকে বল তো, বল, মা, অত ঘ্যানঘ্যান করছে যখন, রেখেই আসি নয় দিন কতকের জন্যে; বাবাকে ব'লে দিও, আমার কলেজের ক্ষতি হবে না।

স্বামী অতটা বোকা নয়, এ ফন্দি খাটে না।

কয়েকদিন আবার মুখ অন্ধকার হইয়া থাকে; কথাবার্ত্তা বন্ধ। যত সব বেয়াড়া আবদার ভাবিয়া স্বামীও কয়েকদিন বেপরোয়া ভাবটা জাগাইয়া রাখে, তাহার পর তাহাকেই মাথা নোয়াইতে হয়। বলে, যা হবার নয়, তাই ধ'রে ব'সে থাকলে চলবে কেন? বরং চল, দক্ষিণেশ্বর দেখিয়ে নিয়ে আসি, পাড়াগাঁকে পাড়াগাঁও, কলকাতা থেকে অনেক দূরও; বালি হয়ে গেলে বরং নৌকোও চড়া হবে। রাজি? পরামর্শ আঁটা হয়; দুপুরে ক্ষান্ত যখন স্কুলে থাকিবে, চপলা গিয়া শাশুড়ীর আদেশ চাহিয়া লইবে মিউজিয়াম দেখিবার নাম করিয়া।

বধূ জিজ্ঞাসা করে, তোমারও তো কলেজ আছে?

আমার ঘণ্টাখানেক মাথা ধরবে, তারপর ক্ষেন্তী চ'লে গেলে ভাল হয়ে যাবে।

কথাটা বুঝিতে একটু দেরি হয়, চপলা স্বামীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, শুধু ভ্রূ-জোড়াটি অল্প অল্প স্ফুরিত হইতে থাকে। তাহার পর হঠাৎ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠে, বলে, ও, বুঝেছি, বাব্বাঃ, তোমার দুষ্টু বুদ্ধি কম নয় তো!

প্রশস্ত শান্ত গঙ্গায় নৌকা চড়িয়াই চপলার মনটা প্রসারিত হইয়া পড়ে। ও পারে প্রকাণ্ড ঘাটের নীচে গিয়া নৌকা লাগে। নামিয়াই একহাঁটু করিয়া কাদা, এত বড় বিলাসিতা অনেকদিন তাহার ভাগ্যে জুটে নাই। পা টানিয়া টানিয়া চলিতে স্বামীর হাতটা চাপিয়া ধরে। বলে, উঃ, বড্ড মজা, না?

সিঁড়ি বাহিয়া সুবিস্তীর্ণ চত্বর, যে দিকটা ইচ্ছা হনহন করিয়া অনেকটা চলিয়া যায়, পায় পায় কতদিনের শৃঙ্খল যেন খসিয়া পড়িতেছে। মন্দিরে উঠে, সুগঠিত সৌম্য মূর্ত্তির সামনে মাথা নোয়াইয়া পড়িয়া থাকে

অনেকক্ষণ; কিছুই প্রার্থনা করে না, পড়িয়া থাকার মুক্ত অবসর, তাই পড়িয়া থাকে। গঙ্গার ধারে ধারে পরিষ্কার চওড়া রাস্তা, ঘন আমগাছের মস্ত বাগান, পাতার গাঢ় সবুজে সবুজে যেন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, পিছনে আয়ত পুষ্করিণী, বেলপুকুরের দীঘির মত, একটু ছোট এই যা। ক্রমাগত ঘোরে, একটি মুক্ত বেগচঞ্চল প্রাণ প্রতি মুহূর্ত্তে দেহতটে আসিয়া উচ্ছলিত হইয়া পড়ে—চপল অঙ্গবিক্ষেপে, প্রগল্‌ভ হাসিতে, কথার অসংযত স্বরে; মাঝে মাঝে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া বলিয়া উঠে, কই গো! ওমা, এখনও ওখানে! পুরুষের পা না?

পুকুরের ঘাটে আসিয়া বসিল। পা দুলাইতে দুলাইতে পাশের লতাগুল্মের সঙ্গে স্বামীকে পরিচিত করিয়া দিতে লাগিল, ওটা ঘেঁটু, ঘেঁটুফুল মহাদেব খুব ভালবাসেন, সত্যিকারের মহাদেব নয়, খেলাঘরের মহাদেব। আচ্ছা, এর মধ্যে অমূলতার গাছ কোথায় দেখাও দিকিন, কত বুদ্ধিমান দেখি! পারলে না তো? ওই দেখ, কলকে ফুলের গাছটার মাথার ওপর ওই হলদে হলদে, ভয়ঙ্কর বিষ মশাই। একটু যদি গেল পেটে তো বাড়তে বাড়তে বাড়তে—ওগো, কুচকম্বলের চারা—নিশ্চয়ই এক্কেবারে। নিয়ে আসি তুলে।

উৎসাহের সঙ্গে নামিয়া ক্ষিপ্রগতিতে পুকুরপাড়ের জঙ্গলের দিকে চলিল। ঝিরঝিরে পাতা ছোট চারাগাছটি, হাওয়ায় নধর ডগাটি একটু একটু দুলিতেছে। কাছে গেল তুলিবার জন্য, ঝুঁকিয়া কি ভাবিয়া থামিয়া গেল, তাহার পর ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া আবার শানের বেঞ্চিটার উপর বসিয়া পড়িল।

স্বামী হাসিয়া বলিল, কি হ'ল আবার? খেয়ালী মেয়ে!

নাঃ, থাক্; কলকাতায় সেই মাটির টবে তো? আমার মতন দুর্দ্দশা হবে বেচারীর।

দুইজনেই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে চপলা স্বামীর হাতটা নিজের কোলে লইয়া বলিল, এক কাজ করলে হয় না? বলছিলাম—বলছিলাম, আমায় এই দিক থেকেই বেলপুকুরে রেখে আসবে?

অজিত হাসিয়া দুষ্টামির সহিত বলিল, বেশ তো, টাকা?

আমার দু হাতের দুগাছা চুড়ি দিচ্ছি।

স্বামী কি ভাবিয়া আবার একটু চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর বলিল, সে মন্দ কথা নয়; মাকে কিন্তু কি বলব?

সে আমি ভেবে রেখেছি, বলবে, নাইতে গিয়ে ডুবে গিয়েছে।

আবার একটু চুপচাপ। চপলা তাগাদা দিল, কই, কি বলছ?

স্বামীর হঠাৎ একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল; কিন্তু মনের ভাবটা গোপন করিয়া হাসিয়া বেশ উৎসাহের সঙ্গে বলিল, উঃ, খাসা হয়; কিন্তু তারপর?

তারপর অনেক দূর গিয়ে ভেসে উঠব, আমায় একজন মাঝি তুলবে, একটু চোখ খুলে বেলপুকুরের নাম করব—নভেলে যেমন হয় গো—

নভেলে মিউজিয়ামের কোঠাবাড়িতে কেউ ডুবে মরে না। চল, ওঠ, বেলা প'ড়ে এল।—বলিয়া স্বামী উঠিয়া পড়িল।

শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, সবাইকেই বোঝা যায়। চপলা মনে মনে বলে, খুব চালাক সব, আচ্ছা, আমিও কম সেয়ানা নয়, দেখি।

বাবার কাছে গোপনে পত্র যায়—কাঁদুনিতে, মিথ্যা কথায় ভরা—এরা সব মারে-ধরে, চাবি দিয়ে রাখে—দুচক্ষের বিষ হয়ে আছি। কখনও কখনও এমনও থাকে—পাড়ার মেয়েদের কাছে আমার আর মুখ দেখাবার জো নেই; যেই দেখে, বলে, ওমা, কেমন পাষাণ বাপ মা গো! এতদিন হ'ল মেয়েকে পাঠিয়েছে, একবার নিয়ে যাবার নাম করে না! ওই দুধের মেয়ে—

চিঠি যা আসে, তাহাতে এ সবের উত্তর হিসাবে কিছুই থাকে না; একরাশ উপদেশ থাকে মাত্র। চপলা মনে মনে বলে, চপীর ভাগ্যে সব সমান; আচ্ছা, বেশ।

৩

গ্রীষ্মের দুপুরবেলা। শ্বশুর আপিসে, স্বামী কলেজে, ননদ স্কুলে। চপলা শাশুড়ী আর পিসশাশুড়ীকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতেছিল, তাঁহারা একে একে ঘুমাইয়া পড়িলেন। একটু পরে বই বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিল। রামায়ণে তিনজনে আসিয়া পঞ্চবটী বনে বাসা বাঁধিয়াছেন। ঠিক এই জায়গাটিতে শাশুড়ীরা ঘুমাইয়া পড়িলেও চপলা বিন্ধ্যকাননের সেই অপূর্ব্ব বর্ণনা শেষ না করিয়া উঠিতে পারে নাই। অযোধ্যার রামচন্দ্রের চেয়ে পঞ্চবটীর রামচন্দ্রকে বেশি ভাল লাগে। কাননচারিণী সীতার উপর একটা ঈর্ষামিশ্রিত সহানুভূতি জাগিয়া উঠিয়া মনটাকে তৃপ্তি আর অস্বস্তি—দুইয়েই ভরিয়া তোলে।

বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। চাওয়া যায় না। মনে হয়, সারা কলিকাতাটায় যেন আগুন লাগিয়াছে, উঁচু নীচু লক্ষ বাড়ির দেওয়াল বাহিয়া ছাত ফুঁড়িয়া শিখা লকলক করিয়া উঠিতেছে—কি এক রকম সাদাটে নীল আগুন, যাহাতে একটু ধোঁয়ার স্নিগ্ধতা নাই। এই সময়ে বেলপুকুরের কথা বেশি করিয়া মনে পড়ে, দীঘির পাড়ে সেই অন্ধকার সপ্তপর্ণীগাছের তলা, কালো জলের উপর তরতরে ঢেউ—

চিঠি আছে।—সঙ্গে সঙ্গে সদর-দরজায় পিয়নের মুঠির ঘা পড়িল। চপলা তাড়াতাড়ি নামিয়া যাইতে যাইতে দরজার ফাঁক বাহিয়া একখানি পোস্টকার্ড উঠানে আসিয়া পড়িল। বাবার চিঠি—শ্বশুরকে লেখা।

পড়িল। মামুলী চিঠি, তাহার বিশেষ উল্লেখও নাই। 'আশা করি,

বাড়ির সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল'-এর মধ্যে আর মামুলী আশীর্ব্বাদে সে যতটুকু আসিয়া পড়ে।

স্বামীর পড়িবার ঘরে গিয়া বসিল। এটা সেটা লইয়া খানিকটা নাড়চাড়া করিয়া আবার বাবার চিঠিটা লইয়া পড়িল। বাবার চমৎকার লেখা! এদের বাড়িতে কাহারও লেখা এমন নয়। বলিতে নাই—গুরুজন, কিন্তু শ্বশুরের লেখা তো একেবারে বিশ্রী! স্বামীর লেখাটা অত খারাপ নয় বটে, তবুও বাবার লেখার সামনে ঘেঁষিতে পারে না।

স্বামীর গানের খাতাটা টানিয়া লইয়া তুলনা করিতে লাগিল।—কিসে আর কিসে! ডাগর ডাগর ছাপার মত অক্ষর, ওপরে ঢেউখেলানো মাত্রা, এ এক জিনিসই। স্বামী বলে, একটু কাঁচা লেখা। কি সব পাকা লেখা রে নিজেদের!

লেখার দিকে বাবার ঝোঁক ছিল বড্ড; চপলাকে লইয়াও অনেকটা চেষ্টা করিয়াছিলেন। একেবারে বাবার মত লেখা হওয়া বরাতের কথা, তাহা হইলেও স্বামীকে সে খুবই হারাইয়া দিতে পারে।

লেখার কথাতেও বেলপুকুর আসিয়া পড়ে। বাবা-মায়ের মধ্যে তর্ক হইতেছে। বাবা বলিতেছেন, চপীর লেখা দেখেই তো ওর শ্বশুর পছন্দ ক'রে ফেললে।

মা বলিতেছেন, আর ওর অমন চোখ, মুখ, গড়ন বুঝি কিছুই নয়?

আজকাল শ্বশুরবাড়িতে নানা মুখে প্রশংসা শুনিয়া মায়ের গুমরের চোখ, মুখ, গড়ন সম্বন্ধে একটু কৌতূহল হইয়াছে, একটা সজ্ঞানতা আসিয়া পড়িয়াছে। টেবিলের উপর হইতে হাত-আরশিটা তুলিয়া লইয়া প্রতিচ্ছায়ার দিকে চাহিল—হাসি-হাসি সলজ্জ, যেন অন্য কাহার চোখ। বাপের বাড়ির আরশিতে এ রকম ছায়া পড়িত না; যত চায়, চোখ দুইটা যেন লজ্জায় ভরিয়া আসে।

ছাই চোখ মুখ, ছাই গড়ন।—বলিয়া আরশিটা রাখিয়া দিল। অন্যমনস্ক হইয়া কলমটা লইয়া পোস্টকার্ড দেখিয়া লিখিতে লাগিল,—"অনেকদিন যাবৎ আপনাদের কোন সংবাদ না পাইয়া"—ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া মিলাইতে লাগিল। বেশ একটু আদল আসে বাবার লেখার মত। তবুও অনেকদিন অভ্যাস ছাড়িয়া গিয়াছে।

কি রকম একটা ঝোঁকের বশে লিখিতে লাগিল, অনেকদিন যাবৎ—অনেকদিন যাবৎ, দুই বার, চার বার, আট বার, দশ বারেরটা অনেকটা মেলে। এখনও আছে তফাত, তবে বাপের মেয়ের লেখা বলিয়া দিব্য চেনা যায় বটে।

হঠাৎ কথাটা যেন মাথায় পাক দিয়া ঘুরিতে লাগিল, বাপের মেয়ের লেখা—বাপের মেয়ের লেখা—

চপলা আস্তে আস্তে কলমটা রাখিয়া দিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া দাঁতে নখ খুঁটিতে লাগিল। দৃষ্টি স্থির, ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া খয়েরের টিপটির কাছে একসঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে। ক্রমে তাহার বুকের ঢিপঢিপানিটা বাড়িয়া গেল, সমস্ত মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং ঠোঁটের কোণে নিতান্ত অল্প একটু হাসির আভাস ফুটিয়া উঠিল। বাপের মেয়ের লেখা, আর যদি ওটুকু তফাতও মিটাইয়া ফেলা যায়!

মাথার মধ্যে একটি মতলব জাঁকিয়া উঠিতেছে, চপলা একমনে সেটিকে বেশ ভাল করিয়া পরিস্ফুট করিয়া তুলিল। একবার উঠিয়া একটু ঘুরিয়া আসিল, শাশুড়ীরা অকাতরে ঘুমাইতেছেন। ঘড়িতে মোটে একটা বাজিয়াছে। স্বামীর কলেজ বোধ হয় আজ চারটা পর্য্যন্ত, এখনও ঢের সময়।

ঘরে আসিয়া পোস্টকার্ডটি সামনে, বইয়ের তাড়ার গায়ে হেলান দিয়া রাখিল, তাহার পর কতকগুলা কাগজ লইয়া ইস্তক শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় হইতে শ্রীঅখিলচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ পর্য্যন্ত সমস্তখানি নকল করিতে লাগিয়া গেল।

দুইটা বাজিয়া গেল, আড়াইটা, তিনটা। কপালের ঘাম মুছিয়া মুছিয়া আঁচলখানি ভিজিয়া গিয়াছে। তা যাক; ওদিকে প্রত্যেক অক্ষরের বাঁক, কোণ-কান, মাত্রা একেবারে বাবার লেখার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, মেয়ে লিখিয়াছে বলিয়া চিনুক দেখি কে চিনিবে!

তাহার পর আসল কাজ, যাহার জন্য এত মেহনৎ। বাপের চিঠি হইতে অক্ষর বাছিয়া বাছিয়া একটা আলাদা কাগজে সন্তর্পণে লিখিল—

পুনশ্চ। আর বৈবাহিক মহাশয়, আপনার বেহান কদিন থেকে একেবারে শয্যাধরা। একবার চপুকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছেন। শ্রীমান অজিত বাবাজীবনের সহিত অতি সত্বর পাঠাইয়া দেন তো ভাল হয়। ইতি

শ্রীঅখিলচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ

কাগজখানি পোস্টকার্ডের পাশে একেবারে সাঁটিয়া ধরিল। অবিকল বাবার লেখা। চপলা লেখাটুকু আরও আট-দশ বার ভাল করিয়া মক্স করিয়া লইল, তাহার পর সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী দুর্গাকে স্মরণ করিয়া সমস্তটুকু বাবার পোস্টকার্ডে ঠিকানা লেখার দিকে খালি জায়গাটুকুতে সাবধানে লিখিয়া ফেলিল।

লিখিয়াই তাহার মুখটা শুকাইয়া গেল, কলমটা রাখিয়া বলিল, ওই যাঃ!

ঠিকানার কালির সঙ্গে এ কালির মোটেই মিশ খায় না। উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দুই পিঠ তুলনা করিতে লাগিল। না, এ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, আজকের সদ্য লেখা। এ চিঠি দিলেই তো সর্ব্বনাশ; আবার না দেওয়াও বিপজ্জনক। এখন উপায়?

ভাবিতে ভাবিতে সে নিতান্তই বিচলিত হইয়া উঠিল এবং তাহার কাজটা ক্রমে একটা অপরাধের আকারেই তাহার মনে প্রতীয়মান হইয়া

উঠিতে লাগিল। ব্যাকুল হইয়া বলিল, এ কি করলে মা দুর্গা? তা হ'লে লেখাতে গেলে কেন অত ক'রে মা?

চপলার এখন বিশ্বাস, মা দুর্গা নিজের অন্যায়টুকু বুঝিতে পারিয়া হঠাৎ তাহার মাথায় আর একটু বুদ্ধি আনিয়া দিলেন। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া বাক্স খুলিয়া একটি চিঠি বাহির করিল, কাল দুপুরে বসিয়া সইকে খানিকটা লিখিয়াছিল, এখনও শেষ হয় নাই। কম্পিত বক্ষে চিঠিটার ভাঁজ খুলিয়া পোস্টকার্ডে বাবার লেখার পাশে ধরিল, একেবারে এক কালি।

আশ্বস্ত হইয়া নিজের মনে বলিল, মা যে বলেন, ভাল কাজে বিঘ্নি অনেক, তা মিছে নয়; যাক, কেটে গেল।

বিকেলে আসিয়া শ্বশুর অভ্যাসমত জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কোন চিঠি-ফিটি এসেছিল গা শাস্ত মা?

চপলা একটুও দ্বিধা না করিয়া উত্তর দিল, কই, না তো বাবা।

একটু পুরানো হইয়া দুই রকমের কালির গরমিল মিটাইয়া চিঠিটা আসিল তাহার পরদিন; উঠানের এক পাশেই পড়িয়া ছিল, শাশুড়ী তোলেন। শ্বশুর বালিশের নীচে আপিসের চাবি রাখিতে গিয়া আপনিই পাইলেন; চপলা সেদিন বাড়িতে ছিল না তখন।

পাশের বাড়ি হইতে বেড়াইয়া আসিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। কেমন যেন শ্বশুরের সামনে আসিতে পা উঠিতেছে না, বুকটা ধড়াস ধড়াস করিতেছে।

ডাক পড়িল—কই গো, চঞ্চলা মাকে আজ দেখতে পাচ্ছি না কেন?

যতটা সম্ভব সহজভাবেই আসিয়া দাঁড়াইল। কি বাবা?—বলিয়া মুখ তুলিতেই চোখের পাতা কিন্তু নামিয়া আসিল।

অমন শুকনো কেন মা? আজ ঘুমোও নি, না? এঃ-ই, দেখেছ দুষ্টু পাড়া-বেড়ানি মেয়ের কাণ্ড?

কাছে টানিয়া লইলেন, অসুখ করবে যে। বাবার চিঠি এসেছে, দেখেছ ?

কই, না। চোখ তুলিতেই আবার সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া পড়িল। মুখটাও একটু রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। শ্বশুর দেখিলেন, পাগলী মেয়ে, বাপ লইয়া যান না বলিয়া চিঠির নামেই অভিমান; কটা দিনই বা সে আসিয়াছে, তাহা তো হিসাব করিয়া দেখিবে না।

বলিলেন, এসেছে। আর তোমায় একবার যেতে লিখেছেন বেয়াই মশাই।

আসল কথাটি জানাইবেন কি না ভাবিতে লাগিলেন; কদিন থেকে শয্যাধরা, বেশ ভাবনার কথা। বলিলেন, বেয়ান-ঠাকরুণের একটু অসুখ লিখেছেন। কিন্তু কেমন যেন একটু খাপছাড়া খাপছাড়া, হঠাৎ শেষের দিকে পুনশ্চ দিয়ে একটু লেখা। আর, এই সেদিন চিঠি এল, কিছু তো লেখেন নি! যাই হোক, অজিত গিয়ে একবার তোমায় রেখে আসুক।

সফলতার আনন্দে শরীর-মনের সঙ্কোচটা কাটিয়া যাইতেছে; বুদ্ধিও খুলিতেছে। চপলা বলিল, খাপছাড়া যে বলছেন বাবা, বোধ হয় মনটা সুস্থির নেই, তাই আগে লেখেন নি।

বাপের অসঙ্গতির জন্য কন্যার দুশ্চিন্তা লক্ষ্য করিয়া এবং অদ্ভুত জবাবদিহি শুনিয়া শ্বশুর হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, বাপ নিশ্চয় গাঁজা-টাঁজা খায়, উল্টো-সোজা জ্ঞানগম্যি নেই।

যাক, কথাটা চপলা পূর্ব্বে অত খেয়াল করে নাই। বাবার গাঁজাখুরির অপবাদে যদি আপাতত ওটা চাপা পড়ে তো তাহার আপত্তি নাই।

মনে মনে খুশি হইয়া হাসিয়া বলিল, যান, ঠাট্টা করছেন আপনি।

মনে পড়িল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, যাহা প্রথমেই

জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। প্রশ্ন করিল, মার কি খুব অসুখ নাকি বাবা? আমার তো ভয়ে হাত-পা যেন অবশ হয়ে আসছে। হঠাৎ যেতে বলা কেন রে বাপু! মুখটা বিমর্ষ করিবারও চেষ্টা করিল। সরল আনন্দকে কৃত্রিম বিষাদে চাপা দিতে পারিল না। সেটুকু শ্বশুরের লক্ষ্য এড়াইল না, তবে বাৎসল্য নাকি নিজেকেই নিজে প্রবঞ্চিত করে, তাই ভাবিলেন, আহা, বড় ছেলেমানুষ, বাড়ি যাওয়ার আহ্লাদেই ও এখন আত্মবিস্মৃত; ভালই, যত ভুলিয়া থাকে।

উত্তর দিলেন, না, এই সামান্য একটু জ্বর। তবে দেখতে চাইছেন, দেখে এস একবার। মুখে সহজ প্রফুল্লতার ভাবটা টানিয়া রাখিবার চেষ্টা।

বধূরও লক্ষ্য এড়াইল না। শ্বশুরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য একটু অনুতাপও বোধ হয় হইল, আহা, বুড়া মানুষ, তায় গুরুজন। কিন্তু তখনই মনে পড়িল, আরও একটু প্রবঞ্চনা করা দরকার, উচিত হিসাবেও, আবার ওই গোলমেলে চিঠিটা হস্তগত করিয়া ফেলিবার জন্যও। বলিল, কই, চিঠিটা তো দেখলাম না বাবা; কি লিখেছেন, দেখি না একবার। আমি যেন কিছু বুঝতে পারছি না বাপু।

শ্বশুর বলিলেন, হ্যাঁ, এই যে।

এ পকেট সে পকেট খুঁজিলেন। বলিলেন, কোথায় যে রাখলাম, দোব 'খন খুঁজে, ভালই আছেন, এমন কিছু নয়। যাও, একবার পাঁজিটা নিয়ে এস দিকিন।

ভাবিলেন, একেবারে 'শয্যাধরা' লেখা রহিয়াছে, চিঠিটা দেখানো ঠিক নয়। আহা, নিতান্ত ছেলেমানুষ, এ ক্ষেত্রে একটু প্রবঞ্চনা করাই ভাল। করিলেনও।

বাক্সপত্র গুছাইতে গুছাইতে আবার হঠাৎ একটা কথা মনে উদয় হইয়া চপলার সর্ব্বশরীর যেন শিথিল করিয়া দিল, শ্বশুর যে বাবাকে চিঠির উত্তর দিবেন। তাহা হইলেই তো সব কথা ফাঁস হইয়া যাইবে।

আর তাহার পর যে লাঞ্ছনা, যে কেলেঙ্কারি, তাহা ভাবিতেও যে গা শিহরিয়া উঠে।

এমনই অসহায় অবস্থা যে, মা দুর্গাকে খোশামোদ করিলেও কোন সুরাহা হইবার নয়। মরিয়া হইয়া ধিক্কার দিল, এই ছিল তোমার মনে মা শেষকালে? তোমারও তো বাপের বাড়ি আছে, পাগলের মত ছুটে আসতে হয়।

যুক্তিটা নিশ্চয় মা দুর্গার মর্ম্মে লাগিল। প্রথম ঘোরটা কাটিয়া গিয়া চপলার মাথাটা একটু পরিষ্কার হইল। শ্বশুরের কাছে গিয়া বলিল, বাবা, বলছিলাম যে—

হ্যাঁ মা, বল।

এই বলছিলাম, আপনি বাবাকে চিঠিটা লিখে আমায় দিয়ে দেবেন, আমিও তার ওপর দুটো কথা লিখে ডাকে—

চিঠি লিখে তো কোন ফল হবে না মা, তোমরা তো কাল সকালেই যাচ্ছ। তাই ভাবছি—

হ্যাঁ বাবা, থাক্। একটি স্বস্তির নিশ্বাস পড়িয়া বুকটা হালকা হইল।

তাই ভাবছিলাম, একটা না হয় টেলিগ্রাম—

সর্ব্বনাশ! চপলা একবারে কপালে চোখ তুলিয়া বলিল, টেলিগ্রাম!

হ্যাঁ মা, তাই ভাবছিলাম; কিন্তু হিসেব ক'রে দেখছি, সেও তোমাদের গাঁয়ে তোমাদের আগে পৌঁছুবে না।

আর একটি স্বস্তির নিশ্বাস। বাবা, ফাঁড়া যেন কাটিয়াও কাটে না!

তাড়াতাড়ি বলিল, হ্যাঁ বাবা, আর মিছিমিছি পয়সা খরচও, এই মাগ্‌গি-গণ্ডার দিন।

বুদ্ধির জোয়ার নামিয়াছে। একটু থামিয়া বলিল, আর এও তো ভেবে দেখতে হবে বাবা, মার অমন অসুখ, এর মধ্যে খুট ক'রে বাড়িতে এক টেলিগ্রাম! শেষকালে কি হতে কি হয়ে পড়বে; আপনিই বলুন না? তার চেয়ে আমার হাতে বরং ভাল ক'রে চিঠি লিখে দেবেন, আমি গিয়েই বাবাকে দিয়ে দোব।